গ্রহান্তরের আগন্তুক

সোভিয়েত লেখকদের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

আলেক্সান্দর কাজানৎসেভ (জন্ম ১৯০৬) — অ্যাডভেঞ্চার ও বৈজ্ঞানিক কল্পোন্যাস লেখায় এঁর হাত চমৎকার। 'জ্বলন্তদ্বীপ', 'উত্তরের জেটি', 'উত্তরমেরুর সাঁকো' বইয়ের লেখক।

এই সংকলনের 'গ্রহান্তরের আগন্তুক' গল্পটির বিশেষ স্থান আছে কাজানৎসেভের রচনায়। তুঙ্গুস উল্কাটিকে তিনি যে মঙ্গলগ্রহের মহাজাগতিক যান বলেছেন এই প্রকল্প তিনি হাজির করেন ১৯৪৬ সালে, তা নিয়ে সে সময় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়।

আলেক্সান্দর বেলিয়ায়েভ (১৮৮৪—১৯৪২) — বিখ্যাত কল্পোন্যাস লেখক, জীবন এঁর যেমন আশ্চর্য, তেমনি কঠোর। বছরের পর বছর মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগে তিনি শয্যাশায়ী থাকেন, তাহলেও পরিপূর্ণ ও সার্থকভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন। আইন অধ্যয়ন করেন তিনি, কনজার্ভেটরিতে শিক্ষার্থী হন, সাগ্রহে কাজ করে যান পত্র-পত্রিকার জন্য। বিজ্ঞান ও টেকনলজিতে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। বিজ্ঞান টেকনলজি বিষয়ক বই তিনি যা লিখেছেন তাতে গ্রন্থাগার ভরে যেতে পারে, যেমন 'উভচর মানুষ', 'প্রফেসর ডোয়েলের মাথা', 'কেৎস তারকা', 'এরিয়েল', 'আটলানটিসের শেষ মানুষ', 'বিশ্বের প্রভু', 'শূন্যে ঝাঁপ' ইত্যাদি।

এই সংকলনে তার 'হৈটি টৈটি' গল্পটি দেওয়া হল — এটি 'প্রফেসর ভাগনারের আবিষ্কার' শীর্ষক এক গুচ্ছ অপূর্ব গল্পের একটি।

প্রতিভাশালী পদার্থবিদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী **আনাতোলি দ্নেপ্রভ** (জন্ম ১৯১৯) লিখতে শুরু করেন ১৯৪৬ সাল থেকে। তাঁর মনের মতো বিষয় হল কিবারনেটিক্স — বর্তমানে তার আশ্চর্য কীর্তি আর ভবিষ্যতে তার জয়যাত্রা। দ্নেপ্রভের রচনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে তাঁর গভীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির জন্য। 'আইডা' (১৯৫৮) এবং 'ম্যাকসওয়েল সমীকরণ' (১৯৬০) তাঁর সেরা গল্পগুলির অন্যতম।

ভ্লাদিমির সাভচেঙ্কো (জন্ম ১৯৩০) — গুণী ইঞ্জিনিয়র পদার্থবিদ, অর্ধপরিবাহীর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। অল্প কিছু দিন আগে লিখেছেন নিউক্লিয়র পদার্থবিদ্যা নিয়ে লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পোন্যাস 'কৃষ্ণ তারকা' আর 'নিরুত্তর রকেট' নামে এক কাহিনী।

এ সংকলনে দেওয়া হল তাঁর 'প্রফেসর বার্গের নিদ্রাভঙ্গ' (১৯৫৬) নামে গল্পটি।

•

সোভিয়েত লেখকদের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. আলেক্সেয়েভ

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{70500-36}{014(01)-76}$ 606-76

সূচি

আলেক্সান্দর কাজান্‌ৎসেভ

গ্রহান্তরের আগন্তুক

বরিস ইয়েফিমোভিচ আমায় একদিন জানালেন, 'আজ সন্ধ্যায় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একটা আসর করা যাবে।'

জানতাম জাহাজে পলিয়রনটলজিস্ট নিজোভস্কি ছাড়াও ভাসিলিয়েভ নামে একজন ভূগোলবিদও এসেছেন। দূর দ্বীপপুঞ্জে অভিযানের দায়িত্ব তাঁর।

তাছাড়া একজন ... জ্যোতির্বিজ্ঞানীও ছিলেন।

'সেদোভ'এ তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল যখন জাহাজটা থেমেছিল 'উস্‌তিয়ে'তে। একজন ভাগ্যহত ক্যাপ্টেন তার জাহাজের বোটগুলি হারিয়ে বসে। তাকে কতকগুলি বোট দেওয়া হচ্ছিল জাহাজ থেকে।

সেদিন ভোরেই আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম ডেকে। তীরভূমিটা যদি দূরে থেকেও খানিকটা দেখা যায় এই লোভে। কয়েক মাস কেটে গেছে তীর চোখে পড়েনি।

দিগন্তে ধূধূ করছিল কেবল একটা ফালির মতো ...

তবু ওইটেই মহাভূমির তট!

ভোরবেলাকার আকাশের মতোই জলটা কমলা রঙের, তার ওপর দেখা গেল একটি মোটর বোট। এগিয়ে আসছিল তীর থেকে।

বোট নামানোর তদারক করছিল যে ফ্যাস্ট মেট, সে বললে, 'নতুন প্যাসেঞ্জার আসছে তিনজন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী অভিযানের লোক।'

'জ্যোতির্বিজ্ঞানী অভিযান, এই উত্তরে? সে কী?'

ফ্যাস্ট মেট অবশ্য কিছুই বোঝাতে পারলে না।

এসে পৌঁছল মোটর বোট, ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল তিনটি লোক।

প্রথম জন বিশেষ লম্বা নয়, মোটা মোটা হাড়, তবে খানিকটা রোগাটে। মুখটা রোদপোড়া, গালের হাড় বের করা, চোখে সিঙের ফ্রেমের চশমা, ঢিপ মতো কপালটার কেমন অদ্ভুত লাগে চেহারাটা। অস্বাভাবিক লম্বাটে চোখ দুটো যেন নরুনে চেরা।

দূর থেকেই অমায়িকভাবে আমায় নমস্কার করলেন তিনি। তারপর এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন:

'ইয়েভ্‌গেনি আলেক্সেয়েভিচ ক্রিমোভ, জ্যোতির্বিদ। উচ্চ-অক্ষ একটা অভিযান চালাচ্ছি আমরা। ইনি নাতাশা গ্লাগোলেভা... মানে নাতালিয়া গেওর্গিয়েভনা। উদ্ভিদবিদ।'

তুলোভরা জ্যাকেট ও ট্রাউজার পরা মেয়েটি আলগোছে করমর্দন করল। মুখটা ক্লিষ্ট, চোখের কোণে কালি। ডেক অফিসার তাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল তার পূর্বনির্দিষ্ট কেবিনে।

তৃতীয় যাত্রীটি তরুণ, ছেলেমানুষ বললেই হয়। মোটর বোট থেকে মাল ওঠানোর তদারক করছিল সে খুব গুরু গম্ভীর ভাব করে।

'হুঁশিয়ার! যন্ত্রপাতি আছে ওতে, বৈজ্ঞানিক ইনস্ট্রুমেণ্ট!' চেঁচাল সে, 'বলছি ইনস্ট্রুমেণ্ট — হুঁশ নেই?'

যা হোক, যন্ত্রপাতি সবই উঠল ডেকে। টেলিস্কোপের মতো কিছুই কিন্তু আমার চোখে পড়ল না।

উত্তর মেরুতে কী জ্যোতির্বিজ্ঞানী অভিযান করছে এরা? তারা নক্ষত্র কি ভালো দেখা যায় এখান থেকে?

দিকি দ্বীপের বন্দরে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, এই সুযোগে বরিস ইয়েফিমোভিচ তাঁর বৈজ্ঞানিক অতিথিদের সেলুনে আমন্ত্রণ জানালেন।

বুফে পরিচারিকা কাতিয়া স্প্র্যাট মাছ বার করলে তার কোন একটা গোপন মজুদ থেকে। টেবলের ওপর রাখা হল ক্যাপ্টেনের নিজস্ব কনিয়াক।

ঘুমের পর উদ্ভিদবিদ নাতাশার গালে রঙ ফিরেছে, চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সে। খাদ্য পানীয়ের প্রতি সুবিচার প্রদর্শনে বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সেও সানন্দে যোগ দিলে।

ক্রিমোভকে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, আপনাদের এই অভিযানটির লক্ষ্য কী?'

মাছের দিকে হাত বাড়িয়ে ক্রিমোভ বললেন:

'মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা।'

'মঙ্গলগ্রহে?' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

গোল গোল চশমার মধ্যে দিয়ে ক্রিমোভ অবাক হয়ে চাইলেন আমার দিকে:

'ঠাট্টা করব কেন?'

'এখান থেকে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করা কি সম্ভব নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, এই সময় সাধারণভাবেই মঙ্গলগ্রহ বিশেষ দৃষ্টিগোচর থাকে না।'

'জ্যোতির্বিদ, উদ্ভিদবিদ — এঁরা সব আকাশের দিকে না তাকিয়ে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করছেন উত্তর মেরুতে!' অবাক হয়ে হাত ওল্টালাম আমি।

'মঙ্গলগ্রহ আমরা পর্যবেক্ষণ করছি আমাদের নিজেদের মানমন্দিরে, আলমা-আতায়, আর এখানে...'

'আর এখানে?'

'এখানে আমরা খুঁজছি মঙ্গলগ্রহে যে জীবন আছে তার প্রমাণ।'

'ভারি ইনটারেস্টিং!' উল্লসিত হয়ে উঠলেন নিজোভস্কি, 'মঙ্গলগ্রহের ক্যানেলগুলো সেই ছেলেবেলা থেকেই আমায় টানছে। স্কিয়াপারেল্লি, লওয়েল! মঙ্গলগ্রহ নিয়ে এই সব বৈজ্ঞানিকেরাই তো কাজ করে গেছেন?'

'তিখোভ,' রায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন ক্রিমোভ, 'গাব্রিইল আদ্রিয়ানভিচ তিখোভ।'

'নতুন বিজ্ঞান গড়েছেন তিনি — জ্যোতিরুদ্ভিদ, অস্ট্রোবোটানি!' সোৎসাহে বললে মেয়েটি।

'জ্যোতিরুদ্ভিদ বিজ্ঞান?' ফের জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'জ্যোতিষ — অর্থাৎ তারা নক্ষত্র তার সঙ্গে হঠাৎ উদ্ভিদবিদ্যা। কী ব্যাপার সেটা, মাথায় ঢুকছে না।'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নাতাশা।

'তারার উদ্ভিদবিদ্যাই বটে,' নাতাশা বললে, 'অন্যান্য জগতের উদ্ভিদ নিয়ে চর্চা করে এ বিজ্ঞান।'

'মঙ্গলগ্রহের উদ্ভিদ,' যোগ দিলেন ক্রিমোভ।

'আমাদের কাজাখস্তান বিজ্ঞান আকাদমিতে এই নতুন সোভিয়েত বিজ্ঞান, জ্যোতির্উদ্ভিদ বিদ্যার একটা বিভাগ খোলা হয়েছে।' সগর্বে জানালে নাতাশা।

'জ্যোতির্বিদ, তা এই উত্তর মেরুতে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

ক্রিমোভ বললেন, 'ব্যাপারটা এই, মঙ্গলগ্রহে যে রকম অবস্থা, সেই রকম একটা পরিস্থিতি পাওয়া দরকার আমাদের। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে, মঙ্গলগ্রহ তার চেয়ে দেড়গুণ দূরে। ওখানকার বাতাস যে পরিমাণ বিরলীভূত সেটা আমাদের ভূপৃষ্ঠের ওপর ১৫ কিলোমিটার উঁচুতে যা মেলে সেই রকম। আবহাওয়া কঠোর ও চরম ধরনের।'

নাতাশা বাধা দিলে, 'ভেবে দেখুন সেখানকার বিষুবরেখায় দিনে +২০° আর রাত্রে −৭০° সেণ্টিগ্রেড!'

'একটু কড়া গোছেরই বটে,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'আর মাঝামাঝি এলাকায়,' ক্রিমোভ বলে চললেন, 'শীতকালে (মঙ্গলগ্রহের ঋতুচক্র পৃথিবীর মতোই)... শীতকালে সেখানে দিনে রাত্রে −৮০° সেণ্টি।'

'আমাদের তুরুখানস্ক এলাকার মতো,' বললেন ভূগোলবিদ। এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে ছিলেন তিনি।

'হ্যাঁ, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া কঠোরই। কিন্তু এখানে এই উত্তর মেরুতেও কি তেমন তাপমাত্রা মেলে না?' সাগ্রহেই আলাপ শুরু করলেন ক্রিমোভ। বোঝা যায় নাক্ষত্রিক উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁর নেশা মন্দ নয়।

'এই বার বোঝা গেল, কেন আপনারা এখানে,' বললেন ক্যাপ্টেন।

ক্রিমোভ বলে চললেন, 'অথচ উত্তর মেরুতে জীবন বর্তমান। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে তো এর তুলনায় পরিস্থিতি বেশি অনুকূল। যেমন, মেরু-বৃত্তে মাসের পর মাস সূর্য ডোবে না। দিনে রাতে সেখানে তাপমাত্রা +১৫° ডিগ্রির কাছাকাছি বজায় থাকে। উদ্ভিদের পক্ষে এ তো চমৎকার পরিস্থিতি!'

আমি বলে ফেললাম, 'কিন্তু তাতে কী হল? মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ আছে এই তো?'

'এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই...' এড়িয়ে যাবার মতো জবাব দিলেন ক্রিমোভ।

সবাইকে কনিয়াক এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

বরিস ইয়েফিমোভিচ বললেন:

'জ্যোতির্বিদ্যা — এটা চমৎকার পেশা বই কি। আমাদের মধ্যে, নাবিক আর মেরু অভিযানীদের মধ্যে আত্মকাহিনী শোনানোর কিন্তু খুব চল। তাই, আপনি কমরেড ভূগোলবিদ, আর আপনি কমরেড নিজোভস্কি, আর বিশেষ করে আপনারা জ্যোতির্বিদরা যদি শোনান, কী ভাবে আপনারা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠলেন, তাহলে ভারি ভালো হয়।'

'বলবার আবার কী আছে,' জবাব দিলেন নিজোভস্কি, 'স্কুলে পড়লাম, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে, পোস্টগ্রাজুয়েট গবেষককর্মী হিসাবে টিকে গেলাম... বাস।'

'আমি বিজ্ঞানী হয়ে উঠি আমার নেশার ঝোঁকে,' বললেন ভালেন্তিন গাভ্রিলোভিচ ভাসিলিয়েভ, 'নতুনের নেশা, গতির তৃষ্ণা। আমাদের এই অপরূপ দেশটার সবখানি ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। আর এখন তো এই উত্তর মেরুতে। অথচ ভাবতে বসলে মনে হয়, কত জায়গাই তো এখনো দেখিনি, কত বিরাট এলাকাতেই তো পৌঁছইনি... বেশ লাগে ভাবতে। আসুন আমাদের সীমাহীন, সুন্দর স্বদেশের জন্য পান করি।' ভূগোলবিদ গ্লাস ওঠালেন তাঁর।

সবাই অনুসরণ করল তাঁর দৃষ্টান্ত।

'আর আপনি,' ক্রিমোভকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'আপনার কাহিনী শুনতে চাই আমরা।'

অস্বাভাবিক সিরিয়াস হয়ে উঠলেন ক্রিমোভ।

'খুবই জটপাকানো ব্যাপার,' চিন্তিতভাবে টিপ কপালটায় হাত ঘষে শুরু করলেন তিনি, 'অনেক সময় লাগবে বলতে।'

সবাই মিলে অনুরোধ শুরু করে দিলাম। নেতার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল নাতাশা। বোঝা যায়, এ জীবন কাহিনী তার অজানা।

'বেশ, তাহলে বলি শুনুন,' শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন ক্রিমোভ, 'আমার জন্ম এক এভেংকী যাযাবর ছাউনিতে। এভেংকদের পাশে নদী ওত তুঙ্গুস।'

'আপনি এভেংক?' চেঁচিয়ে উঠল নাতাশা।

মাথা নাড়লেন ক্রিমোভ।

'এভেংকী ছাউনিতে আমি জন্মাই সেই বছর যখন তাইগায় . তুঙ্গুস উল্কার কথা আপনারা সবাই নিশ্চয় জানেন, যেটা তাইগায় এসে পড়েছিল?'

'কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু আপনি বরং সব বলুন, ভারি কৌতূহল হচ্ছে,' অনুরোধ করলেন নিজোভস্কি।

'খুবই অসাধারণ একটা ঘটনা।' হঠাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন ক্রিমোভ। 'তাইগার হাজার হাজার লোকে স্বচক্ষে দেখেছিল সেই আগুনের গোলাটাকে, তার উজ্জ্বলতায় সূর্য পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে যায়। আকাশে মেঘ ছিল না, আগুনের একটা মস্ত স্তম্ভ যেন ফুঁড়ে আসে সেই আকাশ থেকে; যে জোরে তা ধাক্কা মারে, তার তুলনা হয় না... সারা পৃথিবী জুড়ে অনুভূত হয় সে ধাক্কার স্পন্দন। অকুস্থল থেকে হাজার কিলোমিটার দূরেও তার শব্দ পেঁছয়। রেকর্ডে আছে যে ৮০০ কিলোমিটার দূরে কানস্ক-এর কাছে একটা ট্রেন থেমে যায়। ড্রাইভারের মনে হয়েছিল, বুঝি কিছু একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে ট্রেনের মধ্যে। অভূতপূর্ব একটা ঝড় শুরু হয়ে যায় পৃথিবীতে। অকুস্থলের চারশ কিলোমিটারের মধ্যে ঘরবাড়ির চালা উড়ে যায়, বেড়া ভেঙে পড়ে... আরো দূরে — ঝনঝন করে ওঠে বাসনপত্র, ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, ভূমিকম্পের সময় যা হয়। তার ধাক্কা রেকর্ড হয় বহু ভূকম্পন যন্ত্রে: তাশখন্দে, ইয়েনায় (জার্মানি), ইর্কুৎস্কে — চাক্ষুষ দর্শকদের সাক্ষ্য নেওয়া হয় এখানে।'

'ব্যাপারটা কী ঘটেছিল?' জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি, 'পৃথিবীর সঙ্গে উল্কার ধাক্কার ঝাঁকুনি?'

জবাব এড়িয়ে গিয়ে ক্রিমোভ বললেন, 'লোকে তাই ভেবেছিল। বিপর্যয় থেকে যে বায়ু তরঙ্গ জাগে তা দুবার ঘুরে যায় সারা পৃথিবী। লণ্ডন এবং অন্যান্য জায়গার ব্যারোগ্রাফে তা ধরা পড়ে।

'তাইগায় এই উল্কাপাতটার পরে পুরো চার দিন চার রাত ধরে অদ্ভুত সব ব্যাপার দেখা যায় গোটা দুনিয়ায়। আকাশের অনেক উঁচুতে দেখা যায় ভাস্বর মেঘ, গোটা ইউরোপ এমন কি আলজেরিয়া পর্যন্ত রাতে এতই আলো

হয়ে ওঠে যে মাঝরাত্রেও খবরের কাগজ পড়া চলত, লেনিনগ্রাদে শ্বেতরাত্রির সময় যেমন হয়..'

'কবে ঘটেছিল সেটা?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'যে বছর আমার জন্ম, ১৯০৮ সালে,' জবাব দিলেন ক্রিমোভ, 'তাইগায় তখন দেখা দিয়েছিল একটা আগুনে ঝড়। ষাট কিলোমিটার দূরে ভানোভার কুঠিতে লোকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাদের বোধ হয়েছিল যেন কাপড় চোপড়ে সব আগুন ধরে গেছে। ঝড়ের দাপটে বহু হরিণ উড়ে যায় মাটি থেকে, আর গাছ... বিশ্বাস করুন, আমি ঐ এলাকারই লোক, বহু বছর উল্কাপিণ্ডের সন্ধানে কাটিয়েছি — তিরিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সমস্ত গাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়ে আসে, সমস্ত এলাকাটায়! ষাট কিলোমিটার ব্যাস জুড়ে সমস্ত উঁচু জায়গার গাছ উল্টে পড়ে।

'ঝড়ে অভূতপূর্ব বিপর্যয় হয়। নিজেদের নিজেদের হরিণ, সম্পত্তি ভাঁড়ারের খোঁজে তাইগায় ঢুঁড়ে বেড়ায় এভেঙ্করা। পায় কেবল পোড়া লাশ। আমার দাদু লুচেৎকানের ছাউনিতেও শোক ঘনায়। ছারখার হওয়া তাইগায় গিয়ে আমার বাবা দেখতে পান মাটি থেকে একটা মস্ত জলস্রোত উঠছে। এর কয়েকদিন পরে ভয়ানক যন্ত্রণায় ভুগে মারা যান তিনি, কেউ যেন তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছিল... অথচ চামড়ার ওপর কোনো দাহের চিহ্ন ছিল না। ভয় পেয়ে গেল বুড়োরা। ছারখার হওয়া তাইগায় যাওয়া নিষেধ করে দিলে তারা। তার নাম দিলে অভিশপ্ত জায়গা। ওঝারা বললে, আগুন আর বজ্রের দেবতা অগ্নি সেখানে আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। ওখানে কেউ গেলেই তাকে অদৃশ্য আগুনে পুড়িয়ে মারছেন তিনি।

'বিশের দশকের গোড়ায়,' বলে চললেন ক্রিমোভ, 'ভানোভার কুঠিতে আসেন একজন রুশ বৈজ্ঞানিক, কুলিক। উল্কাপিণ্ডটার তল্লাস করতে চান তিনি। কোনো এভেঙ্ক তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হয় না। দুজন আঙ্গারা ব্যাধকে তিনি ভাড়া করেন, আর আমিও যোগ দিই। আমার বয়স কম, রুশ ভালো জানতাম, কুঠিতে কিছু কিছু শিক্ষাও পেয়েছিলাম, দুনিয়ায় কিছুই ভয় করতাম না।

'কুলিকের সঙ্গে আমরা পৌঁছলাম বিপর্যয়স্থলটার কেন্দ্রে। দেখলাম অসংখ্য গাছ — লক্ষ লক্ষ গাছ যা উল্টে পড়েছিল তাদের সকলের শিকড়ের

দিকটা সবই এক দিকে — বিপর্যয়স্থলের ঠিক কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রস্থলটা পরীক্ষা করে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। কেননা উল্কাপিণ্ড পড়বার জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হওয়ার কথা, অথচ... সেখানকার অরণ্য খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা শুধু আমার কাছেই নয়, রুশ বৈজ্ঞানিকের কাছেও ব্যাখ্যাতীত। সেটা আমি তাঁর মুখ দেখেই টের পাচ্ছিলাম।

'খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো, কিন্তু সে সবই মরা গাছ — ডাল নেই, পাতা নেই, ঠিক যেন মাটিতে পোঁতা খুঁটির মতো।

'এই গাছের বনটার মাঝখানে জল দেখা গেল — একটা দীঘি বা জলার মতো।

'কুলিক ধরে নিলেন, উল্কাপিণ্ড পড়ে যে গর্ত হবার কথা, সেটা এইটে।

'সহজ ভাষায় আমাদের বনের ব্যাধদের তিনি বোঝালেন এমন ভাবে যেন আমরা তাঁর বৈজ্ঞানিক সহকারী। বললেন, আমেরিকার কোন একটা জায়গায় আরিজোনা নামে এক মরুভূমির মধ্যে মস্ত একটা গর্ত আছে, ব্যাস তার দেড় কিলোমিটার লম্বা, গভীর ২০০ মিটার। গর্তটা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে, কোনো একটা উল্কাপাতে, ঠিক এখানে যে উল্কাটা পড়েছিল তার মতো। উল্কাটা খুঁজে পাওয়া একান্ত দরকার। সেই থেকে রুশ অধ্যাপককে সাহায্য করার জন্য একটা ভয়ানক ইচ্ছা পেয়ে বসে আমায়।

'পরের বছর কুলিক তাইগায় এলেন একটা বড়ো অভিযাত্রীদল নিয়ে। কাজের জন্যে লোক ভাড়া করলেন তিনি। স্বভাবতই প্রথম জুটলাম আমি। উল্কাটার চূর্ণ খণ্ডের সন্ধান চালালাম আমরা। মরা বনটার মাঝের জলাটার জল নিকাশ করা হল। প্রতিটি খানা খোঁদল খুঁজে দেখা হল, কিন্তু... উল্কার কোনো পাত্তা তো পাওয়াই গেল না, উল্কার আঘাতে যে গর্ত হবার কথা তারও কোনো চিহ্ন মিলল না।

'দশ বছর ধরে প্রতিবছর একবার করে তাইগায় এসেছেন কুলিক, দশ বছর ধরে এই নিষ্ফল সন্ধানে আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গী। উল্কাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'কুলিক ভেবেছিলেন উল্কাটা পড়েছিল জলার মধ্যে, আর গর্তটা বুজে গেছে জলায়। কিন্তু মাটিতে ড্রিল করার ফলে পাওয়া গেল একটা চিরকাল জমে থাকা অক্ষত স্তর। সেটা ড্রিল করায় ফুটো দিয়ে বেগে বেরিয়ে এল

একটা জলের ফোয়ারা। উল্কাটা যদি এই স্তর ভেদ করে ঢুকে থাকে তাহলে এই জমাট স্তরটা গলে যাওয়ার কথা, এবং একবার গললে তা আর জমে যেতে পারে না, কেননা শীতকালেও এখানে দুই মিটার নিচে মাটি কখনো শীতে জমে না।

'দ্বিতীয় বছরের সন্ধানকাজের পর আমি কুলিকের সঙ্গে মস্কো এসে পড়াশুনা করতে শুরু করি। কিন্তু প্রতি গ্রীষ্মে আসতাম আমার আদি বাসের আশেপাশে উল্কার সন্ধানের জন্য। কুলিক হাল ছাড়েননি। আমি সঙ্গে থাকতাম তাঁর। তখন আর একটা তাইগার আধাশিক্ষিত ব্যাধ আর আমি নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অনেককিছু পড়াশুনা করেছি, বিজ্ঞানের ব্যাপারে নিজের সমালোচনাও হাজির করতে শুরু করেছি। কিন্তু কুলিককে সে কথা কিছু বলিনি। জানতাম, কী ব্যগ্রতায় তাঁর উল্কাপিণ্ডের সন্ধানে আছেন তিনি। তা নিয়ে কিছু কবিতা পর্যন্ত লিখেছেন... কী করে তাঁকে বলি যে আমি স্থির নিশ্চিত হয়ে উঠেছি যে কদাচ কোনো উল্কা ছিল না সেখানে।'

'ছিল না মানে?' চেঁচিয়ে উঠলেন নিজোভস্কি, 'বিপর্যয়টা হল কী ভাবে, ছারখার গাছগুলো?'

'বিপর্যয় ঠিকই, কিন্তু উল্কা নয়,' জোর দিয়েই বললেন ক্রিমোভ। 'বিপর্যয়ের ঠিক কেন্দ্রে গাছের শিকড়গুলো ঠিকই রইল এ নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। উল্কা পড়বার সময় বিস্ফোরণ হয় কেন? পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে দিয়ে উল্কা ছুটে আসে সেকেণ্ডে তিরিশ থেকে ষাট কিলোমিটারের মতো একটা মহাজাগতিক গতিতে। বিপুল ভার ও প্রচণ্ড গতির ফলে উল্কার কিনেটিক এনার্জি বা গতিতেজ প্রচণ্ড। পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কায় এই সমস্ত তেজ পরিণত হয় তাপে; এর ফলে ঐ প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটি ঘটেনি... পৃথিবীর সঙ্গে উল্কাটির সংঘাত হয়নি। আমার কাছে এটা খুব স্পষ্ট। মরা গাছগুলির অস্তিত্ব থেকে এটা আমি বুঝেছি যে, বিস্ফোরণটা ঘটে বাতাসে প্রায় তিনশ মিটার ওপরে, এবং ঠিক এই গাছগুলোর মাথায়!'

'বাতাসে কী করে?' অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি।

'বিস্ফোরণের তরঙ্গ ছুটে গেছে সমস্ত দিকে,' খুব প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে চললেন ক্রিমোভ, 'উল্কার ঠিক নিচে গাছগুলো যেখানে ছিল ঠিক সমকোণে

খাড়া দাঁড়িয়ে, সেখানে বিস্ফোরণ তরঙ্গে গাছ উল্টে পড়েনি, কেবল ডালপালা-গুলো খসে পড়েছে। কিন্তু যেখানে এ তরঙ্গের ধাক্কা লেগেছে কোণাকুণি সেখানে তিরিশ থেকে ষাট কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে সমস্ত গাছ উল্টে পড়েছে। সেক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব কেবল হাওয়ায়!'

'তা বটে... ঠিক বলেই মনে হচ্ছে,' চিন্তিতভাবে থুতনিতে হাত বুলিয়ে বললেন নিজোভস্কি।

'কিন্তু বাতাসে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে কী ভাবে। এক্ষেত্রে গতি তাপে রূপান্তরিত হওয়ার কথা নয়, এবং তা হয়নি। সমস্যাটা ভাবিয়ে তুলল আমায়।

'বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্গ্রহ যোগাযোগ চক্র ছিল একটা। তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সমেত আন্তর্গ্রহ রকেটের যে প্রকল্প দিয়েছিলেন ৎসিওলকভস্কি, তাতে খুব আগ্রহ ছিল আমার। একদিন একটা কথা মনে হল আমার — খুবই দুঃসাহসী কথা। কুলিক আমার সঙ্গে থাকলে তক্ষুনি তাঁকে বলতাম। কিন্তু... যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বেশ বয়স হলেও লিওনিদ আলেক্সেয়েভিচ কুলিক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে চলে যান ফ্রন্টে, বীরের মতো মারা যান...'

একটু চুপ করে ফের বলে চললেন ক্রিমোভ:

'আমি ছিলাম ফ্রন্টের অন্য একটা এলাকায়। বড়ো বড়ো শেল বাতাসে ফাটছে এটা প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখতাম আমি। আর ক্রমেই বেশি করে নিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম যে তাইগার ও বিস্ফোরণটা সত্যি সত্যিই বাতাসে হয়েছে। আর তা হতে পারে কেবল কোনো একধরনের ব্যোমযানের জ্বালানির বিস্ফোরণ যা পৃথিবীতে নামার চেষ্টা করছিল।'

'অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা ব্যোমযান?' চেয়ার ছেড়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন নিজোভস্কি।

ভূগোলবিদ চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন। ক্যাপ্টেন একটা অস্ফুট শব্দ করে শেষ করলেন তাঁর কনিয়াক। নাতাশা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল ক্রিমোভের দিকে, যেন তাঁকে সে দেখছে এই প্রথম।

'হ্যাঁ, মহাকাশ থেকে কোনো আগন্তুক, অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা ব্যোমযান, খুব সম্ভবত মঙ্গলগ্রহ থেকে। জীবনের অস্তিত্ব কেবল মঙ্গলগ্রহেই

আছে বলে ধারণা করা যায় তখন আমি ভেবেছিলাম তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন, মহাজাগতিক যানের পক্ষে যা একমাত্র উপযোগী জ্বালানি, তাতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। তখন তাই মনে হয়েছিল...'

'তার মানে,' নাতাশা চেঁচিয়ে উঠল, 'এখন অন্য কিছু ভাবছেন?' তার গলার স্বরে স্পষ্টই হতাশা ফুটে উঠল। বোঝা যায় মহাকাশ থেকে আগন্তুকের এই প্রকল্পটা তার বেশ মনে ধরেছিল।

'হ্যাঁ, এখন অন্যরকম মনে হয়।' শান্ত স্বরে পুনরাবৃত্তি করলেন ক্রিমোভ, 'জাপানের ওপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে নিশ্চিত হয়েছি কী ধরনের জ্বালানি ছিল ব্যোমযানে।'

'যুদ্ধ শেষ হবার পর মঙ্গলগ্রহের সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করি। ও গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমার দরকার। তিখোভের নেতৃত্বে চর্চা শুরু করি... আর এখন এই তো দেখছেন এসেছি অভিযাত্রীদলে, উত্তর মেরুর উদ্ভিদ তাপকিরণ আত্মস্থ করে কী ভাবে তার তথ্য সংগ্রহের জন্য।'

'কিন্তু কী প্রমাণ হবে তাতে?' এবার শোনা গেল ক্যাপ্টেনের গলা।

'গত শতাব্দীতেই তিমিরিয়াজেভ মঙ্গলগ্রহে ক্লোরোফিল আছে কিনা তা খোঁজ করে দেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাতে প্রমাণ হত, মঙ্গলগ্রহে যে সবুজ দাগ দেখা যায়, বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে যার রঙ বদলায়, যেমন রঙ বদলায় পৃথিবীর গাছপালার, সেগুলো আসলে উদ্ভিদে ঢাকা এলাকা।'

'কিন্তু কী হল? ক্লোরোফিল আবিষ্কার হয়েছে?'

'না, আবিষ্কার এখনো সম্ভব হয়নি। ক্লোরোফিল সৌর বর্ণালীর একটা বিশেষ তরঙ্গ শোষণ করে, ফলে সেখানে একটা শূন্য ব্যান্ড দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের বর্ণালীতে তা মেলেনি। তাছাড়া অতিলাল কিরণে পৃথিবীর উদ্ভিদের ফটো নিলে তা শাদা দেখায়। অথচ অতিলাল কিরণে নিলে মঙ্গলগ্রহের সবুজ এলাকার ছবি শাদা দেখায় না।

'সবকিছু থেকেই মনে হচ্ছিল মঙ্গলগ্রহে আদৌ কোনো উদ্ভিদ নেই। কিন্তু গাব্রিইল আদ্রিয়ানভিচ তিখোভ একটা চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছেন। অতিলাল কিরণের ফটোগ্রাফে পৃথিবীর উদ্ভিদ শাদা দেখায় কেন? কারণ যে তাপ রশ্মি উদ্ভিদের প্রয়োজন নেই, সেটা তারা প্রতিফলিত করে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে সূর্যের তেজ বেশি নয়। সেখানে সবরকম সম্ভব তাপ কাজে

লাগাবার চেষ্টা করবে উদ্ভিদ। অতিলাল কিরণে সবুজ দাগগুলো যে শাদা দেখায় না, তা এই কারণে হতে পারে না কি?

'আসলে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে এখানে এসেছি সেটা এই কারণেই। আমরা যাচাই করে দেখতে চাই উত্তর মেরুর উদ্ভিদ তাপ-কিরণ প্রতিফলিত করে কি না।'

'কী দেখলেন, প্রতিফলিত করে?' সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম সবাই।

'না, প্রতিফলিত করে না! উত্তরের উদ্ভিদ তা শোষণ করে, ঠিক মঙ্গলগ্রহের উদ্ভিদের মতো।' চেঁচিয়ে উঠল নাতাশা। চোখ তার জ্বলজ্বল করছে, 'আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে, সবুজ দাগগুলো হল কনিফার বন। তথাকথিত মঙ্গলগ্রহের ক্যানেলগুলো হল ১০০ থেকে ৬০০ কিলোমিটার চওড়া উদ্ভিদ এলাকা।'

'একটু দাঁড়ান নাতাশা,' সহকারিণীকে থামিয়ে দিলেন জ্যোতির্বিদ।

'ক্যানেল?' জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি, 'ক্যানেল তাহলে সত্যিই আছে? কিন্তু কিছু কাল আগে যে লোকে বলত ওগুলো আলোক বিভ্রম।'

'মঙ্গলগ্রহের ক্যানেলগুলোর ফোটো নেওয়া হয়েছে, আর ফোটো তো কখনো মিথ্যা বলে না। আর ফোটো নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার। সে সব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে যে মঙ্গলগ্রহের মেরু তুষার যে পরিমাণে গলতে থাকে, সেই পরিমাণে তা দেখা দেয় ও ক্রমশ মেরু থেকে বিষুবরেখার দিকে বাড়তে থাকে।'

'উদ্ভিদের এই ফিতেটা লম্বা হতে থাকে ঘণ্টায় সাড়ে তিন কিলোমিটার গতিতে,' কিছুতেই চুপ করে থাকতে না পেরে বলে ফেলল নাতাশা।

'তার মানে ঘূর্ণির জল ঠিক যে গতিতে চলে?' অবাক হয়ে বললেন ভূগোলবিদ।

'ঠিক ঐ গতিতে,' বললেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। 'খুবই অবাক লাগে যে এই সব উদ্ভিদ বেল্ট একেবারে নিখুঁত সরল রেখায় গড়া, আর এর মধ্যে প্রধানগুলো শিরার মতো আসছে গলন্ত মেরু তুষার থেকে বিষুবরেখার দিকে।'

নিজোভস্কি ততক্ষণে জমে গেছেন বিষয়টায়। বললেন, 'তাহলে কোনো সন্দেহই নেই যে ওগুলো হল ক্ষেতে জল দেবার জন্যে একটা মস্ত সেচ

ব্যবস্থা, মঙ্গলবাসীরাই গড়েছে, আর আমরা ভেবে এসেছি খাল। খাল অবশ্যই নেই, পৃথিবীর ওপর পাতা টিউব।'

মৃদু হেসে ক্রিমোভ সংশোধন করলেন:

'পৃথিবীর ওপর নয়, মঙ্গলগ্রহের ওপর।'

'তার মানে মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে। তার মানে আপনার ভাবনা ঠিক,' বলে গেলেন নিজোভস্কি।

'আপাতত এটুকু নিশ্চয় করেই বলা যায় মঙ্গলগ্রহে জীবন অসম্ভব নয়।'

'যা দেখছি তাতে ১৯০৮ সালে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সত্যিই পৃথিবীতে আসা অসম্ভব ছিল না,' ক্যাপ্টেন বললেন.

'হ্যাঁ, আসা সম্ভব,' এতটুকু বিব্রত না হয়ে জবাব দিলেন ক্রিমোভ।

'কালে কালে কতই শুনব!' পাইপ ধরিয়ে বিড়বিড় করলেন বরিস ইয়েফিমোভিচ.

'মঙ্গল হল একটা মুমূর্ষু প্রাণের গ্রহ। পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোটো ও মাধ্যাকর্ষণ টান কম বলে মঙ্গলগ্রহ তার আদি বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারেনি। বায়ুকণা গ্রহ থেকে খসে মহাশূন্যে উড়ে উড়ে গেছে। মঙ্গলগ্রহের বায়ু হয়ে উঠেছে বিরলীভূত, মহাসাগরের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে থাকে, আর বায়ু মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে... মঙ্গলগ্রহে জল অবশিষ্ট আছে এত কম যে তার সবটা আমাদের বৈকাল হ্রদটাতেই এ'টে যাবে।'

'তার মানে মঙ্গলগ্রহবাসীরা সব উড়ে আসতে চাইছিল আমাদের পৃথিবীটাকে দখল করার জন্যে!' সিদ্ধান্ত টানলেন নিজোভস্কি, 'আমাদের ফুটন্ত গ্রহটা ওদের দরকার!'

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'হিটলার, ট্রুমান, ম্যাকআর্থারেও হল না, আবার দেখছি মঙ্গলগ্রহওয়ালাদের সঙ্গেও মোকাবেলা করতে হবে।'

'আমি কিন্তু বলব যে আপনাদের ভুল হচ্ছে। ওয়েলস এবং পশ্চিমের অন্যান্য সব লেখক যখন দুই দুনিয়ার সাক্ষাতের কথা ভাবেন তখন লড়াই করে দখল করা ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারেন না। ওঁদের মাথাটাই গড়ে উঠেছে ওই ভাবে। পুঁজিবাদের সেই পাশবিক নিয়মগুলোকে ওঁরা চাপাতে চান সমস্ত তারকামণ্ডলীতে. আমার ধারণা, জলের ব্যাপারে মঙ্গলগ্রহের যা অবস্থা আর মঙ্গলবাসীরা যে প্রকাণ্ড সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে

তা দেখে তাদের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্য সিদ্ধান্ত করা উচিত। এমন সমাজব্যবস্থা যাতে গোটা গ্রহ জুড়ে ও ধরনের পরিকল্পিত অর্থনীতি চালানো সম্ভব।'

'আপনি বলতে চাইছেন যে খুব একটা নিখুঁত ধরনের সমাজব্যবস্থা সেখানে বর্তমান?' জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি

'বুদ্ধিমান প্রাণীদের সমাজব্যবস্থা আর অন্য কিছু হতে পারে না,' প্রত্যয়ের সুরে বললেন ভূগোলবিদ।

ক্রিমোভ সায় দিয়ে বললেন, 'তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মঙ্গলগ্রহ থেকে ক্রমাগত জল অন্তর্ধান করছে। অধিবাসীদের দেখতে হবে বৈকি যাতে ভবিষ্যৎ পুরুষেরাও বেঁচে থাকে, যেমন এখানে আমাদের সমসাময়িকরাও নজর রাখেন ভবিষ্যৎ পুরুষদের জন্যে। মঙ্গলগ্রহে জল পেতে হবে মঙ্গলগ্রহবাসীদের... সে জল আছে। জল আছে মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি গ্রহগুলোতে, আছেও প্রচুর পরিমাণে এবং তা আছে সর্বাগ্রে পৃথিবীতে। গ্রীণল্যাণ্ডের কথা ধরুন। তিন কিলোমিটার পুরু বরফে তা ঢাকা। এ বরফ সরিয়ে নিলে ইউরোপের আবহাওয়াই অনেক ভালো হয়ে উঠবে। মস্কোর আশেপাশে কমলালেবু ফলবে। অথচ এ বরফ যদি মঙ্গলগ্রহে চালান দেওয়া যায় তাহলে গলে গিয়ে গোটা গ্রহটাকে ৫০ মিটার পুরু একটা স্তরে তা ঢেকে ফেলতে পারে, অতীত মহাসাগরগুলোর সমস্ত গহ্বর তাতে ভরে উঠবে এবং আরো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবন চলতে থাকবে সেখানে!'

'মঙ্গলগ্রহবাসীরা তাহলে পৃথিবীটাকে চায় না, চায় কেবল তার জল?' জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি।

'নিশ্চয়। মঙ্গলগ্রহের চেয়ে পৃথিবীর অবস্থা এতই আলাদা যে মঙ্গলগ্রহবাসীরা পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিয়ে চলা ফেরা করতে পারবে না। এখানে তাদের ওজন বেড়ে উঠবে দুগুণ। নিজের ওজনটা হঠাৎ দুগুণ বেড়ে গেল, ভেবে দেখুন। পৃথিবী জয় করার কোনো কারণ নেই মঙ্গলবাসীদের। তাছাড়া ওদের সংস্কৃতি যেহেতু খুব উঁচু স্তরের, সমাজব্যবস্থাও নিখুঁত, তাই যুদ্ধের কথা সম্ভবত তারা জেনে থাকবে কেবল তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে। আমাদের কাছে তারা তাই আসবে বন্ধুর মতো, সাহায্যের জন্যে, বরফের জন্যে।'

'গ্রহে গ্রহে বন্ধুত্ব!' বলে উঠলেন নিজোভস্কি, 'কিন্তু গ্রীণল্যাণ্ডের বরফ মঙ্গলগ্রহে চালান দেওয়া — সে কী করে সম্ভব?'

'একটা লোহার ব্যোমযান যদি গ্রহান্তরে যাত্রা করতে পারে, তাহলে বরফে তৈরি অথবা বরফে ভর্তি একটা ব্যোমযানও তা করতে পারবে। লক্ষ লক্ষ এই ধরনের ব্যোমযান যাবে পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে। সবই একসঙ্গে নয় অবশ্য, ধরা যাক কয়েক শতক ধরে। তাতে শেষ পর্যন্ত গ্রীণল্যাণ্ডের সমস্ত বরফ পৌঁছে যাবে মঙ্গলগ্রহে, আর মঙ্গলগ্রহও সেই সঙ্গে নতুন উন্নততর পরিস্থিতিটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকবে। এর জন্যে যে শক্তি দরকার সেটা অন্তর্গ্রহ জাহাজ জোগাড় করবে পরমাণু তেজ থেকে।'

'পরমাণু তেজ?' বললেন ভূগোলবিদ, 'তার মানে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুঙ্গুস তাইগায় যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল সেটা পরমাণু জ্বালানির?'

'কোনো সন্দেহ নেই আমার। অনেক প্রমাণ আছে তার। আগেই যা বলেছি তাছাড়া আরো কিছু যোগ করি। ভাস্বর মেঘগুলোর কথা মনে আছে? প্রতিফলিত সূর্য রশ্মির চেয়েও বেশি কিরণ আসছিল সেখান থেকে. রাত্রে একটা সবজে গোলাপী আলো দেখা গিয়েছিল যা মেঘ ভেদ করেও আসত। নিশ্চয় বাতাসের ভাস্বরতার ফল তা। ব্যোমপোতটায় বিস্ফোরণ হতেই তার সমস্ত পদার্থ বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়, সেখানে বাদবাকি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো তখনো বিশ্লিষ্ট হতে থাকে, ফলে জ্বলতে থাকে বাতাস। মনে আছে, লুচেৎকানের ছেলে মারা যায় কী ভাবে, গায়ে তার কোনো পোড়া ক্ষত ছিল না। সন্দেহ নেই যে ওটা তেজস্ক্রিয়তার ফল, পরমাণু বিস্ফোরণের পর যা ঘটে।'

'নাগাসাকি আর হিরোসিমায় যা ঘটেছিল তার সঙ্গে দেখছি অনেক মিল!' বললেন ভৌগোলিক।

'কিন্তু ওতে করে কারা আসছিল আমাদের কাছে, মরলই বা কেন?' জিজ্ঞেস করল নাতাশা।

কী যেন ভাবলেন ক্রিমোভ।

'বিশিষ্ট নাক্ষত্রবিদদের কাছে আমি একটা হিসেব চেয়েছিলাম, মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসতে কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি উপযোগী। মানে, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে কেবল পনের বছরে একবার।'

'আর ঘটনাটা ঘটেছিল কোন সালে?'

'১৯০৯ সালে।' চট করে বলে উঠল নাতাশা।

'তাহলে তো খাটছে না।' ক্যাপ্টেন বললেন হতাশ হয়ে।

'যদি শুনতে চান তবে বলি, খাটছে। মঙ্গলবাসীদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হত ১৯০৭ সাল, কিংবা ১৯০৯ সাল, কিন্তু কোনোক্রমেই ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন নয়।'

'কী আফশোস!' নিজোভস্কি বললেন।

হাসলেন ক্রিমোভ।

'আরে দাঁড়ান, সবটা বলিনি এখনো। নক্ষত্রবিদদের হিসাব থেকে একটা অদ্ভুত রকমের মিল চোখে পড়ছে।'

'কী রকম, কী রকম মিল?'

'আন্তর্গ্রহ ব্যোমযান যদি শুক্রগ্রহ থেকে রওনা দেয় তাহলে পৌঁছনোর সবচেয়ে যোগ্য দিন হত ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন।'

'আর তাইগার বিপর্যয়টা ঘটেছিল কবে?'

'১৯০৮ সালের ৩০শে জুন!'

'বলেন কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন নিজোভস্কি, 'শুক্রগ্রহের লোক তাহলে?'

'মনে হয় না তা... প্রসঙ্গত বলি যে, নক্ষত্রবিদরা বলেছিলেন যে শুক্রগ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসার পক্ষে অবস্থা ঐ সময়টাতেই সবচেয়ে অনুকূল। ১৯০৮ সালের ২০শে মে যাত্রা করে রকেটটা শুক্রগ্রহ ও পৃথিবীর মাঝখানে থেকে ওদের সঙ্গে একই দিকে উড়ে গেলে পৃথিবীতে যখন পৌঁছত সেটা শুক্র ও পৃথিবীর মুখোমুখি হবার কয়েক দিন আগে।'

'ও নিশ্চয় শুক্রগ্রহের লোক। কোনো সন্দেহই নেই,' নিজোভস্কি বললেন উত্তেজিতভাবে।

'মনে হয় না তা..' দৃঢ়ভাবেই আপত্তি করলেন জ্যোতির্বিদ, 'শুক্রগ্রহে কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব বেশি, বিষাক্ত গ্যাসের লক্ষণও দেখা গেছে। সেখানে খুব উচ্চবিকশিত প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।'

'কিন্তু উড়ে যখন এল, তার মানে সে রকম প্রাণীর অস্তিত্ব আছেই।' তর্ক করলেন নিজোভস্কি, 'শুক্রগ্রহ থেকে তো আর মঙ্গলবাসীরা আসতে পারে না।'

'ঠিকই ধরেছেন, আমার ধারণা তাই ঘটেছে '

'মানে, কী বলছেন!' হতভম্ব হয়ে উঠলেন নিজোর্ভাস্কি, 'তার কী প্রমাণ আছে আপনার?'

'প্রমাণ আছে। এ অনুমান করা খুবই যুক্তিসিদ্ধ যে কাজে লাগাবার মতো জলের সন্ধানে মঙ্গলবাসীরা প্রতিবেশী দুটি গ্রহেই সন্ধান চালাবার কথা ভেবেছিল, যেমন শুক্র আর পৃথিবী। প্রথমে সবচেয়ে অনুকূল সময়ে তারা যায় শুক্রে, তারপর... ১৯০৮ সালের ২০শে মে শুক্র থেকে যাত্রা করে পৃথিবীর দিকে... বোঝা যায় যাত্রাপথেই মহাজাগতিক কিরণ অথবা উল্কার সঙ্গে সংঘাত অথবা অন্য কোনো কারণে অভিযাত্রীরা মারা পড়ে। কোনো পরিচালক ছিল না ব্যোমযানটার, পৃথিবীর দিকে আসছিল ঠিক একটা উল্কার মতোই। সেই জন্যই ব্রেক কষে গতি না কমিয়েই তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুর সংঘর্ষে তা গরম হয়ে ওঠে ঠিক উল্কার মতোই। বাইরের আবরণ গলে যায় আর পরমাণু জ্বালানি তার ফলে পরস্পর প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়। বিস্ফোরণ ঘটে আকাশেই। তাই নিখুঁত হিসাবে যা দেখা যাচ্ছে, তাদের রকেটটার যেদিন পৃথিবীতে পৌঁছবার কথা সেই দিনই গ্রহান্তরের আগন্তুকরা মারা যায়... খুবই সম্ভব যে মঙ্গলগ্রহে সেদিন লোকে সশঙ্ক অপেক্ষা করে দেখছিল।'

'একথা ভাবছেন কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা এই যে ১৯০৯ সালে দুই গ্রহ মুখোমুখি হবার সময় পৃথিবীর বহু জ্যোতির্বিদ মঙ্গলগ্রহে আলোর ফুলকি দেখে খুবই আলোড়িত হয়ে উঠেছিলেন।'

'সিগন্যাল নাকি?'

'হ্যাঁ, কেউ কেউ বলেছিল সিগন্যাল, কিন্তু সন্দেহবাদীদের আপত্তিতে তাদের কথা ডুবে যায়।'

'নিজেদের যাত্রীদের সিগন্যাল দিচ্ছিল ওরা' বললে নাতাশা।

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'সম্ভবত। পনের বছর কাটল তারপর। তখন ১৯২৪ সাল। রুশ বৈজ্ঞানিক পপোভের আবিষ্কৃত রেডিও ততদিনে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই গ্রহের মুখোমুখি হবার সময় বহু রেডিও সেটে অদ্ভুত সব সংকেত ধরা পড়েছিল। মঙ্গলগ্রহ থেকে রেডিও সংকেত নিয়ে খুব সোরগোল

উঠেছিল তখন। লোকে বলাবলি করত, মার্কনির রসিকতা। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন. যাই হোক, হুজুগে পড়ে তিনিও মঙ্গলগ্রহ থেকে সংকেত ধরার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ একটা অভিযান সংগঠন করেন তিনি, কিন্তু . . কিছু পাননি। পৃথিবীর রেডিও কেন্দ্রগুলো যে ধরনের দীর্ঘ তরঙ্গ নিয়ে কাজ করে না, সেই তরঙ্গে কিছু সংকেত এসেছিল, কিন্তু তার পাঠোদ্ধার করতে পারেনি কেউ।'

'পরের বার যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তখন কী ঘটেছিল?' উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিজোভস্কি।

'১৯৩৯ সালে জ্যোতির্বিদ বা রেডিও বিশেষজ্ঞ কেউ কিছুই দেখেননি মঙ্গলগ্রহবাসীরা আগের দুই বারে তাদের ব্যোমযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে থাকবে, কিন্তু পরে সম্ভবত স্থির করে যে তাদের মৃত্যু হয়েছে।'

'খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়... আর সত্যিই উত্তেজিত করার মতো,' বললেন নিজোভস্কি।

'পরের বার মুখোমুখি হওয়ার পালা ১৯৫৪ সালে,' একটু চুপ করে থেকে বললেন ক্রিমোভ, 'ততদিনে আন্তগ্রহ যাত্রায় জীবসত্তাকে মহাজাগতিক কিরণ থেকে রক্ষার উপায় মঙ্গলগ্রহবাসীরা পেয়ে যাবে কি না জানি না... ব্যক্তিগতভাবে আমার আশা অন্যরকম। পরমাণু তেজের ব্যাপারটা আমরা সোভিয়েতের লোক ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছি। আমাদের দেশটা জেট গতির জন্মভূমি। বিস্ময়কর গতি অর্জনের সম্ভাবনা দিচ্ছে আমাদের জেট ইঞ্জিনগুলো। আগামীকাল আন্তগ্রহ যাত্রা নিয়ে ভাবনার দায়টা এই আমাদের বলশেভিকদেরই কাঁধে।'

'মঙ্গলগ্রহে যাবেন আপনি?' প্রায় ভয় পেয়েই জিজ্ঞেস করল নাতাশা।

'হ্যাঁ, যাব। মঙ্গলগ্রহে যে আমি যাবই সে বিষয়ে খুবই নিশ্চিত আমি মেধাবী প্রাণীর বিকাশ, বিজ্ঞানের বিকাশ পৃথিবীতে ঘটছে মঙ্গলগ্রহের চেয়ে অনেক অনুকূল পরিস্থিতিতে। ওদের চেয়ে আমরাই ওদের গ্রহে উড়ে যাব আগে, আর অনেক সাফল্যের সঙ্গে...'

থামলেন ক্রিমোভ, তারপর হাসলেন।

'দেখছেন তো, জ্যোতির্বিদ আমি হয়েছি কী জন্যে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি কথাই বোধ হয় বললাম। কিন্তু দোষটা কনিয়াকের।'

'মাফ করবেন,' বললেন নিজোভস্কি, 'পেশায় আমি প্যালিয়নটলজিস্ট টুকরো টাকরা হাড় থেকে আমরা অতীত কালের জীবজন্তুদের মূর্তি গড়ে তুলতে পারি। মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিপ্রবণ প্রাণীরা দেখতে কেমন সেটা কি আন্দাজ করা যায় না? আপনি তো সেখানকার পরিস্থিতি সবই জানেন। বলুন না একটু, গ্রহান্তরের আগন্তুকদের কেমন লাগবে দেখতে।'

ক্রিমোভ হাসলেন।

'আমিও ভেবেছি তা নিয়ে। বেশ, শুনুন, ভালো কথা, আপনাদের জনৈক সহকারী প্যালিয়নটলজিস্ট ও লেখক ইয়েফ্রেমভ এ বিষয়ে যা বলেছেন সেটা আমি পড়েছি। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমি একমত... একটা মস্তিষ্ক কেন্দ্র, তার কাছেই স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় .. এতো বটেই। তারপর, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, যাতে অনেকখানি দেখা যায়। তারপর বাইরের চেহারা, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া অতি কঠোর, চূড়ান্ত রকমের বদল হয় তাপ মাত্রায়। তাই সম্ভবত তারা সুদর্শন নয়। কোনো একটা রক্ষণী আবরণ তাদের থাকার কথা —পুরু এক থাক চর্বি, গা ভরা ঘন লোম নয়ত বেগুনী রঙের চামড়া, যা মঙ্গলগ্রহের উদ্ভিদের মতোই তাপ রশ্মি শোষণ করবে। লম্বা হওয়ার কথা নয় তাদের... মাধ্যাকর্ষণ টান সেখানে বেশি নয়... পেশী আমাদের চেয়ে কম বিকশিত। আর কী? ও হ্যাঁ!.. শ্বাসযন্ত্র। খুবই বিকশিত শ্বাসযন্ত্র থাকবে তাদের, কেননা মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে যে নিতান্ত স্বল্প পরিমাণ অক্সিজেন আছে তাকে টেনে নিতে পারা চাই... অবিশ্যি এসবের সঠিকতা সম্পর্কে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়...'

'আর শুক্রগ্রহে যারা বাস করে তাদের চেহারাটা কী রকম হবে?' চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন নিজোভস্কি।

হোহো করে হেসে উঠলেন জ্যোতির্বিদ।

'এ ব্যাপারে কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারব না। ও গ্রহটা সম্পর্কে খুবই কম জানি আমরা...'

'তাহলেও শুক্রগ্রহ থেকেই তো ওরা উড়ে এসেছিল,' মৃদুস্বরে বললেন নিজোভস্কি

ক্রিমোভ মাথা নাড়লেন।

আসর ভাঙল যখন তখন মাঝ রাতও পেরিয়ে গেছে। বরিস ইয়েফিমভিচ তো একেবারে গদগদ।

'এই না মানুষ! কী এক লক্ষ্যেই না জীবন চালাচ্ছে। আমাদের এই উত্তর মেরুর অভিযানে অমনি ধারা লোক পেলে তবেই না!'

মনে পড়ে জ্যোতির্বিদের সঙ্গে বিদায়ের পালাটা. নাতাশার সঙ্গে উনি নেমে গেলেন খোলদনায়া জেম্‌লিয়ায়, সেখানকার স্থানীয় উদ্ভিদের প্রতিফলন ক্ষমতা যাচাই করবেন।

মোটরবোটে নামানো হল যন্ত্রপাতি। নাতাশা আর ক্রিমোভ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। জাহাজ থেকে বিদায় ভোঁ বাজালেন ক্যাপ্টেন - এটিতে ওঁর কখনো অন্যথা হয় না, এসব বিষয়ে ভারি মনোযোগী আমাদের ক্যাপ্টেন, বরিস ইয়েফিমোভিচ!

জাহাজের রেলিং থেকে ঝু'কে নিজোভস্কি চ্যাঁচালেন:

'ওরা কিন্তু এসেছিল শুক্রগ্রহ থেকেই!'

'মঙ্গলগ্রহ থেকে!' চেঁচিয়ে জবাব দিলেন ক্রিমোভ। হাসছিলেন না তিনি। মুখটা তার গম্ভীর

ঢেউয়ে নাচতে নাচতে ছোটো হয়ে এল মোটরবোটটা। দূরে উপকূলের খাঁজকাটা তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেটা।

এক ঘণ্টা পরে বোট ফিরে এল:

'গেওর্গি সেদোভ' তোড়জোড় শুরু করল যাত্রার জন্যে।

আলেক্সান্দর বেলিয়ায়েভ

হৈটি টৈটি

প্রফেসর ভাগনারের আবিষ্কার
আলেক্সান্দর বেলিয়ায়েভ কর্তৃক সংগৃহীত
তাঁর জীবনীর মালমশলা

১। একজন অসাধারণ খেলোয়াড়

বার্লিনের মস্ত বৃশ সার্কাসটি লোকে লোকারণ্য। চওড়া ব্যালকনিগুলোতে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো ওয়েটাররা ছুটোছুটি করছে বিয়ারের মগ নিয়ে। যাদের পানপাত্রের ঢাকনা খোলা, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তৃষ্ণা মেটেনি, তাদের সামনে নতুন মগ ভর্তি করে দিয়ে যাচ্ছে তারা। একেবারে মেঝের উপর রেখে দিয়েই ছুটছে আরো তৃষিতদের ডাকে সাড়া দিয়ে। আইবুড়ি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যে সব গিন্নিবান্নি মহিলারা এসেছে, তারা গ্রিজ-প্রুফ প্যাকেট খুলে স্যাণ্ডউইচ চিবুচ্ছে আর কালো পুডিং ও ফ্রাঙ্কফুর্ত সসেজ খাচ্ছে গভীর অভিনিবেশ সহকারে; চোখ তাদের সবারই রঙ্গভূমির দিকে।

অবিশ্যি একথা বলতেই হবে যে দর্শকেরা এত যে বিপুল সংখ্যায় এসেছে সেটা ঐ ফকিরের খেল বা ব্যাঙ গিলে খাওয়া মানুষটার জন্যে নয়। এ অংশ কখন শেষ হবে তার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই, কখন আসবে হৈটি টৈটির পালা। তার সম্পর্কে নানা রকম সব আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী শোনা গেছে, কাগজে প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাকে নিয়ে, বৈজ্ঞানিকেরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে এক হেঁয়ালী, লোকে তাকে নিয়ে

পাগল। তার প্রথম আগমন থেকেই সার্কাসের টিকিট ঘরে ঝুলতে শুরু করেছে 'হাউসফুল' নোটিস। যারা কোনো দিন সার্কাসের চৌকাটও মাড়ায়নি তারাও এসে জুটতে শুরু করেছে এখানে। গ্যালারি আর পিট অবিশ্যি নিয়মিত সার্কাসভক্তদের দিয়েই অর্থাৎ মজুর কেরাণি, দোকানী, দোকানকর্মচারী আর তাদের পরিবার দিয়েই ভরা। কিন্তু বক্স আর স্টলে দেখা যেতে লাগল সেকেলে ওভারকোট আর ম্যাকিন্তোশ পরা ভার-ভারিক্কী, পাকাচুলো, গুরুগম্ভীর এমন কি রীতিমতো ভ্রূকুঞ্চিত লোকেদেরও। সামনের সারিগুলোয় বেশ কিছু যুবক ছিল বটে, কিন্তু তারাও সমান গম্ভীর ও নীরব। স্যান্ডউইচও চিবুচ্ছিল না, বিয়ারও খাচ্ছিল না। ব্রাহ্মণের মতো আত্মসমাহিত টান টান হয়ে বসে তারা অপেক্ষা করছিল দ্বিতীয় অংশটার জন্যে, হৈটি টৈটির জন্যে — এরই জন্যে তাদের আসা।

ইন্টারভেলের সময় একমাত্র আলাপ শোনা গেল হৈটি টৈটির আসন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে। প্রথম সারিগুলোর বিদগ্ধজনদের মধ্যে এবার জীবনের লক্ষণ দেখা গেল। বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটা আগতপ্রায়, বেজে উঠল তুরীভেরী। সোনালী আর লাল রঙের চাপরাশ পরা সার্কাসের লোকেরা সব দাঁড়াল সারি দিয়ে। হাট করে টেনে খোলা হল প্রবেশ পথের পর্দা, আর দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হাততালির মধ্যে এগিয়ে এল হৈটি টৈটি — একটি প্রকান্ড হাতি, মাথায় সোনালী ফুল তোলা, ঝালর ও থুপি শোভিত একটি টুপি। তার সঙ্গে একটি ফ্রক কোট পরা বেঁটে লোক। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নুয়ে অভিবাদন করলে হাতিটি তারপর রঙ্গভূমির ঠিক মাঝখানটিতে এসে চুপ করে দাঁড়াল।

'আফ্রিকান হাতি,' গলা খাটো করে সহযোগীকে বললেন একজন পাকাচুলো প্রফেসর।

'আমার বেশি ভালো লাগে ভারতীয় হাতি। তাদের আকার বেশি গোল। দেখলে বেশ একটা, মানে, সংস্কৃতিবান প্রাণী বলে মনে হয়। আফ্রিকান হাতি কেমন একটু বদখত, হাড় খোঁচা। এ রকম হাতি যখন শুঁড় বাড়িয়ে দেয় তখন দেখায় যেন একটা শিকারী পাখি।'

হাতির পাশে দাঁড়াতে বেঁটে লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল 'ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আমাদের বিখ্যাত হাতি হৈটি টৈটির সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। দেহের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার মিটার। উঁচু সাড়ে তিন মিটার। শুঁড়ের ডগা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত ধরলে লম্বায় নয় মিটার'

হৈটি টৈটি হঠাৎ তার শুঁড় বাড়িয়ে দিলে লোকটার সামনে।

'মাফ করবেন ভুল হয়েছে।' লোকটা বললে, 'শুঁড় লম্বায় দুই মিটার, আর লেজ প্রায় দেড় মিটার। তাই শুঁড়ের ডগা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত ধরলে দাঁড়ায় সাত মিটার নব্বই সেণ্টিমিটার। দিন খায় ৩৬৫ কিলোগ্রাম শব্জি আর ১৬ বালতি জল।'

'হাতির হিসেব দেখছি লোকটার চেয়ে বেশি সঠিক,' কে যেন বললে।

'লক্ষ্য করেছিলেন, ট্রেনারের ভুলটা হাতি কী ভাবে শুধরে দিল!' জীববিদ্যার অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সহযোগীকে।

'নিতান্তই কাকতালীয়,' জবাব দিলেন অন্যজন।

'দুনিয়ার সর্বকালের অত্যাশ্চর্য হাতি হৈটি টৈটি,' ট্রেনার বলে চলল, 'এবং সম্ভবত পশু জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো প্রতিভাধর। জার্মানে ভাষা বোঝে সে... তাই না হৈটি?' হাতিকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করল সে।

ভারিক্কী চালে মাথা নাড়ল হাতি। তুমুল করতালি উঠল দর্শকদের মধ্যে।

'যত বুজরুকি,' বললেন প্রফেসর শ্মিৎ।

'দাঁড়ান না, এর পরে দেখবেন,' বললেন শ্তল্‌ৎস্।

'হৈটি টৈটি হিসেব করতে পারে, সংখ্যা চেনে ...'

'বক্তৃতা যথেষ্ট হয়েছে, এবার দেখাও!' গ্যালারি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

অবিচলিতভাবে ফ্রককোট পরা লোকটি বলে চলল, 'সন্দেহ নিরসনের জন্যে আমি দর্শকদের জন কয়েককে এখানে আসার অনুরোধ করছি। তাঁরা আপনাদের সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে কোনো চালবাজি নেই এর মধ্যে।'

শ্মিৎ আর শ্তলৎস মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এগিয়ে গেলেন রঙ্গভূমির দিকে।

হৈটি টৈটি তার আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাতে শুরু করল। একটা সংখ্যা লেখা চৌকো কার্ডবোর্ডের একটা স্তূপ রইল তার সামনে, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে তা থেকে বেছে বেছে নিখুঁত উত্তরটি তুলে ধরতে লাগল হাতি। প্রথমে

দেওয়া হল এককের অঙ্ক, তারপর দুই সংখ্যার, তারপর তিন সংখ্যার। একবারও ভুল না করে প্রতিটি অঙ্ক কষে দিল হাতি।

'এবার কী বলবেন আপনি,' জিজ্ঞেস করলেন শ্‌তেল্‌ৎস।

'বেশ, দেখা যাক সংখ্যা ও বোঝে কতটা,' হার না মেনে বললেন শ্‌মিৎ। তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সামনে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো দেখি হৈটি টৈটি, এখন কটা বেজেছে?'

এক ঝটকায় শুঁড় দিয়ে ঘড়িটা শ্‌মিৎ-এর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের কাছে দোলাল কিছুক্ষণ, তারপর অপ্রস্তুত মালিককে ঘড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে কার্ডবোর্ডের সংখ্যাগুলো দিয়ে উত্তর খাড়া করল:

'১০·২৫।'

শ্‌মিৎ তাঁর ঘড়িটার দিকে চেয়ে হতভম্বের মতো কাঁধ ঝাঁকালেন, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ই বলেছে হাতিটা।

তারপর পড়ার পালা। স্রৈনার হাতির সামনে রাখতে লাগল জীবজন্তুর বড়ো বড়ো ছবি। অন্য সব কার্ডবোর্ডে লেখা ছিল সিংহ, হাতি, বাঁদর। এক একটা ছবি দেখান হয় হাতিকে আর শুঁড় দিয়ে সে জন্তুর নাম লেখা কার্ডবোর্ডটা দেখাতে লাগল হাতি। একবারও ভুল হল না। ব্যাপারটা উল্টো করে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন শ্‌মিৎ। প্রথমে লেখাটা দেখালেন, তারপর ছবিটা বার করতে বললেন। এতেও কোনো ভুল হল না হাতির।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণমালাই সাজিয়ে ধরা হল হৈটি টৈটির সামনে। এবার এক একটি অক্ষর নিয়ে শব্দ তৈরি করে সে প্রশ্নের জবাব দেবে।

'কী নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন শ্‌তেলৎস্‌।

'এখন ... হৈটি টৈটি।'

'এখন মানে?' জিজ্ঞেস করলেন শ্‌মিৎ, 'আগে কি অন্য নাম ছিল? কী নাম?'

'স্যাপিয়েন্স,*' জবাব দিল হাতি।

'হোমো স্যাপিয়েন্স** বোধ হয়?' হেসে বললেন শ্‌তেলৎস।

---

* স্যাপিয়েন্স (Sapiens) লাতিন ভাষায় অর্থ বুদ্ধিসম্পন্ন। সম্পাঃ

** হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens) লাতিন ভাষায় অর্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, স্তন্যপায়ী জীবের বৈজ্ঞানিক বর্গবিভাগ অনুসারে মানুষ। সম্পাঃ

'সম্ভবত,' হেঁয়ালি ভরে জবাব দিলে হাতি।

তারপর অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে যে বাক্যটি গড়ল তা এই: 'আজকের মতো এই যথেষ্ট।'

ট্রেনারের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে হৌটি টৌটি চারি দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে রঙ্গভূমি ছেড়ে চলে গেল।

ইণ্টারভেলের সময় প্রফেসররা জুটলেন ধূমপানের ঘরে, ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে উত্তেজিত আলাপ শুরু হয়ে গেল তাঁদের মধ্যে।

ঘরের এককোণে তর্ক করছিলেন শ্মিৎ আর শ্তেলৎস্।

শ্মিৎ বলছিলেন, 'মনে আছে, কয়েক বছর আগে হ্যানস নামের একটা ঘোড়া কী রকম চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল? ঘোড়াটা যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল বার করে দিতে পারত, নানা রকম অঙ্ক কষত। খুর ঠুকে ঠুকে উত্তর দিত। পরে ফাঁস হল যে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। তার ট্রেনার তাকে কতকগুলো গোপন সংকেত দিত আর সেই অনুসারে পা ঠুকত সে। একটা চোখ না ফোটা কুকুর বাচ্চার চেয়ে বেশি কিছু অঙ্ক তার জানা ছিল না।'

'সেটা মাত্র অনুমান,' আপত্তি করলেন শ্তেলৎস।

'তাছাড়া থর্নডাইক আর ইয়র্ক্স-এর পরীক্ষাটা? প্রাণীদের মধ্যে যে স্বাভাবিক এসোসিয়েশন বোধ আছে, তারই তালিম দেওয়া। এক সার বাক্সের সামনে দাঁড় করানো হল জন্তুটাকে। এর একটি বাক্সে খাবার রাখা। ধরা যাক, সে বাক্সটা ডান দিক থেকে দ্বিতীয়। কোন বাক্সে খাবার আছে আন্দাজ করতে পারলেই সে বাক্সটা আপনা থেকে খুলে গিয়ে খাবার দেবে জন্তুটাকে। এই ভাবে জন্তুটার মধ্যে একটা বলা যেতে পারে নির্দিষ্ট এসোসিয়েশন তৈরি হয়ে যাবে — ডান দিক থেকে দ্বিতীয় বাক্স মানে খাবার। তারপর বাক্সের পরম্পরা বদলে নেওয়া যায়।'

'কিন্তু আপনার ঘড়ির মধ্যে তো আর খাবারের বাক্স ছিল না,' ব্যঙ্গভাবে বললেন শ্তেলৎস্, 'অন্তত ঘটনাটার ব্যাখ্যা কী দেবেন?'

'কী আবার, আমার ঘড়ির মাথামুণ্ড কিছুই হাতিটা বোঝেনি। একটা চকচকে গোল জিনিসকে সে কেবল তার চোখের সামনে ধরেছিল। কার্ডবোর্ডগুলোয় সে যখন সংখ্যা বাছছিল তখন স্পষ্টতই ট্রেনারের কোনো একটা নির্দেশ মেনে চলছিল সে, যা আমরা ধরতে পারছিলাম না। এ সবই

বুজরুকি, ট্রেনার যখন তার দৈর্ঘ্যের হিসাবে ভুল করেছিল তখন যে হাতি তাকে শুধরে দিল এ সবই বুজরুকি। কনডিশণ্ড রিফ্লেক্স, আর কিছু নয়।'

শ্তেলৎস্ বললেন, 'সার্কাস ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি খেলা শেষ হবার পরেও আমার জন কয়েক বন্ধু নিয়ে থেকে যাব কিছুক্ষণ। হৈটি টৈটির ওপর আরো কয়েকটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে আছে। আশা করি আপনিও থাকবেন?'

'অবশ্যই!' বললেন শ্মিৎ।

২। অপমান সহ্য হয়নি

দর্শকেরা চলে গেল সবাই। কেবল রঙ্গভূমিটার ওপর একটি আলো বাদে নিভে গেল সব বড় বড় বাতি। তখন ফের নিয়ে আসা হল হৈটি টৈটিকে। শ্মিৎ দাবি করলেন, পরীক্ষার সময় ট্রেনার যেন হাজির না থাকেন। বেঁটে লোকটি ততক্ষণে তার ফ্রককোটটি খুলে এসেছে, গায়ে একটি সোয়েটার। কোনো কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'কিছু মনে করবেন না ... মানে মাফ করবেন, আপনার নামটা আমি জানি না।' শুরু করলেন শ্মিৎ।

'য়ুঙ্গ, ফ্রিদ্রিখ য়ুঙ্গ, আজ্ঞা করুন ...'

'রাগ করবেন না শ্রী য়ুঙ্গ। মানে, পরীক্ষাটা আমরা এমন ভাবে চালাতে চাই যাতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে।'

'বেশ চালান,' জবাব দিল ট্রেনার, 'হাতিটাকে ফেরত নিয়ে যাবার সময় হলে ডাকবেন আমায়।' ট্রেনার চলে গেল গেটের দিকে।

পরীক্ষা শুরু করলেন বৈজ্ঞানিকেরা। মন দিয়ে কথা শুনল হাতিটা, প্রশ্নের জবাব দিল, কোনো ভুল না করে নানা রকম অঙ্ক কষল। যা দেখা গেল তা একেবারে আশ্চর্য করার মতো। অমন চটপট জবাব — এ কোনো বুজরুকি, কোনো ট্রেনিঙের দোহাই পেড়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অসাধারণ বুদ্ধি, প্রায় মানুষের মতো একটা মনন শক্তি যে হাতিটার আছে তা মানতেই হয়। শ্মিৎ এতক্ষণে প্রায় আধা নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিলেন, তাহলেও একগুঁয়েমি করে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই অশেষ তর্ক শুনে শুনে হাতিটা স্পষ্টতই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। ঝট করে শুঁড় বাড়িয়ে সে শ্মিৎ-এর ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখিয়ে দিল। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে। তারপর ঘড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে তার ঘাড় ধরে রঙ্গভূমি থেকে তুলে নিয়ে গেল গেটের দিকে। ক্রোধে চ্যাঁচাতে থাকলেন প্রফেসর, কিন্তু তার সহযোগীরা না হেসে পারল না। য়ুঙ্গ আস্তাবলের বারান্দা থেকে ছুটে এসে চেঁচিয়ে ধমক দিতে লাগল হাতিকে, কিন্তু হৈটি টৈটি স্রেফ উপেক্ষা করে গেল তাকে। শ্মিৎকে বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে সে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল রঙ্গভূমির অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দিকে।

'এক্ষুণি যাচ্ছি আমরা, ভাবনা নেই,' হাতিটির উদ্দেশে বললেন শ্তেলৎস্, যেন হাতি নয় মানুষ, 'কিছু মনে করবেন না।'

এই বলে বিব্রতভাবে রঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন শ্তেলৎস্, সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রফেসররাও।

য়ুঙ্গ বললে, 'বেশ করেছিস হৈটি, অর্ধচন্দ্র দিয়ে ঠিকই করেছিস। এখনো অনেক কাজ আমাদের বাকি। হেই! য়োহান, ফ্রিদরিখ, ভিলহেল্ম, কোথায় সব?'

জন কয়েক লোক এসে রঙ্গভূমিটা পরিষ্কার করতে শুরু করল। বালি বিছানো জায়গাটা ফের সমান করে দিলে তারা, প্যাসেজ ধোয়া পাকলা করে খুঁটি, মই, আঙটা সব তুলে নিয়ে গেল। আর সাজসজ্জাগুলো নিয়ে যাবার ব্যাপারে য়ুঙ্গকে সাহায্য করছিল হাতিটা। কিন্তু কাজে কেমন যেন তার মন লাগছিল না। কেন জানি বিরক্ত হয়েছিল সে অথবা রাত্রে এমন অনভ্যস্ত সময়ে দ্বিতীয় আর এক দফা অনুষ্ঠানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল হয়ত। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে মাথা নেড়ে একটা ডেকোরেশনে সে এমন ভাবে টান মারল যে সেটা ভেঙে গেল।

'আস্তে, হারামজাদা কোথ্যকার,' ধমক দিলে য়ুঙ্গ, 'কাজে মন নেই দেখছি। গুমর হয়েছে না। লিখতে পড়তে পারিস, তাই গতর খাটানো কাজে রুচি নেই। ও সব চলবে না ভায়া। এটা তোর ধম্মশালা পাসনি। সার্কাসের সব লোককেই খাটতে হয়। দ্যাখ না এর্লারিখ ফেরিকে। ঘোড়সওয়ার হিসাবে ওর নাম দুনিয়া জোড়া। কিন্তু যখন খেলা দেখাচ্ছে না, তখন চাপরাস পরে সহিসদের সঙ্গে তাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বালি সমান করায় তাকেও হাত লাগাতে হয় ...'

কথাটা সত্যি। হেঁটি টৌটিও তা জানত। কিন্তু এনরিখ ফেরির দৃষ্টান্তে তার মন গলল না। ফের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে রঙ্গভূমি ছেড়ে গেটের দিকে যাবার উপক্রম করল।

'সে কী, পালানো হচ্ছে বটে,' হঠাৎ চটে উঠল য়ুঙ্গ, 'দাঁড়া বলছি।'

একটা ঝাড়ু তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল হাতিটার দিকে, তারপর ঝাড়ুর বাঁটটা দিয়ে বাড়ি মারলে হাতির মুটকো পাছার ওপর। আগে সে হাতিটাকে মারেনি কখনো। হাতিটাও অবশ্য কখনো এমন অবাধ্যতা করেনি। ঝাড়ু মারার সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা এমন ডাক ছাড়ল যে য়ুঙ্গ পেট চেপে ধরে গুড়ি মেরে এমন ভাবে বসে পড়ল মেজের ওপর যেন শব্দ শুনে পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠেছে তার। হাতিটা তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জাপটে ধরে তাকে কয়েকবার কুকুরের বাচ্চার মতো লোফালুফি করলে শূন্যে। শেষ পর্যন্ত মাটির ওপর নামিয়ে দিয়ে ঝাড়ুর হাতলটা দিয়ে বালির ওপর লিখল:

'মারবার স্পর্ধা কোরো না কখনো! আমি জন্তু নই, মানুষ!'

তারপর ঝাড়ু ফেলে এগিয়ে গেল প্রবেশপথের দিকে। ঘোড়ার আস্তাবলগুলো পেরিয়ে পেঁছিল প্রধান ফটকে। সেখানে তার প্রকাণ্ড দেহটা ভর দিয়ে চাপ দিল কাঁধ দিয়ে। মড়মড়িয়ে উঠে এই বিপুল চাপে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল ফটক। ছাড়া পেয়ে এগিয়ে গেল হাতি ...

* * *

ভয়ানক অস্থির একটা রাত কাটাতে হল সার্কাস ম্যানেজার লুদভিগ শ্ত্রেমকে। যেই একটু তন্দ্রা এসেছে এমনি শোবার ঘরের দরজায় সন্তর্পণে টোকা দিলে আর্দালি, বললে য়ুঙ্গ দেখা করতে এসেছে জরুরী দরকারে। সার্কাসের লোকজনেরা খুবই তালিম পাওয়া মানুষ। শ্ত্রেম বুঝল, এত রাতে তার ঘুমে ব্যাঘাত করতে যখন এসেছে তখন নিশ্চয় গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে চটি পায়ে তাকে উঠে আসতে হল বসবার ছোট ঘরটায়। জিজ্ঞেস করলে:

'কী ব্যাপার য়ুঙ্গ ?'

'ভয়ানক বিপদ হের শ্ত্রেম। হৈটি টৈটি পাগলা হয়ে গেছে!..' চোখ বড়ো বড়ো করে অসহায়ভাবে হাত নাড়ল য়ুঙ্গ।

'আর আপনি নিজে.. বহাল তবিয়তে আছেন তো য়ুঙ্গ?' জিজ্ঞেস করল শ্ত্রেম।

'বিশ্বাস করছেন না?' ক্ষুব্ধ হল য়ুঙ্গ, 'মোটেই মদ খাইনি, মাথাও ঠিক আছে আমার। আমায় বিশ্বাস না হলে য়োহান, ফ্রিদরিখ, ভিলহেল্মকে জিজ্ঞেস করুন। তারা স্বচক্ষে দেখেছে। হাতিটা আমার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে মাটির ওপর লিখল "আমি জন্তু নই, মানুষ।" তারপর ঘোলোবার তাঁবুর গম্বুজ পর্যন্ত আমায় ছুঁড়ে লোফালুফি করল। তারপর ঘোড়ার আস্তাবল পেরিয়ে ফটক ভেঙে পালাল।'

'সে কী! পালাল! হৈটি টৈটি পালিয়েছে! আরে সেই কথাটা আগে বলতে হয় আহাম্মক। এক্ষুণি ওকে ধরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে সর্বনাশ বাধিয়ে বসবে।'

শ্ত্রেমের মনশ্চক্ষু ভেসে উঠল জরিমানার পুলিসী নোটিস, ক্ষেত নষ্টের জন্যে খামারীদের ক্ষতিপূরণ দাবি করা লম্বা লম্বা ফর্দ; হাতিটা যা কিছু ক্ষতি করবে তা মেটাবার জন্যে মস্ত একটা টাকার আদালতী সমন।

'সার্কাসে আজ কার ডিউটি? পুলিসকে জানানো হয়েছে? হাতি ধরার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?'

য়ুঙ্গ বললে, 'আমার ডিউটি, যা সম্ভব সব করেছি। পুলিসকে জানাইনি। এমনিতেই তারা জানবে। হৈটি টৈটির পেছু ধাওয়া করে কাকুতি মিনতি করেছি তাকে ফেরার জন্যে। ব্যারন, কাউণ্ট, জেনারেলিসিমো, কত ভাবেই না তাকে সম্বোধন করলাম। বললাম, "ফিরে আসুন হুজুর, ফিরে আসুন। মাপ করে দিন এবার। চিনতে পারিনি আপনাকে। সার্কাসে খুব অন্ধকার, হাতি বলে ভুল করে বসেছিলাম।" কিন্তু হাতিটা আমার দিকে একবার কটাক্ষে চেয়ে তাচ্ছিল্যভরে শুঁড় দিয়ে বাতাস ছাড়তেই থাকে। য়োহান আর ভিলহেল্ম মোটর সাইকেল করে তার পেছু নেয়। উত্তার দেন লিন্দেনে পেঁছে তিয়েরগার্তেন ধরে বরাবর পেঁছয় শার্লোতেনবুর্গ রিশস্সে, তারপর সেখান থেকে গ্রুনভাল্দ বনের দিকে। এখন সে হাফেলে চান করছে।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। শ্ত্রেম রিসিভার তুলে নিলেন।

'হ্যালো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই, জেনেছি. ধন্যবাদ .. যা করবার আমরা করেছি ফায়ার ব্রিগেড? ভরসা নেই বরং ওকে না চটানোই ভালো।'

রিসিভার নামিয়ে শ্ত্রেম বললেন, 'পুলিস। বলছিল ফায়ার ব্রিগেড ডাকবে, হোস পাইপ থেকে জল চালিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে হাতিটাকে। কিন্তু হেঁটি টৈটির ব্যাপারে খুব সাবধানে এগুনো দরকার।'

'পাগলাকে ক্ষেপানো উচিত নয়', মন্তব্য করলে য়ুঙ্গ।

'অন্যের চেয়ে হাতিটা আপনাকেই ভালো জানে য়ুঙ্গ। আপনি বরং ওর কাছে গিয়ে আদর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে দেখুন।'

'চেষ্টা করব নিশ্চয় ... না হয় হিণ্ডেনবার্গ বলেই সম্বোধন করব ওকে, কী বলেন?'

য়ুঙ্গ চলে গেল। শ্ত্রেমের সারা রাত কাটল টেলিফোন শুনে, আর টেলিফোনে নির্দেশ দিয়ে. কিছুটা সময় শিখীর দ্বীপের কাছে চান করে কাটায় হাতিটা, তারপর পাশের একটা সব্জী ক্ষেতে চড়াও হয়ে সমস্ত বাঁধাকপি আর গাজর খেয়ে শেষ করে, তারপর আর একটা ফল বাগানে আপেল খেয়ে এগিয়ে যায় ফ্রিদেনসদর্ফ বনের দিকে।

কোনো রিপোর্টেই এমন খবর শোনা গেল না যে হাতিটা লোকের কোনো ক্ষতি করেছে বা ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট করেছে। মোটের ওপর ব্যবহার খারাপ নয়। সাবধানে সে ঘাসে পা না দিয়ে বাগানের পায়ে চলা পথেই গেছে, যথাসম্ভব সড়ক আর বড়ো রাস্তা দিয়েই হেঁটেছে। কেবল ক্ষিদের জ্বালাতেই সে বাগানের শব্জী আর ফলে শুঁড় বাড়িয়েছিল। সেক্ষেত্রেও খুবই বিবেচনা দেখিয়েছে: শব্জীভুঁইয়ের ওপর যথাসম্ভব পা দেয়নি, বাঁধাকপি যা খেয়েছে সেটা বেশ সুশৃঙ্খলভাবে, সারি বরাবর; ফলগাছের ডালপালা কিছু ভাঙেনি।

সকাল ছটায় দ্বিতীয় বার এসে দেখা দিল য়ুঙ্গ। চেহারাটা ক্লান্ত, ধূলিধূসর, মুখ ঘামে নোংরা, পোষাক ভেজা।

'কী খবর য়ুঙ্গ?'

'একই রকম। কোনো অনুনয় বিনয়ই শুনতে চায় না হেঁটি টৈটি। এমন কি "হের প্রেসিডেণ্ট" বলেও ডেকেছিলাম, কিন্তু ক্ষেপে উঠে আমায় ছুড়ে ফেলে জলের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে হামবড়া রোগ লোকেদের মধ্যে যে রূপ নেয়, হাতির বেলায় তা অন্যরকম। তাই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কোনো রকম খেতাব টেতাব না জুড়ে এবার বললাম, "বোধ হয় ভাবছেন আপনি আফ্রিকায় আছেন? কিন্তু এটা তো আফ্রিকা নয়, এ হল ৫২ ৫ উঃ অক্ষাংশ। অবিশ্যি এখন আগস্ট মাস, অনেক ফলমূল শাকশব্জি মিলবে। কিন্তু যখন শীত আসবে তখন কী হবে? কী খাবেন তখন? ছাগলের মতো তো গাছের বাকল খেয়ে থাকতে পারবেন না। মনে রাখবেন, আপনার পূর্বপুরুষেরা, ম্যামথেরা একদিন এই ইউরোপেই বাস করত বটে, কিন্তু ঠান্ডায় তারা সবাই মারা গেছে। তাই সার্কাসে, আপন ঘরে ফিরে আসাই ভালো নয় কি? সেখানে আপনার ঘর মিলবে, গরমে থাকবেন, কাপড় চোপড় পাবেন।" মন দিয়ে শুনল হৈটি টৈটি, খানিকক্ষণ কী ভাবল, কিন্তু... শেষকালে শুঁড়ে করে জল ছাড়তে লাগল আমার ওপর। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দু দুবার স্নান! ব্যস, যথেষ্ট! খুব বিশ্রী একটা সর্দি না ধরলে আশ্চর্যই বলতে হবে...'

৩। যুদ্ধ ঘোষণা

নৈতিক প্রতিক্রিয়ার সব চেষ্টাই বিফল হল। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেই সায় দিতে হল শ্রমকে। একদল ফায়ারমেনকে পাঠানো হল বনে। পুলিসের নেতৃত্বে তারা হাতির দশ মিটার কাছাকাছি এগিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল; তারপর হোস পাইপ থেকে জোরালো একটা জলের তোড় ছাড়া হল হাতির দিকে। এই ধারা-স্নানটা বেশ ভালোই লাগল হাতির, সানন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে জলের দিকে এপাশ ওপাশ ফিরিয়ে স্নান করতে লাগল। এরপর দশটা হোস পাইপ এক করে একটা একক ধারা করে চালানো হল সোজাসুজি হাতির চোখের দিকে। এটা তার একেবারে পছন্দ হল না। ডাক ছেড়ে সে এমন রুখে এগিয়ে গেল ফায়ারমেনদের দিকে যে তারা ভয় পেয়ে হোস ফেলে দৌড় মারল। মুহূর্তের মধ্যে হোস খসে উল্টে পড়ল ফায়ার ইঞ্জিন।

সেই মুহূর্ত থেকে খেসারতের যে বিল শ্রমের শোধ করার কথা, তা দ্রুত চড়তে লাগল। পুরোপুরি চটে উঠল হাতিটা। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল লোকেদের সঙ্গে হাতির, এবং এ যুদ্ধ যে মানুষদের পক্ষে বেশ মহার্ঘই হবে সেটা দেখাতে সে কসুর করল না ফায়ার ব্রিগেডের গোটা কয়েক গাড়ি সে

জলে ফেলে দিলে; ফরেস্টারের গ্মটিটাকে ভেঙে ফেলল, একজন প্লিসকে ধরে ছ্বঁড়ে দিলে গাছের ওপর। আগে সে সতর্কতা দেখিয়েছিল, কিন্তু এখন সে যা অনিষ্ট করতে শ্বর্ব করল তার আর সীমা পরিসীমা রইল না। তাহলেও, এই ধ্বংসের মধ্যেও একটা অদ্ভুত বিবেচনার সেই লক্ষণগ্বলো কিন্তু বাদ যায়নি; একটা সাধারণ হাতি ক্ষেপে গেলে যা ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি করা সম্ভব ছিল তার।

ফ্রিদেনসদর্ফ বনের এই ঘটনার রিপোর্ট প্বলিসকর্তার কানে যেতেই তিনি হ্বকুম দিলেন, রাইফেলধারী বিরাট একদল প্বলিস যাক, বন ঘেরাও করে মেরে ফেল্বক হাতিটাকে। শ্রম একেবারে হতাশ হয়ে উঠলেন, এমন হাতি আর কখনো যে তিনি পাবেন এ আশা করা যায় না। ক্ষতি যা করেছে হাতিটা তার জন্যে মোটা টাকা ক্ষতিপ্বরণ দেবার ব্যাপারটা তিনি ভেতরে ভেতরে মেনে নিয়েছিলেন। হৈটি টৈটির সম্বিত যদি একবার ফেরে তাহলে সে টাকা সে প্বরোপ্বরি স্বদ সমেত ফিরিয়ে দেবে। প্বলিসকর্তার কাছে আদেশ ম্বলতুবী রাখার জন্য তাই অন্বরোধ জানালেন তিনি, আশা করছিলেন, কোনোক্রমে হয়ত একগ্বঁয়ে হাতিটাকে বাগে আনা যাবে।

'ঠিক দশ ঘণ্টা সময় দিতে পারি আপনাকে,' জবাব দিলেন প্বলিশকর্তা, 'একঘণ্টার মধ্যে গোটা বন ঘিরে ফেলা হবে। দরকার হলে প্বলিসের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীকেও তলব করব।'

একটা জর্বরি বৈঠক ডাকলেন শ্রম। তাতে যোগ দিল সার্কাসের প্রায় সমস্ত লোকেরাই। চিড়িয়াখানার ম্যানেজার ও তাঁর সহকারীরাও হাজির রইল। বৈঠকের পাঁচ ঘণ্টা বাদে সারা বন জ্বড়ে পাতা হল গোপন খাদ আর ফাঁদ। ফাঁদগ্বলো এমন ভাবে পাতা হয়েছিল যে সাধারণ যে কোনো হাতি তাতে ধরা পড়ত। কিন্তু হৈটি টৈটি নয়। বেড়াগ্বলো ঘ্বরে গেল সে, গ্বপ্ত খাদের ওপর থেকে ক্যাম্বফ্লাজ টেনে খসিয়ে দিলে, যে সব তক্তার সঙ্গে গাছের মাথায় বড়ো বড়ো কাঠের গ্বঁড়ির গোপন যোগাযোগ ছিল, তাতে মোটেই পা দিলে না। এরকম একটা গ্বঁড়ি হাতির মাথায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে বেহ্বঁশ হয়ে পড়ে যেত.

সময়ের মেয়াদটা শেষ হয়ে আসছিল। জোরাল বাহিনী দিয়ে ক্রমেই ছোটো করে আনা হচ্ছিল কর্ডনটাকে। গাছের গ্বঁড়ির ফাঁক দিয়ে হাতির

প্রকাণ্ড দেহটাকে দেখা যাচ্ছিল একটা লেকের পাশে, সশস্ত্র পুলিস ক্রমশ এগিয়ে গেল সেদিকে। শুঁড়ে করে জল নিয়ে ফোয়ারার মতো সে জল পিঠের ওপর ছাড়ছিল হাতিটা ...

'রেডি!' খাটো গলায় কম্যান্ড দিলেন অফিসার। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফায়ার!'

একঝাঁক গুলি ছুটে গেল, গোটা বন জুড়ে প্রতিধ্বনি বাজল তার। মাথা নাড়া দিল হাতিটা, রক্ত পড়ছিল মাথা থেকে। তারপর ছুটে গেল পুলিসের দিকে। তারা গুলি করেই চলেছে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটতেই থাকল হাতিটা। পুলিসদের নিশানা খারাপ ছিল তা নয়। তবে হাতির অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে কিছু জানত না তারা; হাতির সবচেয়ে দুর্বল জায়গা তার মস্তিষ্ক আর হার্ট — সেখানে গুলি লাগেনি। আতঙ্কে যন্ত্রণায় সজোরে ডাক ছেড়ে হাতিটা তার শুঁড়টা একবার বাড়িয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিলে: শুঁড় তার অতি জরুরী একটা অঙ্গ, এ না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে তার। তাই শুঁড় সে ব্যবহার করে কেবল চূড়ান্ত ক্ষেত্রে, আত্মরক্ষা বা আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে। মাথা নিচু করে হৈটি টৈটি তার প্রকাণ্ড দাঁত দুটোকে শত্রুর দিকে ভয়ঙ্কর দুটো শাবলের মতো বাগিয়ে ধরল। এক একটা দাঁত লম্বায় আড়াই মিটার, ওজনে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। তবু শৃঙ্খলা মেনে দাঁড়িয়ে ছিল লোকগুলো। জায়গা না ছেড়ে অবিরাম গুলি চালিয়ে যেতে থাকল তারা।

তবু কর্ডন ভেঙে ফেলল হাতিটা। বেড়া গুঁড়িয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পেছু ধাওয়ার ব্যবস্থা হল, কিন্তু ধরা তো দূরের কথা অনুসরণ করাও সহজ ছিল না। পুলিস স্কোয়াডকে যেতে হচ্ছিল রাস্তা ধরে, কিন্তু হাতিটা আর কোনো বাছবিচার করছিল না, ক্ষেত বাগান মাঠ বন ভেঙে ছুটছিল সে।

৪। জাগলার বাঁচালেন

হতাশ হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন শ্রুম।

মনে মনে ভাবছিলেন, "সর্বনাশ হয়ে গেল, সমূহ সর্বনাশ! হাতিটা যা ক্ষতি করেছে তার খেসারৎ দিতেই আমার সমস্ত সম্পত্তি চলে তো যাবেই, তার ওপর হৈটি টৈটিকে গুলি করে মারবে ওরা। এ লোকসানের আর চারা নেই।"

এই সময় ট্রেতে করে একটি কাগজ নিয়ে এল একজন পরিচারক। বললে, 'টেলিগ্রাম।'

"তা ছাড়া আর কী!" ভাবলেন ম্যানেজার। "হাতিটি মারা পড়েছে তারই খবর নিশ্চয় কিন্তু এ কী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে টেলিগ্রাম? মস্কো থেকে? আশ্চর্য! কে পাঠালে?."

"ম্যানেজার শ্ত্রম, বুশ সার্কাস বার্লিন

"এই মাত্র হাতির পালিয়ে যাব খবর পড়লাম কাগজে স্টপ হাতিটাকে মারার আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের অনুরোধ করুন পুলিসকে স্টপ একটা লোক পাঠিয়ে হাতিকে এই খবর দিন কোলোন উদ্ধৃতি স্যাপিয়েন্স ভাগনার বার্লিনে আসছেন বুশ সার্কাসে ফিরে এসো স্টপ উদ্ধৃতিশেষ তারপরেও কথা না শুনলে গুলি করে মারতে পারেন স্টপ প্রফেসর ভাগনার।"

আরো একবার টেলিগ্রামটা পড়লেন শ্ত্রম।

"কিছুই মাথায় ঢুকছে না। বোঝা যাচ্ছে প্রফেসর ভাগনার হাতিটিকে জানেন — টেলিগ্রামে লিখেছেন তার পুরনো নাম স্যাপিয়েন্স। কিন্তু প্রফেসর বার্লিনে আসছেন একথা শুনে হাতিটা ফিরবে বলে কেন ভাবছেন তিনি?.. কে জানে, যাই হোক, হাতিটাকে বাঁচাবার ক্ষীণ একটা চান্স অন্তত পাওয়া যাচ্ছে।"

কাজে নামলেন ম্যানেজার। বেশ কিছুটা কষ্টের পর 'সামরিক অপারেশন বন্ধের' জন্য পুলিসকর্তার সম্মতি পাওয়া গেল। অবিলম্বে বিমান যোগে য়ুঙ্গকে পাঠানো হল হাতির কাছে।

একেবারে রীতিমতো সন্ধিদূতের মতো একটা শাদা রুমাল উড়িয়ে হাতির দিকে এগোল য়ুঙ্গ।

শুরু করলে, 'শ্রদ্ধেয় স্যাপিয়েন্স, প্রফেসর ভাগনার অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। শিগগিরই বার্লিনে পৌঁছবেন তিনি, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। সাক্ষাৎ হবে বুশ সার্কাসে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ফিরে গেলে কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।'

হাতিটা মন দিয়ে শুনে কী ভেবে শুঁড়ে করে য়ুঙ্গকে তুলে নিল তার পিঠের ওপর। তারপর উত্তরের সড়ক ধরে গজেন্দ্রগমনে চলতে লাগল বার্লিনের দিকে য়ুঙ্গের ভূমিকাটা দাঁড়াল দ্বিবিধ, একদিকে যুদ্ধ বন্দী,

অন্য দিকে রক্ষক — হাতির পিঠের ওপর মানুষ বসে থাকায় কেউ গুলি করতে সাহস করবে না।

হাতি আসছিল পায়ে হেঁটে; কিন্তু প্রফেসর ভাগনার ও তাঁর সহকারী দোনিসভ এলেন উড়ে। তাই বার্লিনে তাঁরা পৌঁছলেন হাতির আগেই। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দেখা করতে গেলেন শ্ত্রমের সঙ্গে।

সার্কাস ম্যানেজার ততক্ষণে টেলিগ্রাম পেয়েছেন যে প্রফেসর ভাগনারের নাম শুনেই হাতি বাধ্য ও বশীভূত হয়েছে, হেঁটে আসছে বার্লিনের দিকে।

ম্যানেজারকে ভাগনার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো হাতিটিকে পেলেন কী ভাবে, তার ইতিহাস জানেন কিছু?'

'আমি ওকে কিনেছি নিক্স নামে একজন লোকের কাছ থেকে, নারকেল তেল আর বাদামের কারবারী। থাকে মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোয়, মাথাদি সহরের খানিকটা দূরে। সে বলে, তার ছেলেমেয়েরা যখন বাগানে খেলা করছিল, তখন হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয় হাতিটা, নানা রকম আশ্চর্য আশ্চর্য খেলা দেখায় সে, পেছন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, নাচে, লাঠি লোফালুফি করে, একবার মাটিতে দাঁত বিঁধিয়ে সামনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় আর পেছনের পা আর লেজ নাচাতে থাকে ভারি মজার ভঙ্গিতে। নিক্সের ছেলেমেয়ে হেসে লুটোপাটি খেতে থাকে। ছেলেরাই তার নাম দেয় হৈটি টৈটি — জানেন তো, ইংরেজিতে কথাটার মানে বলা যেতে পারে "রগুড়ে", মাঝে মাঝে অব্যয় হিসেবেও ব্যবহার হয়, যেমন, "লাগ-লাগ" বা "বাহবা, বাহবা!" এ নামটা অভ্যেস হয়ে যায় হাতিটার, আমাদের মালিকানায় আসার পর ঐ নামটাই আমরা রেখে দিই। খুবই আইনসঙ্গত ভাবে কেনা হয়েছে, কেউ কোনো আপত্তি তুলতে পারে না।'

'আপত্তি তোলার কোনো ইচ্ছে আমার নেই,' বললেন ভাগনার, 'আচ্ছা হাতিটার গায়ে কোনো বিশেষ চিহ্ন আছে কি?'

'মাথায় কতকগুলো মস্ত মস্ত ক্ষত চিহ্ন আছে মিঃ নিক্সের ধারণা, হাতিটা ধরার সময় কিছু জখম হয়ে থাকবে স্থানীয় লোকেদের হাতি ধরার পদ্ধতিটা বেশ বর্বর. ক্ষত দাগগুলোর জন্যে ওকে তেমন ভালো দেখায় না, দর্শকদের অস্বস্তি হতে পারে, তাই থুপিওয়ালা একটা সিল্কের নকসা তোলা টুপি পরানো হয় মাথায়।'

'তাহলে আর সন্দেহ নেই যে এটা সেই হাতিই।'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলেন শ্ত্রম।

'ওই স্যাপিয়েন্স — আমার যে হাতিটা হারিয়ে গিয়েছিল। বেলজিয়ান কঙ্গোয় একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানে আমি ওকে ধরেছিলাম, আমিই ট্রেনিং দিই ওকে। কিন্তু একদিন সে বনে গিয়ে আর ফিরে আসে না। অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু খুঁজে আর পাওয়া যায় না।'

'তার মানে, হাতিটা আপনার সম্পত্তি বলে দাবি তুলতে চাইছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন সার্কাস ম্যানেজার।

'আমি কোনো দাবি তুলছি না, কিন্তু সম্ভবত হাতিটাই তুলবে। আসল ব্যাপার হল নতুন কতকগুলো পদ্ধতিতে আমি হাতিটাকে ট্রেনিং দিই, আর সত্যিই আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় তাতে। ওর মানসিক ক্ষমতার অসাধারণ বিকাশ তো আপনি নিজেই দেখছেন। ওটা আমারই কাজ। এও বলব যে স্যাপিয়েন্স বা আপনারা ওকে এখন যা বলে ডাকেন সেই হৈটি টৈটির বলা যেতে পারে, খুব একটা প্রবল রকমের ব্যক্তিত্ব বোধ আছে। আপনাদের সার্কাসের খেলায় হাতিটার অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা যখন আমি খবরের কাগজে পড়ি, তখন সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করি ও আমারই স্যাপিয়েন্স, — পড়া, হিসেব করা, লেখা — এ কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। কেননা এ সব বিদ্যা আমিই তাকে শেখাই। হৈটি টৈটি যতদিন শান্তিতে ছিল, বার্লিনবাসীদের আনন্দ দিচ্ছিল আর বোঝা যাচ্ছিল নিজেও সে তার ভাগ্যে অসুখী নয়, ততদিন হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন আমি দেখিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করল হাতিটা, তার মানে কিছু একটা কারণে সে বিরক্ত হয়েছে। তাই ঠিক করলাম, ওর সাহায্যে যেতে হবে। এবার নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নেবার অধিকার তাকে দিতে হবে। এ অধিকার তার আছে। মনে রাখবেন, আমি সময়মত না এলে বহু আগেই মারা পড়ত হাতিটা; আমাদের দুজনের কেউই তাকে পেত না। আমি শুধু এইটুকু আশা করি যে আপনি এবার বুঝতে পারছেন যে জোর করে আপনি হাতিটাকে নিজের কাছে ধরে রাখার চেষ্টা করলে কিছু ফল হবে না। তবে ভাববেন না যে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, আপনার কাছ থেকে হাতিটিকে নিয়ে নেওয়া। আমি শুধু তার সঙ্গে একটু কথা কইব। খুবই সম্ভব যে আপনি যদি আপনার ব্যবস্থা একটু বদলান, যার ফলে সে

অতো চটেছে সেটা দূর করেন, তাহলে হয়ত সে আপনার কাছেই থাকতে রাজি হবে।'

'হাতির সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন! এমন কথা কেউ জন্মেও শোনেনি।' হাত উল্টিয়ে বলে উঠলেন শ্ট্রেম।

'হৈটি টৈটির মতো হাতিও তো কখনো দেখা যায়নি,' জবাবে দিলেন প্রফেসর, 'ভালো কথা, বার্লিনে আসতে তার দেরি কত?'

'এই সন্ধ্যাতেই, বোঝা যায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে সে ব্যগ্র। টেলিগ্রাম পেয়েছি যে, ঘণ্টায় বিশ কিলোমিটার বেগে সে আসছে।'

সেই সন্ধ্যাতেই, সার্কাস অনুষ্ঠানের পর প্রফেসর ভাগনারের সঙ্গে দেখা হল হৈটি টৈটির। রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্ট্রেম, ভাগনার আর দেনিসভ; খেলোয়াড়দের প্রবেশ-পথ দিয়ে ঢুকল হৈটি টৈটি, তখনো পিঠে তার য়ুঙ্গ। ভাগনারকে দেখেই সে ছুটে এল তার কাছে, শুঁড় বাড়িয়ে যেন করমর্দন করল। তারপর য়ুঙ্গকে নামিয়ে ভাগনারকে তুলে নিল পিঠে। প্রফেসর হাতির মস্ত কানটা তুলে ধরে ফিসফিসিয়ে কী বললেন। হাতি মাথা নেড়ে তার শুঁড়ের ডগাটা দ্রুত নাড়িয়ে গেল প্রফেসরের মুখের কাছে। এই নড়নচড়নগুলো মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভাগনার।

গোপনীয়তাটা শ্ট্রেমের ভালো লাগল না।

অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কী ঠিক করল হাতিটা?'

'ছুটি নেবার ইচ্ছে জানাল হাতিটা, সেই অবকাশে আমার কাছে জরুরী কতকগুলো জিনিস সে আমাকে বলতে চায়। ছুটির পর সে সার্কাসে ফিরতে রাজি, কিন্তু এক সর্তে: অভদ্র আচরণের জন্য হের য়ুঙ্গকে ক্ষমা চাইতে হবে তার কাছে, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আর কখনো দৈহিক বলপ্রয়োগ তিনি করবেন না। হাতির গায়ে অবশ্য লাঠির বাড়ি লাগে না, কিন্তু নীতিগতভাবে সে কোনো রকম অপমান সহ্য করতে রাজি নয়।'

'আমি... মেরেছি হাতিটাকে?' অবাক হবার ভান করে জিজ্ঞেস করল য়ুঙ্গ।

'ঝাড়ুর হাতল দিয়ে,' বললেন ভাগনার, 'এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই, হাতি মিছে কথা বলে না। হাতির প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে আপনাকে যেন ও .'

'প্রজাতন্ত্রের সভাপতি বুঝি?'

'একজন মানুষের মতো, এবং সাধারণ মানুষ নয়, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।'

'একজন লর্ড,' ব্যঙ্গভরে বললে য়ুঙ্গ

'খুব হয়েছে, থামুন,' চেঁচিয়ে উঠলেন শ্‌ত্রম, 'আপনিই যত গণ্ডোগোলের মূল, এর জন্য শাস্তি পেতে হবে বলে রাখলাম। কখন শ্রী হৈটি টৈটি ছুটি নিতে চান, এবং কোথায় যাবেন?'

'ওর সঙ্গে আমরা একটা পদব্রজ ভ্রমণে বেরুব,' ভাগনার বললেন, 'বেশ প্রীতিকর হবে সেটা। ওর চওড়া পিঠের ওপর দেনিসভ আর আমার দুজনেরই জায়গা হবে, আমাদের ও নিয়ে যাবে দক্ষিণ দিকে। সুইজারল্যাণ্ডের মাঠে চড়ে বেড়াবার ইচ্ছে জানিয়েছে হাতি।'

সহকারী দেনিসভের বয়স মোটে তেইশ, কিন্তু এই অল্প বয়সেই কতকগুলি জীব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে সে। 'আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল,' প্রফেসর বলেছিলেন তাকে, আর নিজের গবেষণাগারে তাকে কাজে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন। অপরিসীম খুশি হয়ে উঠেছিল তরুণ বৈজ্ঞানিক। সহকারীকে পেয়ে প্রফেসরও কম খুশি হননি, যেখানে যেতেন, সর্বদাই দেনিসভকে সঙ্গে নিতেন।

প্রথম দিন একত্রে কাজের সময়েই প্রফেসর বলেছিলেন, 'দেনিসভ আকিম ইভানভিচ — উঃ কী লম্বা নাম। প্রত্যেকবার আপনাকে ডাকার সময় যদি আমায় প্রথামত আকিম ইভানভিচ বলে ডাকতে হয়, তাহলে বছরে ৪৮ মিনিট ব্যয় করতে হবে। আর এই ৪৮ মিনিটে অনেক কিছু করা সম্ভব। তাই মোটেই কোনো নাম ব্যবহার করব না আমি, ডাকতে হলে শুধু ছোট্ট করে ডাকব "দেন"। আপনিও আমায় ডাকবেন "ভাগ"।' সময় বাঁচানোর ওস্তাদ ছিলেন ভাগনার।

সকাল নাগাদ তোড়জোড় সব শেষ। ভাগনার আর দেনিসভ দুজনের জন্যেই যথেষ্ট জায়গা ছিল হাতির চওড়া পিঠে। সঙ্গে রইল কেবল অত্যাবশ্যক কিছু জিনিসপত্র।

সময়টা অতি প্রত্যূষ হলেও বিদায় জানাবার জন্যে শ্‌ত্রম হাজির ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'হাতিকে খাওয়াবেন কী?'

'গ্রামে শহরে খেলা দেখাব।' জবাব দিলেন ভাগনার, 'তার বদলে দর্শকেরা তার খাবার জোগাড় করবে। নিজেও খাবে, আমাদেরও খাওযা জুটিয়ে দেবে স্যাপিয়েন্স। চললাম।'

মন্থর গমনে হেঁটে চলল হাতি। কিন্তু শহরের শেষ বাড়িটা পিছনে ফেলে খোলা সড়ক ধরতেই নিজেই গতি বাড়িয়ে দিল। চলল ঘণ্টায় বারো কিলোমিটার বেগে।

'দেন, এবার হাতির ব্যাপারটা আপনাকেই দেখতে হবে। ওকে ভালো করে বুঝবার জন্যে ওর অসাধারণ অতীত ইতিহাসটা জানা দরকার। এই নোট বইটা নিন, আপনার জায়গায় আগে যিনি ছিলেন, সেই পেসকভের ডাইরি এটি। আমার সঙ্গে তিনি কঙ্গোয় গিয়েছিলেন। একটা ট্রাজি-কমিক ঘটনা হয়েছিল তার, সেটা পরে কোনো এক সময় বলব। আপাতত ওটা পড়ে দেখুন।'

ভাগনার হাতির মাথার দিকে আর একটু এগিয়ে ছোট্ট একটা ডেস্ক পাতলেন। তারপর ডান বাঁ দুই হাত দিয়েই দুটো নোটবুকে একই সঙ্গে লিখে চললেন তিনি। একই সঙ্গে অন্তত দুটো কাজের কম কখনো তিনি করতেন না।

'এবার বলুন,' প্রফেসর অনুরোধ করলেন, স্পষ্টতই হাতির উদ্দেশে। হাতি তার শুঁড়টা তুলে ধরল একেবারে ভাগনারের কানের কাছে, তারপর ছোটো ছোটো বিরতি সহ দ্রুত একটা ফিসফিসে আওয়াজ করে চলল:

'ফ — ফফ — ফফফ — ফ — ফফফ ...'

'ঠিক মোর্স কোডের টরে টক্কার মতো ...' মোটা চামড়া বাঁধানো একসার-সাইজ খাতাটা খুলতে খুলতে ভাবলে দেনিসভ।

হাতি যা বলছিল সেটা ভাগনার টুকে নিচ্ছিলেন তাঁর বাঁ হাত দিয়ে। ডান হাত দিয়ে লিখছিলেন একটা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। সমান তালে হাঁটছিল হাতিটা, তার মসৃণ দুলুনিতে লেখার প্রায় কোনো বাধা হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে পেসকভের ডাইরিতে মগ্ন হয়ে পড়ল দেনিসভ।

ডাইরিটা এই।

৫। 'রিঙ্ক কখনো মানুষ হয়ে উঠবে না ...'

২৭শে মার্চ। মনে হচ্ছে যেন ফাউস্টের কাজের ঘরে এসে পড়েছি। প্রফেসর ভাগনারের গবেষণাগারটি এক আশ্চর্য জায়গা। কী নেই এখানে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ইলেকট্রো-টেকনলজি, অণুজীববিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ... বোঝা যায় জ্ঞানের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যাতে

ভাগনার, বা তাঁর অভিধা অনুসারে ভাগ-এর আগ্রহ নেই। মাইক্রোসকোপ, স্পেকট্রোস্কোপ, ইলেকট্রোস্কোপ — খালি চোখে যা দেখা যায় না তা দেখার জন্যে যতরকমের 'স্কোপ'এ ভরা। শোনবার জন্যে এক রাশ যন্ত্রপাতি - কর্ণানুবীক্ষণ — এ দিয়ে হাজার রকমের নতুন নতুন শব্দ শুনতে পারেন ভাগনার, ধরতে পারেন পুর্শাকিনের ভাষায় 'সামুদ্রিক সরীসৃপের জলাভ্যন্তরের গতি, দূর তৃণের জীবন ছন্দ।' কাচ, তামা, অ্যালুমিনিয়ম, রবার, চীনেমাটি, এবনি, প্লাটিনাম, সোনা, ইস্পাত - এই নিয়ে নানা আকারের নানা ধরনের সমাহার। বকযন্ত্র, ফ্লাস্ক, কয়েল, টেস্টটিউব, বাতি, স্পুল, স্পাইরাল, ফিউজ, সুইচ, বোতাম... এ সবের মধ্যে দিয়ে ভাগনারের মানস জটিলতারই প্রতিফলন হচ্ছে না কি? পাশের ঘরে তো এক মূর্তিশালা বিশেষ। সেখানে নরদেহতনুর 'চাষ' করেন ভাগনার, দেহ বিচ্ছিন্ন একটা জ্যান্ত আঙুল, খরগোসের কান, কুকুরের হার্ট, ভেড়ার মাথা আর.. মানুষের মস্তিষ্ক বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। জ্যান্ত মস্তিষ্ক, তখনো তা ভাবছে! এর যত্ন করার ভার আমার ওপর। সে মস্তিষ্কের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রফেসর তার উপরিতলের ওপর তাঁর আঙুল রাখেন। বিশেষ এক ধরনের শারীর-দ্রবণ দিয়ে পুষ্ট রাখা হয় তাকে, আমার কাজ হল জিনিসটা তাজা রাখা। কিছুকাল আগে ভাগনার এই দ্রবণটার উপাদানে অদলবদল করে মস্তিষ্কের 'প্রখরীভূত' পুষ্টি শুরু করেন। ফল হয় আশ্চর্য। দ্রুত বাড়তে থাকে মস্তিষ্ক, শেষ পর্যন্ত একটা মস্ত তরমুজের মতো হয়ে উঠল, খুব যে সুন্দর দেখাচ্ছিল তা অবশ্যই নয়।

২৯শে মার্চ। কী নিয়ে যেন ভাগ মস্তিষ্কের সঙ্গে খুব জোর কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

৩০শে মার্চ। সন্ধ্যায় ভাগ আমায় বললেন:

'মস্তিষ্কটা একজন তরুণ জার্মান বৈজ্ঞানিক রিঙের মস্তিষ্ক। আবিসিনিয়ায় মারা পড়ে লোকটি, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন মস্তিষ্কটা এখনো বেঁচে আছে, চিন্তা করছে। কিন্তু কিছুকাল থেকে মস্তিষ্কটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের জন্যে যে চোখটা আমি করে দিয়েছিলাম সেটায় ও খুশি নয়। শুধু দেখে তৃপ্ত হচ্ছে না ওর, শুনতেও চায়, শুধু এক জায়গায় পড়ে থাকতে ভালো লাগছে না, নড়ে চড়ে বেড়াতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত এ ইচ্ছেটা সে জানাল বড়ো

দেরি করবে। কিছু আগে বললে এ ইচ্ছে পূরণ করা যেত অ্যানটমি থিয়েটারে একটা সুবিধা মতো লাস জোগাড় করে রিঙের মস্তিষ্ক তার মাথায় বসিয়ে দেওয়া যেত। লোকটা যদি মস্তিষ্কের রোগে প্রাণ হারিয়ে থাকে, তাহলে মাথায় একটা নতুন সুস্থ মস্তিষ্ক বসালেই সে প্রাণ ফিরে পেত। রিঙের মস্তিষ্ক তখন পেত একটা নতুন দেহ ও পূর্ণ জীবন। কিন্তু এই দেহতন্ত্র বিকাশের পরীক্ষাটা নিয়ে আমি ভাবি মেতে উঠেছিলাম এখন দেখতেই পাচ্ছেন রিঙের মস্তিষ্ক এত বড়ো হয়ে উঠেছে যে কোনো মানুষের মাথায় তা আঁটবে না। কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না রিঙ।'

'আপনি কি বলতে চান, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু সে হয়ে উঠতে পারবে?'

'ঠিক তাই। যেমন হাতি হতে সে পারে। অবিশ্যি হাতির মাথার মতো অত বড়ো আকারে মস্তিষ্কটা এখনো পেঁছয়নি, কিন্তু সেটা সময়ে সম্ভব। শুধু দেখতে হবে প্রয়োজনীয় আকারে মস্তিষ্কটা যাতে পেঁছয়। শিগগিরই একটা হাতির মাথার খোল নিয়ে আসব আমি। মস্তিষ্কটা তাতে বসিয়ে তার তন্ত্র বাড়িয়ে চলব, যতদিন না পুরো খোলটা ভরে যায়।'

'তার মানে রিঙকে আপনি হাতি করে তুলতে চান?'

'আপত্তি কী? রিঙকে সে কথা আগেই বলেছি দেখা, শোনা, ঘুরে বেড়ানো, নিঃশ্বাস নেওয়া, এর জন্যে রিঙ এতই উৎসুক যে সে একটা শুয়োর কুকুর হতেও রাজি। আর হাতি একটা উদার প্রাণী, সবল, দীর্ঘায়ু। ও, মানে রিঙের মস্তিষ্কটা, আরো একশ দুশ' বছর বাঁচতে পারবে। খুব খারাপ কথা কি? রিঙ তার সম্মতি দিয়েছে...'

দেনিসভ ডাইরি ছেড়ে ভাগনারকে জিজ্ঞেস করলেন:

'তার মানে, যে-হাতিটায় চেপে আমরা যাচ্ছি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মস্তিষ্কটা মানুষের,' লেখা না থামিয়েই বললেন ভাগনার, 'পড়ে যান, আমায় বাধা দেবেন না।'

দেনিসভ চুপ করল বটে কিন্তু তক্ষুণি ফের পড়তে শুরু করল না। যে হাতিটায় তারা বসে আছে তার মস্তিষ্ক মানুষের এই কথাটা কেমন বিদঘুটে ঠেকল তার কেমন একটা অপ্রাকৃত কৌতূহল, প্রায় সংস্কারাচ্ছন্ন একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল তাকে।

৩১শে মার্চ। হাতির করোটিটা আজ এল। প্রফেসর তাকে আড়াআড়ি করে করাতে কেটে ফেললেন।

বললেন, 'মস্তিষ্কটা ভেতরে বসাবার জন্যে এটা দরকার। অন্য একটা মাথার খোলে স্থানান্তরিত করার সময়েও এতে সুবিধা হবে।'

করোটির ভেতরটা দেখে অবাক লাগল; যে জায়গাটায় মস্তিষ্ক থাকার কথা, সেটা তুলনায় অনেক ছোটো অথচ বাইরে থেকে হাতিকে দেখায় যেন অনেক বেশি 'মস্তিষ্কওয়ালা'।

ভাগ বললেন, 'স্থলপ্রাণীদের মধ্যে হাতির কপালের দেয়ালই সবচেয়ে বিকশিত। দেখছেন তো? খুলির সমস্ত উপরাংশটাই ফাঁকা কক্ষ, সাধারণ লোকে ভাবে ঐইটেই বুঝি মস্তিষ্কের জায়গা। আসল মস্তিষ্ক তুলনায় অনেক ছোটো, হাতির মাথাটার অনেক পিছনে তা লুকানো, এইখানটায়, কানের কাছে। সেই জন্যেই সামনাসামনি মাথায় গুলি করলে তা প্রায়ই লক্ষ্যে পেঁছয় না। হাড়ের কতকগুলো দেয়াল ভেদ করে যায় বুলেট, কিন্তু মস্তিষ্ক অক্ষত থাকে।'

মস্তিষ্কের খোলের মধ্যে কতকগুলো ফুটো করলাম আমরা দুজনে মিলে। এই ফুটো দিয়ে টিউব চালিয়ে পুষ্টিদ্রবণ খাওয়ানো হবে মস্তিষ্ককে; তারপর সাবধানে রিঙের মস্তিষ্কটা বসানো হল আধখানা খোলে; ফাঁকটা অবশ্যই তাতে পুরো ভরল না।

'ভাবনা নেই, যেতে যেতে ওটা বেড়ে উঠবে।' বাকি আধখানা খুলি জুড়তে জুড়তে বললেন ভাগ।

সত্যি বলতে কি, ভাগনারের পরীক্ষা সফল হবে এ ভরসা আমার বিশেষ ছিল না, যদিও তাঁর অদ্ভুত সব আবিষ্কারের কথা আমি জানতাম। কিন্তু এটা একটা ভয়ানক রকমের জটিল ব্যাপার। বাধা অনেক। প্রথমত একটা জ্যান্ত হাতি চাই। আফ্রিকা বা ভারতবর্ষ থেকে একটা হাতি নিয়ে আসতে অনেক খরচ। তার ওপর, কোনো কারণে হয়ত সে হাতি তেমন যুৎসই নাও হতে পারে। তাই ভাগ ঠিক করলেন রিঙের মস্তিষ্ক নিয়ে নিজেই যাবেন আফ্রিকার কঙ্গো দেশে। সেখানে একটা হাতি ধরে অকুস্থলেই মস্তিষ্ক স্থানান্তরের অপারেশন চালাবেন। মস্তিষ্ক স্থানান্তর! বলতে তো খুবই সোজা! কিন্তু এ তো আর এক পকেট থেকে আর এক পকেটে দস্তানা চালান নয়। সমস্ত

স্নায়ুমুখ, শিরা ধমনী এক এক করে বেছে সেলাই করতে হবে। জন্তুর দেহক্রিয়া মানুষের মতো হলেও অনেক তফাৎ আছে। এই দুই পৃথক ব্যবস্থাকে মিলিয়ে ভাগনার এক করবেন কী করে? আর এই জটিল অপারেশন করতে হবে আবার একটা জ্যান্ত হাতির ওপর . .

৬। বাঁদুরে ফুটবল

২৭শে জুন। এবার গত কয়েকদিনের ঘটনা এক দফাতেই লিখতে হবে। এ যাত্রায় অভিজ্ঞতা হল প্রচুর, আর সবই যে প্রীতিকর তা নয়। জাহাজে থাকতেই, বিশেষ করে গাধাবোটটায় মশা ছেঁকে ধরেছিল। নদীটা অবশ্য হ্রদের মতো চওড়া, তার মাঝামাঝি ধরে গেলে মশা কম। কিন্তু তীরের কাছাকাছি আসা মাত্রই মশার মেঘে ছেয়ে যেত। চান করতে গেলেই কালো কালো মাছি এসে গায়ে বসত, রক্ত চুষে খেত। তীরে নেমে যখন পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম, তখন নতুন এক উপদ্রব শুরু হল: ছোটো ছোটো পিঁপড়ে আর বালুকা-পিসু। প্রতি রাতে তন্ন তন্ন করে পা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হত পিসুগুলোকে। সাপ, বিছে, মৌমাছি, বোলতা সবাই মিলে কম জ্বালাতন শুরু করেনি।

বন ভেদ করে এগোনো ভারি দুষ্কর, আবার খোলা জায়গা দিয়ে হাঁটাও কম দুরূহ নয়। ঘন ঘাস, মোটা মোটা ডাঁটা, লম্বায় চার মিটার। হাঁটিতাম যেন দুই সবুজ দেয়ালের মাঝখান দিয়ে — চারপাশের কিছুই দেখা যায় না। ভয়ই লাগে! ঘাসের ধারালো পাতে ছড়ে যায় হাত মুখ। পা ফেললে একেবারে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। বৃষ্টির সময় জল জমে থাকে পাতায় — হাঁটতে গেলে হড়হড়িয়ে পড়ে গা ভিজিয়ে দেয়। বন আর তৃণভূমির মধ্য দিয়ে এক এক জনের সংকীর্ণ লাইন করে এগুতে হচ্ছিল আমাদের। এই পায়ে-হাঁটা পথই এ সব এলাকার একমাত্র যোগাযোগ। দলে আমরা ছিলাম ২০ জন, তাদের মধ্যে আঠারো জনই হল আফ্রিকান ফান উপজাতির লোক, আমাদের মোটঘাট বইছিল, পথ দেখাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পেঁছিন গেল। তুম্বা হ্রদের তীরে ছাউনি ফেললাম আমরা। আমাদের গাইডরা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে, মাছ ধরায় তন্ময় হয়ে আছে।

এ কাজ থেকে তাদের সরিয়ে আমাদের আস্তানা গাড়ায় সাহায্য করবার জন্যে টেনে আনা খুব সহজ নয়। দুটো বড়ো বড়ো তাবু ফেলেছি আমরা। জায়গাটা ভালোই, একটা শুকনো টিলার উপর। ঘাসগুলো খুব লম্বা নয়। চারপাশের অনেকটা দূর বেশ দেখা যায়। রিঙের মস্তিষ্ক নিরাপদেই এসেছে, বেশ ভালোই বোধ করছে। শব্দ বর্ণ ঘ্রাণ ও অন্যান্য অনুভূতির রাজ্যে ফেরার জন্যে তা উদগ্রীব। ভাগ তাকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছেন যে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। কী একটা রহস্যময় জিনিস তৈরি করছেন তিনি।

২৯শে জুন। খুব হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে: আমাদের ছাউনির খুব কাছেই সিংহের টাটকা পায়ের ছাপ দেখেছে দেশীয়রা। রাইফেলের বাক্স খুলে একটি করে রাইফেল দিয়েছি ওদের, অবশ্য যারা গুলি করতে পারে বলে জানিয়েছে তাদের। খাবার পর গুলি ছোঁড়ার মহড়া হল! সে এক ভয়ানক ব্যাপার! রাইফেলের কুঁদো ওরা পেট বা হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়ে গুলি ছোড়ে, আর ধাক্কায় ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ে, লক্ষ্যের একশ আশি ডিগ্রি দূর দিয়ে ছুটে যায় বুলেট। তাহলেও আনন্দ তাদের আর ধরে না। অবিশ্বাস্য রকমের চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছে ওরা। ওদের ঐ চিৎকারেই সম্ভবত কঙ্গো অববাহিকার সমস্ত বুভুক্ষু জানোয়ার ছুটে আসবে বলে আমার ধারণা।

৩০শে জুন। কাল রাতে সিংহটা ছাউনির বেশ কাছেই এসে হাজির হয়েছিল। তার বাস্তব প্রমাণ রেখে গেছে: একটা বুনো শুয়োরকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে শেষ করেছে। শুয়োরটার মাথার খুলি বাদামের মতো ফেটে চৌচির, পাঁজরার হাড়গুলো একদম ছিবড়ে করে দিয়েছে। এমন হাড়খেগোর কবলে পড়ার কোনো বাসনাই আমার নেই!

ভয় পেয়েছে স্থানীয় লোকগুলো। রাত হতেই তারা এসে জোটে আমাদের তাঁবুর কাছে, সারা রাত ধরে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। ভয়ংকর সব জন্তু সম্পর্কে আদিম মানুষের যে ভীতি, সেটা আমি অনুভব করতে শুরু করেছি। সিংহ যখন ডাকে — ইতিমধ্যেই কয়েকবার সে ডাক শুনেছি, তখন বেশ একটা বিশ্রী ব্যাপার হয় আমার মধ্যে — রক্তের মধ্যে জেগে ওঠে আমার দূর পূর্বপুরুষদের আতঙ্ক, বুকের স্পন্দন থেমে যায়, মনে হয় কোথাও ছুটে না গিয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে বসে থাকি, পারলে ছুঁচোর মতো

লুকোই মাটির নিচে। কিন্তু সিংহের গর্জন যেন ভাগের কানেই ঢোকে না। এখনো সে তার নিজের ছাউনিতেই, কী একটা জিনিস বানাচ্ছে। আজ সকালে প্রাতরাশের পর আমার কাছে এসেছিলেন। বললেন

'কাল সকালে বনের ভেতর যাব লোকগুলো বলছে একটা পুরনো হাতি-চলা পথ আছে হ্রদ পর্যন্ত। আমাদের ছাউনি থেকে অল্প দূরে জল খেত হাতিরা। কিন্তু চারণ ভূমি প্রায়ই বদলায় হাতিরা। বনের মধ্যে তারা যে পথ করেছিল সেটা আবার বুজে যেতে শুরু করেছে। তার মানে আরো দূরে কোথাও চলে গেছে তারা। খুঁজে বার করতে হবে।'

'কিন্তু জানেন নিশ্চয় একটা সিংহ ঘোরাঘুরি করছে এখানে। রাইফেল না নিয়ে একা যাবার ঝুঁকি নেবেন না যেন,' সাবধান করে দিলাম আমি।

'জানোয়ারে আমায় ভয় নেই। ওঝার মন্ত্র জানি আমি।' হাসি লুকোবার চেষ্টায় তাঁর ঘন গোঁপ জোড়া কেঁপে উঠল

'রাইফেল না নিয়েই যাবেন?'

ভাগ কেবল মাথা নাড়লেন।

২রা জুলাই। ইতিমধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। রাত্রে ফের গর্জন শোনা গেল সিংহের। আমার এমন ভয় লেগেছিল যে নাড়ি উল্টে এসে বুক হিম হয়ে যায়। পরের দিন সকালে তাঁবুর বাইরে গা ধুচ্ছিলাম, এমন সময় অন্য তাঁবুটা থেকে বেরিয়ে এলেন ভাগ। পরনে তাঁর একটা শাদা ফ্ল্যানেল সুট, মাথায় শোলার টুপি, পায়ে মোটা সোলের বুট — অভিযানে বেরবার জন্যে তৈরি, কিন্তু কাঁধে ঝোলাও নেই, রাইফেলও নেই। সুপ্রভাত জানালাম। প্রত্যাভিনন্দনে মাথা নেড়ে তিনি এগিয়ে গেলেন; আমার মনে হল যেন তিনি পা ফেলছিলেন কেমন সাবধানে। ক্রমশ তাঁর পদক্ষেপ স্বচ্ছন্দ হয়ে এল, স্বাভাবিক দ্রুত তালে হাঁটতে লাগলেন। পাহাড় থেকে যে পথটা নেমে এসেছে সেই জায়গায় এসে পড়লেন তিনি। পথটা যখন বেশ ঢালুতে নেমেছে তখন হাত তুললেন। আর এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার তখন ঘটল যে আমি আর দেশীয় লোকেরা সবাই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম।

প্রথমটা তাঁর টানটান শরীরটা সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো শূন্যে ধীরে ধীরে ডিগবাজি খেতে শুরু করল। তারপর ক্রমশই ডিগবাজির গতি হয়ে

উঠল দ্রুত। এই দাঁড়িয়ে আছেন খাড়া হয়ে, পরমুহূর্তেই মাথা নিচে, পাদুটো শূন্যে। এই ভাবে অবিরাম পা আর মাথার স্থান বদলাবদলি করে শেষ পর্যন্ত এত জোড়ে ঘুরতে লাগলেন যে সবকিছু একটা ঝাপসা বৃত্তের মতো হয়ে উঠল আর তাঁর মূল দেহটাকে দেখাতে লাগল একটা গাঢ় কেন্দ্রের মতো। এই ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে ভাগ পাহাড়েব নিচে নেমে এলেন, তারপর সমানে মাটিতে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক চলনে এগিয়ে গেলেন বনের দিকে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না আমার, দেশীয়রা তো আরো হতভম্ব। তারা শুধু অবাক নয়, রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। যা তারা দেখল সেটা তাদের কাছে নিঃসন্দেহেই এক অপ্রাকৃত ব্যাপার। আর আমার কাছে, ভাগ আমায় প্রায়ই যে সব হেঁয়ালির মধ্যে ফেলেন, এই ডিগবাজি খাওয়াটাও তারই একটা বলে মনে হল।

কিন্তু হেঁয়ালি হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়, আর সিংহ যে সিংহই। নিজের ওপর একটু বেশি রকম ভরসাই কি ভাগ করছেন না? আমি জানতাম, অপ্রাকৃত জিনিসে কুকুর ভয় পেয়ে যায় -- একটা সুতোয় বা ঘোড়ার লোমে বেঁধে এক টুকরো হাড় ছুড়ে দিয়ে তা দেখা যায়। কুকুর যেই খেতে যাবে অমনি একটু টানতে হবে হাড়টাকে। হাড় যখন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকবে যেন কুকুরের গ্রাস থেকে পালাতে চাইছে, তখন এই 'জ্যান্ত' হাড়ের কাছ থেকে লেজ গুটিয়ে চম্পট দেবে কুকুর। কিন্তু শূন্যে ভাগকে ডিগবাজি খেতে দেখলে সিংহও কি তাই করবে? এই হল প্রশ্ন মনে হল অরক্ষিত অবস্থায় ভাগকে ছেড়ে দেওয়া চলে না।

রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভাগের পেছু পেছু, সঙ্গে রইল দেশীয়দের মধ্যেকার সাহসী ও বুদ্ধিমান চারজন লোক। আমরাও আসছি এটা তাঁর জানা ছিল না, বনের মধ্যে হাতিরা যে একটা চওড়ামতো পথ করে নিয়েছিল তাই দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভাগ হাজার হাজার জন্তু গিয়ে এ পথ সমান করে দিয়েছে। কেবল একটি কি দুটি জায়গায় ছোটো ছোটো উল্টে পড়া গাছের গুঁড়ি বা শুকনো ডাল চোখে পড়ল আমাদের। ভাগ যখন এগুলোর কাছে আসছিলেন তখন তিনি থেমে গিয়ে একটু অদ্ভুতভাবেই যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক উঁচুতে পা তুলছিলেন তারপর লম্বা পায়ে

ডিঙিয়ে যাচ্ছিলেন সেগুলো। কখনো কখনো তাঁর গোটা দেহটা একটুও না বেঁকে সামনের দিকে একেবারে সোজা নুয়ে যাচ্ছিল, আবার পরমুহূর্তেই আগের মতোই সিধে হয়ে হাঁটছিলেন। আমরা ওঁকে অনুসরণ করছিলাম একটু দূরে থেকে। শেষ পর্যন্ত সামনে দেখা গেল একটা উজ্জ্বল আলো, পথটা চওড়া হয়ে এসে মিশেছে একটা ফাঁকা জায়গায়।

বনের ছায়া ছেড়ে রোদভরা ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছিলেন ভাগ, এমন সময় একটা অদ্ভুত চাপা গর্জনের মতো শোনা গেল; নিশ্চয় ক্ষেপে ওঠা অথবা ভয় পাওয়া কোনো বড়ো জন্তুর ডাক। কিন্তু সিংহের ডাকের মতো নয়। জন্তুর নামটা দেশীয়রা কানাকানি করে বলছিল, কিন্তু স্থানীয় ভাষার নামগুলো আমার জানা ছিল না। আমার সঙ্গীদের আচরণ ও মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, সিংহকে তারা যেমন ভয় পেত, এ জন্তুর গর্জনেও তাদের তেমনি আতঙ্ক। তাহলেও আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইল তারা; বিপদ দেখে গতি আমি বাড়িয়েছিলাম। ফাঁকা জায়গাটায় আসতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

বন থেকে মিটার দশেক দূরে আমার ডান দিকে বসে আছে একটি শিশু গরিলা, দেখতে বছর দশ বয়সের একটা ছেলের মতো। তার একটু দূরেই ধূসর বাদামী একটি মাদী গরিলা, আর অতিকায় একটা মর্দা। ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বেশ জোরেই হেঁটে যাচ্ছিলেন ভাগ, শিশু গরিলা আর তার বাপমায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত পোঁছবার পরেই সে দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় বলে মনে হয়। মর্দাটা মানুষ দেখেই সেই ভাঙা ভাঙা গর্জন ছাড়লে, বনের মধ্যে যেটা আমি শুনেছিলাম। ততক্ষণে জানোয়ারগুলো চোখে পড়েছে ভাগের; সোজাসুজি মর্দা গরিলাটার চোখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক পায়ে এগুতে লাগলেন তিনি। বাচ্চা গরিলাটা মানুষ দেখে কিচমিচ হাউ মাউ করে দ্রুত উঠে পড়ল কাছের একটা ছোটো গাছের ওপর।

মর্দাটা ফের একটা হুঁশিয়ারি গর্জন ছাড়ল। সাধারণত গরিলারা মানুষকে এড়িয়ে যায়, কিন্তু লড়তে বাধ্য হলে অতি বেপরোয়া ও অসাধারণ হিংস্র হয়ে ওঠে। মর্দাটা দেখল, মানুষটা হটে যাচ্ছে না, নিজের বাচ্চাটার জন্যে ভয় পেয়ে সে হঠাৎ খাড়া হয়ে লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষল। মানুষের এক বিকট প্রতিরূপের মতো এই যে জন্তু, এর চেয়ে ভয়াবহ জীব আর আছে কিনা সন্দেহ। বানর জাতীয় প্রাণী হিসাবে মর্দাটার দেহ প্রকাণ্ড — লম্বায়

মাঝারি গোছের একটা মানুষের সমান, কিন্তু বুকের ছাতি মানুষের দ্বিগুণ মনে হল। মূল দেহকান্ডটা অস্বাভাবিক বড়ো, লম্বা লম্বা বাহু এক একটা শালগাছের মতো। হাত আর পায়ের চেটো অসম্ভব লম্বা। ভুরুর জায়গাটা খাড়া হয়ে বেরিয়ে এসেছে, হিংস্র চোখ, খিঁচনো মুখভরে অবারিত হয়ে উঠেছে বড়ো বড়ো ঝকঝকে দাঁত।

রোমশ মুঠো পাকিয়ে বুকের ওপর এমন জোরে বাড়ি মারতে শুরু করল জন্তুটা যে একটা ফাঁকা পিপের মতো ঢপ ঢপ শব্দ বেরুতে লাগল। তারপর ডাক ছেড়ে গর্জন করে ডান হাতে মাটির ওপর ভর দিয়ে ছুটে গেল ভাগের দিকে।

সত্যি বলতে কি, এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে কাঁধ থেকে রাইফেল নামানোর অবকাশ পাইনি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গরিলাটা গিয়ে পেঁছিল একেবারে ভাগের কাছে আর... ফের একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল!

কোনো একটা অদৃশ্য বাধায় ধাক্কা খেয়ে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল গরিলাটা। অন্যদিকে ভাগ কিন্তু মাটিতে উল্টে না পড়ে বাতাসে ডিগবাজি খেতে লাগলেন সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো, দুই হাত তাঁর উপরে তোলা, শরীরটা সিধে। ব্যর্থতায় আরো ক্ষেপে উঠল জানোয়ারটা। ফের উঠে দাঁড়িয়ে ও আর একবার ভাগের ওপর লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এবার তাঁকে ডিঙিয়ে সে পড়ল মাটিতে। একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল মর্দাটা। গর্জন করে, গড়িয়ে উঠে, মুখে ফেনা তুলে গরিলাটা তার বিটকেলে লম্বা লম্বা হাতে এবার ভাগকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু অদৃশ্য আর অটুট কিছু একটা বাধা যেন আড়াল করে রাখল ভাগকে। গরিলার হাতের ভঙ্গি দেখে অনুমান করলাম, জিনিসটা গোলাকার। অদৃশ্য, কাচের মতো স্বচ্ছ, কোনো রকম আলো ঠিকরে পড়ছে না, অথচ ইস্পাতের মতো মজবুত। এইটাই তাহলে ভাগের সাম্প্রতিক আবিষ্কার!

ভাগ যে একান্তই নিরাপদ তাতে আমার আর সন্দেহ রইল না। তাই অসীম কৌতূহলে এই অসাধারণ খেলাটা দেখতে লাগলাম। এ খেলা যত উদ্দাম হয়ে উঠল, দেশীয়রাও ততই আহ্লাদে নাচতে শুরু করে দিলে, রাইফেল পর্যন্ত ফেলে দিলে মাটিতে।

মাদী গরিলাটাও তার ক্ষিপ্ত মর্দাটার দিকে কম কৌতূহলে লক্ষ্য করছিল

না কিন্তু তারপর সে একটা যুদ্ধংদেহি গর্জন করে ছুটে গেল তার সাহায্যে। খেলাটাও তখন থেকে একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় অদৃশ্য গোলকটার ওপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল গরিলা দুটো, আর গোলকটা ঠিক একটা ফুটবলের মতো এখানে ওখানে ড্রপ খেতে লাগল. গরিলারা যেখানে ক্ষিপ্রের মতো ফুটবল খেলছে, সেখানে সেই ফুটবলের মধ্যে বসে থাকা তামাসার ব্যাপার নয়। চরকি পাক ঘুরতে লাগলেন ভাগ, শরীরটা তাঁর তারের মতো একেবারে সিধে। এতক্ষণে বোঝা গেল, দু হাত উপরে তুলে শরীরটা তিনি অমন সিধে করে রাখছেন কেন। গোলকটার গায়ে হাত পা দিয়ে চাপ দিয়ে আছেন তিনি, যাতে নিজের কোনো ক্ষতি না হয়। অসম্ভব শক্ত পাত দিয়ে গোলকটা গড়া নিশ্চয়, কারণ দু দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ করে গরিলা দুটো যখন গোলকটাকে শূন্যে পাঠাচ্ছিল, তখন মাটি থেকে মিটার তিনেক পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছিল গোলকটা, কিন্তু ভাঙল না। তবে ভাগ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন বোঝা গেল। পেশীগুলোকে অমন টান টান করে রাখা বেশিক্ষণ চলে না। হঠাৎ দেখলাম, ভাগ হাত পা ছেড়ে গোলকটার নিচে গিয়ে পড়েছেন।

অবস্থা গুরুতর। আর দর্শক হয়ে থাকা চলে না। লোকগুলোকে হাঁক দিয়ে বললাম রাইফেল তুলে ধরতে, একসঙ্গে এগুলাম গোলকটার দিকে। ভয় ছিল গুলি করতে গিয়ে তারা হয়ত ভাগের গায়েই গুলি করে বসবে, তাই হুঁশিয়ার করে দিলাম, আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। কে জানে অদৃশ্য গোলকটা বুলেটপ্রুফ কিনা। তা ছাড়া, গোলকটার কোথাও একটা ফাঁক অবশ্যই আছে, নইলে নিঃশ্বাস নিতে পারতেন না ভাগ। দৈবাৎ সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে যেতে পারে।

ভয়ানক হৈচৈ চেঁচামেচি করে গরিলাদের দৃষ্টি ফেরানো গেল আমাদের দিকে। আমাদের দিকে প্রথম মুখ ফেরালো মর্দা গরিলাটা, ভয়ংকর গর্জন করে উঠল সেটা। তাতে আমাদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া হল না দেখে এগুতে লাগল আমাদের দিকে। যেই সে গোলকটা থেকে বেশ খানিকটা তফাৎ হয়েছে অমনি গুলি ছুড়লাম আমি। বুলেট গিয়ে বিঁধল তার বুকে, তার ধূসর বাদামী লোম বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসতে দেখলাম। ডাক ছেড়ে হাত দিয়ে ক্ষতমুখটা চেপে ধরল গরিলাটা, কিন্তু পড়ে গেল না। পরক্ষণেই আরো বেগে ছুটে

আসতে লাগল আমার দিকে। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল তার কাঁধে, কিন্তু ততক্ষণে ও একেবারে আমার কাছে এসে আঁকড়ে ধরল রাইফেলের নলটা। এক ঝটকায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে অসম্ভব শক্তিতে মুচড়ে আমার চোখের সামনেই ভেঙে ফেললে নলটা। তাতেও তুষ্ট না হয়ে কামড়ে হাড় চিবানোর মতো করে চিবাতে শুরু করে দিলে। তারপর হঠাৎ টলে পড়ে গেল মাটিতে, খিঁচুনি খেতে লাগল সারা দেহ, ভাঙা রাইফেলটা কিন্তু তখনো ছাড়েনি। মাদী গরিলাটা ইতিমধ্যে পালাল।

'খুব লেগেছে কি?' ভাগ জিজ্ঞেস করলেন, মনে হল তাঁর স্বর যেন আসছে অনেক দূর থেকে। একটা গরিলা আমার পাশে ধাক্কা দিয়ে গেছে বলেই কি আমার শ্রুতি শক্তিও ঘা খেয়েছে?

তাকিয়ে দেখলাম, ভাগ আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অত কাছে বলেই চোখে পড়ল তাঁর দেহ ঘিরে একটা মেঘলা মতো আবরণ। ভালো করে দেখে বোঝা গেল, আসল আবরণ ওটা নয়, সেটা একেবারেই স্বচ্ছ, সেই স্বচ্ছ গোলকটার ওপর গরিলার হাতের ছাপ আর ধুলোবালির যে দাগ লেগে আছে সেইটেই চোখে পড়ছে কেবল।

অদৃশ্য গোলকটার ওই দাগদাগালির দিকে যে চেয়ে আছি, সেটা নিশ্চয় ভাগের চোখে পড়েছিল।

একটু হেসে তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'মাটি যদি কাদাটে বা ভেজা থাকে, তাহলে ওপরে দাগ পড়ে যায়, গোলকটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু ধুলো বালি কি শুকনো পাতায় কিছু হয় না। খুব দুর্বল বোধ না করলে উঠে দাঁড়ান, যাওয়া যাক। যেতে যেতে আমার আবিষ্কারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলব।'

খাড়া হয়ে ভাগের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁকেও কিছুটা ধকল সইতে হয়েছে; মুখের এখানে ওখানে কালশিটে।

বললেন, 'ও কিছু নয়, সেরে যাবে। আমারও খানিক শিক্ষা হল। বোঝা যাচ্ছে এ রকম একটা দুর্ভেদ্য গোলকের মধ্যেও আফ্রিকান জঙ্গলের গভীরে ঢোকা চলে না, সঙ্গে বন্দুকও রাখা চাই। ফুটবলের ভেতরে গিয়ে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল।'

'ফুটবলের তুলনাটা আপনারও মনে হয়েছে তাহলে?'

'অগত্যা এখন শুনুন। কাচের মতো স্বচ্ছ একটা ধাতু আমেরিকানরা আবিষ্কার করেছে, এ খবর শুনেছেন তো? মানে এমন কাচ, যা ধাতুর মতো শক্ত? শুনেছি, সামরিক বিমান গড়েছে তা দিয়ে। খুবই সুবিধা তাতে। শত্রুর কাছে তা প্রায় অদৃশ্য। প্রায় বলছি, কারণ পাইলটকে তা সত্ত্বেও দেখা যাবে, যেমন গোলকের মধ্যে থাকলেও আমায় দেখা যাচ্ছে। তা, অনেক দিন ধরে আমিও ভেবেছি, এমন একটা দুর্গ বানানো যায় কিনা, যার ভেতর থেকে আমি সব দেখতে পাব। প্রাণী জীবন আমি সবই পর্যবেক্ষণ করতে পারব, কিন্তু কোনো হিংস্র পশু আমায় দেখে আক্রমণ করলে সে দুর্গ আমায় বাঁচাবে। কয়েকটা পরীক্ষার পর কৃতকার্য হয়েছি। এই গোলকটা তৈরি হয়েছে রবার থেকে। এই অতি কার্যকরী বস্তুটির যা সব সম্ভাবনা — তার কিছুই এখনো নিঃশেষ হয়নি হে! রবারকে কাচের মতো স্বচ্ছ আর লোহার মতো শক্ত করে তুলতে পেরেছি আমি। আমার অ্যাডভেঞ্চারটা আজ অবশ্য খুব প্রীতিকর হয়নি, ঠিক সময়ে আপনারা আমার সাহায্যে না এলে পরিণাম আরো অপ্রীতিকরই হত, তাহলেও আমার আবিষ্কারটা সফল ও উপযোগী বলে আমার ধারণা। আর গরিলা? কে ভেবেছিল যে এখানে গরিলা থাকবে। এ জায়গাটা বুনো বটে, কিন্তু গরিলারা সাধারণত থাকে একেবারে দুর্ভেদ্য, আরো বুনো জঙ্গলের ভেতর।'

'কিন্তু এ গোলকের মধ্যে আপনি হাঁটেন কেমন করে?'

'নিতান্ত সোজা, দেখছেন না? গোলকের দেয়ালে একটা পায়ে চাপ দিই। ফলে গোলকটা সামনে গড়িয়ে যায়। নিঃশ্বাস নেবার ফুটো আছে দেয়ালের গায়ে; গোলকটা তৈরি দুটো আধাগোলক দিয়ে। ভেতরে ঢুকে স্বচ্ছ রবারের বিশেষ স্ট্র্যাপ দিয়ে মুখ এ'টে দিয়েছি তবে অসুবিধা হল এই যে ঢালু জমিতে গোলকটাকে আটকে রাখা দায়। এমন জোরে গড়াতে থাকে যে ব্যায়ামের কসরত করতে হয় আমাকে কিন্তু ব্যায়াম একটু করবই বা না কেন?'

৭। অদৃশ্য ফাঁস

২০শে জুলাই। ডাইয়েরির সূত্র আবার ছিন্ন।

বোঝা গেল অনেক দূরে চলে গেছে হাতির দল। ছাউনি ফেলে হাতির পথ ধরে বেশ কয়েকদিন ধরে এগিয়ে যাবার পর কিছু তাজা চিহ্ন চোখে

পড়ল। তার দুদিন পরে হাতির জলখাবার জায়গাটা আবিষ্কার করলে দেশীয়রা। হাতি শিকারে ফানেরা ওস্তাদ হাতি ধরার নানা পদ্ধতি আছে তাদের কিন্তু নিজের মৌলিক পদ্ধতিই ভাগের পছন্দ। সঙ্গে তিনি একটা বাক্স আনার হুকুম দিয়েছিলেন, সেই বাক্স থেকে এবার তিনি অদৃশ্য কী সব জিনিস বার করলেন। হাওয়ার মতো অদৃশ্য এই সব জিনিস তুলে তুলে সাজিয়ে রাখার সময় ভাগের হাত যেভাবে নাড়াচাড়া করছিল তার দিকে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্কে চেয়ে চেয়ে দেখল ফানেরা। বোধ হয় ভাবছিল, ভাগ সম্ভবত খুব উঁচু দরের একজন ওঝা।

ভাগ আমায় কিছু বলেননি, কিন্তু আন্দাজ করলাম, হাতি ধরার কোনো ফাঁদ বার করে রাখছেন ভাগ, এবং গোলকটির মতো এগুলিও সেই একই অদৃশ্য বস্তু দিয়ে তৈরি।

কৌতূহলে মরছি দেখে ভাগ বললেন, 'এসে পরখ করে দেখুন।'

শূন্যে হাতড়ে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত এক সেন্টিমিটার পুরু একটা দড়ি হাতে ঠেকল।

'এটা কি রবার?'

'হ্যাঁ, রবারের নানা রকমফেরের একটা। এই বিশেষ কাজের জন্যে এটাকে আমি দড়ির মতো নমনীয় করেছি, কিন্তু ওই গোলকটার মতোই স্বচ্ছ আর তেমনি ইস্পাতের মতো শক্ত। এই অদৃশ্য দড়ির ফাঁস করে হাতির পথে পেতে রাখব। এই ফাঁসে জড়িয়ে গিয়ে হাতি আমাদের হাতে পড়বে।'

মাটির ওপর এই অদৃশ্য দড়ি বিছিয়ে ফাঁদ পাতাটা বিশেষ সহজ কাজ ছিল না বারে বারেই নিজেরাই পা বেধে উল্টে পড়ছিলাম। যাই হোক, সন্ধ্যা নাগাদ কাজটা শেষ হল; এবার হাতির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

চমৎকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাত। জঙ্গল ভরে কেবল মৃদু শন শন, হাঁস ফাঁস শব্দ। একবার একটা কান্নার মতো শোনা গেল, কোনো একটা ছোটো জানোয়ার হয়ত শেষ বিদায় নিল জীবনের কাছে। মাঝে মাঝে যেন শোনা গেল কেমন উদ্দাম হাসির আওয়াজ, তা শুনে আবো জড়োসড়ো হয়ে বসল দেশীয়রা, ঠাণ্ডা বাতাসে লোকে যেমন ঘন হয়ে বসে।

হাতিরা এল অলক্ষ্যে। দল ছাড়িয়ে একটু আগে আগে চলেছে সদ ‹ হাতিটা, প্রকাণ্ড তার শরীর, শুঁড়টা বাড়িয়ে ক্রমাগত দোলাচ্ছে। রাতের হাজার রকমের গন্ধ শুঁকছে সে শুঁড়ে, বাছাই করছে, মনে মনে হিসেব করছে কোন গন্ধটা বিপদসূচক। ঠিক আমাদের অদৃশ্য ফাঁসগুলোর সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল হাতিটা, শুঁড়টা এমন সোজাসুজি বাড়িয়ে দিল, যা আমি আগে কখনো দেখিনি। কোনো একটা গন্ধ ঠাহর করার চেষ্টা করছিল সে। হয়ত আমাদের শরীরেরই গন্ধ, যদিও দেশীয়দের পরামর্শ মতো আমরা সবাই সূর্য ডোবার আগে জলায় স্নান সেরে জামাকাপড় পরিষ্কার করে কেচে নিয়েছিলাম। বিষুবমণ্ডলে সারা দিন ধরে লোকে ঘামে কিনা।

'ব্যাপার খারাপ,' ফিসফিসিয়ে বললেন ভাগ, 'হাতিটা আমাদের গন্ধ পেয়েছে। আমার ধারণা, গন্ধটা রবারের, আমাদের গায়ের গন্ধ নয়। ও কথাটা আমার খেয়াল হয়নি .'

স্পষ্টই ইতস্তত করছিল হাতিটা বোঝা যায় অপরিচিত একটা গন্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছে সে। কী ধরনের বিপদ জড়িয়ে আছে এ অজানা গন্ধের সঙ্গে ‹ দ্বিধাগ্রস্তভাবে একটু এগলো হাতিটা, ঐ অদ্ভুত গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সম্ভবত তা দেখার জন্যে। এগলো কয়েক পা, তারপরেই আটকে গেল প্রথম ফাঁসটায়। সামনের পা দিয়ে টান মারল সে, কিন্তু অদৃশ্য বাঁধন খসল না। আরো জোরে টান মারল হাতিটা। পায়ের ঠিক ওপরে চামড়ার ওপর যে কিছু একটা কষে বসছে তা বেশ দেখলাম আমরা এর পর সমস্ত দেহের ভর দিয়ে প্রকাণ্ড জন্তুটা এমন ভাবে পিছু টান মারল যে তার পেছনটা প্রায় এসে ঠেকল মাটির সঙ্গে। দড়ির বাঁধন হাতির মোটা চামড়া ভেদ করে কেটে বসল, থকথকে ঘন রক্ত পড়তে লাগল পা বেয়ে।

বোঝাই যায় অসম্ভব টান সইতে পারে ভাগের এই দড়ি।

বিজয় উৎসব শুরু করতে যাব এমন সময় অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটল। যে মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়িটা বাঁধা ছিল সেটা কুড়ুলে-কাটার মতো করে ভেঙে পড়ল। আচমকা পড়ে গেল হাতিটা, তারপর হুড়মুড়িয়ে খাড়া হয়ে পিছন ফিরে বিপদের ডাক ছেড়ে পালাল।

ভাগনার বললেন সব মাটি হল যেখানে ঐ অদৃশ্য ফাঁদগুলো পেতেছিলাম তার ধারে কাছেও আর হাতিরা আসবে না গন্ধ শুঁকেই ওরা

টের পেয়ে যাবে গন্ধ নাশক কোনো একটা রাসায়নিক ব্যবহার করতে হচ্ছে.. হুঁ গন্ধ মানে।' কী একটা চিন্তায় ডুবে গেলেন ভাগনার, তারপর বললেন। 'কেন, চলবে না? আমি কী ভাবছি শুনুন, হাতি ধরার রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করব আমরা, যেমন ধরুন গ্যাস আক্রমণ। হাতিটাকে মেরে ফেলার দরকার নেই, সেটা খুব সোজা। তাকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে। গ্যাস মুখোস পরে এক ড্রাম গ্যাস নিয়ে এই বনের পথটায় ছাড়ব। চারদিকের গাছপালা খুব ঘন, প্রায় গাছের একটা টানেল বললেই হয়। এর ভেতরে গ্যাস বেশ টিকে থাকবে .. কিন্তু আরো সহজ একটা পথই তো রয়েছে।'

হঠাৎ হাসতে শুরু করলেন ভাগনার। কী একটা কথা ভেবে যেন ভারি মজা লেগেছে তাঁর।

'আমাদের এখন শুধু বার করতে হবে কোথায় জল খেতে যায় হাতিগুলো। এ জায়গায় তারা আর আসবে না বলেই মনে হয়।'

৮। 'হস্তি-সুরা'

২১শে জুলাই। আর একটা জল খাবার জায়গা পেয়েছে দেশীয়রা, ছোট্ট একটা বুনো হ্রদের মতো। জল খেয়ে হাতিরা যখন চলে গেল তখন লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম আমরা। জামাকাপড় খুলে জলে নামা গেল, তারপর গায়ে গায়ে এক সারি খুঁটি পুঁতে হ্রদের একটা জায়গা বেষ্টন করে ফেলা হল। এরপরে জলতলের এই দেয়ালের গায়ে মাটি লেপা হল পুরু করে। ফলে দাঁড়াল একটা আলাদা চৌবাচ্চার মতো। এটা ঠিক সেই জায়গা যেখানে হাতিদের জল খেতে দেখা গেছে।

'চমৎকার হয়েছে,' বললেন ভাগ, 'এবার এই জলটাকে একটু "বিষাক্ত" করতে হবে। তার একটা চমৎকার, একেবারেই অক্ষতিকর পদ্ধতি আমার আছে। তার ক্রিয়াটা অ্যালকোহলের চেয়েও কড়া।'

কয়েক ঘণ্টা তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাটালেন ভাগ; শেষ পর্যন্ত বালতি ভরা যে জিনিসটা নিয়ে তিনি বেরুলেন, সেটার নাম তাঁর মতে 'হস্তি সুরা'। পুকুরে ঢালা হল জিনিসটা। আর আমরা সবাই গিয়ে গাছে উঠে বসলাম পর্যবেক্ষণের জন্যে।

'কিন্তু হাতি কি আপনার ওই সুরা খাবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আশা আছে, খেতে হাতির ভালোই লাগবে। ভালুক অন্তত ভদকা বেশ পছন্দ করে। রীতিমতো মদ্যপ হতে দেখা গেছে তাদের। শ্‌শ কেউ একটা আসছে ...'

আমাদের মল্লভূমির চারিদিকে চেয়ে দেখলাম আমি — মস্ত বড় মল্লভূমি।

এই প্রসঙ্গে একটু অন্য কথা সেরে নিই। সত্যি বলতে কি, বিষুবমণ্ডলীর অরণ্যের চিত্রার্পিত রূপ ও 'স্থাপত্য'-বৈচিত্র্যে কেবলি অবাক লেগেছে আমার। বনের এক একটা জায়গা ঠিক তিন তলা সৌধের মতো: ঝোপঝাড়ের ছোটো একটু জায়গা — গাছগুলো মানুষের মাথার চেয়ে বেশি উঁচু নয়; তার ওপরে দ্বিতীয় একটা বন — গাছগুলো আমাদের উত্তরী বনের মতো লম্বা; শেষ পর্যন্ত আরো উঁচুতে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের এক বিশাল অরণ্য। প্রথম সারির গাছের মাথা থেকে দ্বিতীয় সারির গাছের মাথা পর্যন্ত নানান ধরনের লতাপাতার একটা দড়া, দড়ি, কেবল-এর এলাকা। এই ধরনের তিন তলা অরণ্যের দৃশ্য সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। মাথার ওপরে সবুজ গুহা, ধাপে ধাপে উপচে পড়া সবুজ প্রপাত, শ্যামনীল পাহাড় উঠে গেছে আকাশে, আর সবখানি চিত্রিত হয়ে উঠেছে পাখি পাখালির রঙীন পালকে, আর বুনো ফুলের বর্ণসুষমায়।

তারপর হঠাৎ যেন গিয়ে পড়বে এক বিশাল গথিক মন্দিরে, শ্যাওলা ঢাকা মাটি থেকে বড়ো বড়ো স্তম্ভ উঠে গেছে প্রায় অদৃশ্যগোচর এক সবুজ গম্বুজে। তারপর আরো কয়েক পা এগুতেই আবার বদলে যাবে সবকিছু। গিয়ে পড়বে দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে। এপাশে পাতা, ওপাশে পাতা, সামনে পেছনে মাথার ওপরে সর্বত্র কেবল পাতা। নিচে শ্যাওলা, ঘাস, ফুলপাতা — উঠে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। এ যেন এক সবুজ ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাওয়া, উচ্ছল উদ্ভিদে জড়িয়ে যাবে, আচমকা পা বেধে যাবে পতিত গাছে। তারপর এই ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে হয়রান হয়ে বিভ্রান্ত হবার পর হঠাৎ দেখা যাবে সরে গেছে ঝোপ, আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে তখন: সবুজ একটা খিলান, গোল একটা গম্বুজ, দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য মোটা এক 'স্তম্ভের' ওপর। একটি ঘাসও নেই মাটিতে যেন বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার জন্য তৈরি। নিচেকার ঘাস, ঝোপঝাড় সব মারা পড়েছে এক বিশালকায় গাছের

ছায়ায় এতটুকু রোদ গলে ঢুকতে দেয় না তা গাছের ডালগুলো ঝুরি নামিয়ে শিকড় গজিয়েছে সেখানে। ঝাপসা অন্ধকার এখানে, বাতাস ঠাণ্ডা। এই সব অতিকায় গাছের তলে — বট, রবার গাছ আর ভারতীয় ডুমুর গাছের তলে প্রায়ই বিশ্রাম নিয়েছি আমরা।

এমনি একটা বিরাট গাছের ডালেই এখন আশ্রয় নিয়েছি, গাছটা হ্রদের খুব কাছেই এবং হাতির পথ ধরে তীর পর্যন্ত যেতে হলে প্রতিটি জন্তুকেই আমাদের এই 'মল্লভূমির' মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এ ভূমিতে বহু আরণ্য নাটকের অভিনয় যে হয়ে গেছে তা বোঝা যায়। এখানে ওখানে হরিণ, মহিষ আর বুনো শুয়োরের হাড় পড়ে আছে। তৃণভূমি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাই প্রায়ই তৃণভূমির জীবজন্তুরা জল খেতে আসে এখানে।

মল্লভূমি পেরিয়ে গেল একটা বনশুয়োর, তার পেছনে মাদীটা, আর আটটি কাচ্চাবাচ্চা। গোটা পরিবার এগুল জলের দিকে। এক মুহূর্ত পরেই আরো পাঁচটা মাদীকে দেখা গেল, বোঝা যায় একই পরিবারভুক্ত। শুয়োরটা জলের কাছে এসে খেতে শুরু করল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নাক তুলে বিরক্তিভরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল। তারপর সরে গেল আর একটা জায়গায়। সেখানকার জলটা পরখ করলে ভালো লাগল না। মাথা ঝাঁকাল।

'খাবে না,' ভাগকে বললাম ফিসফিস করে।

'স্বাদ নিতে দিন একটু।' তেমনি আস্তে করেই বললেন ভাগ।

দেখা গেল ভাগের কথাই সত্যি। অচিরেই মাথা ঝাঁকানো বন্ধ করে এক নাগাড়ে জল খেতে শুরু করলে শুয়োরটা। মাদিটা কিন্তু বিব্রত বোধ করছিল, মনে হল যেন চেঁচিয়ে বাচ্চাদের জল খেতে নিষেধ করছে। কিন্তু শিগগিরই স্বাদ পেয়ে গেল সেও। অনেকক্ষণ ধরে, সাধারণত যা স্বাভাবিক তার চেয়েও বেশিক্ষণ ধরে জল খেতে লাগল শুয়োরগুলো। প্রতিক্রিয়াটা প্রথমে ঘটল বাচ্চাগুলোর ওপর চেঁচামেচি করে তারা এর ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটতে লাগল মল্লভূমিটায়। তারপর ছটা মাদী সবকটিই মাতাল হয়ে উঠল: ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে লাগল তারা — লাফালাফি করল, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে লাগল, গড়াগড়ি দিল মাটিতে এমন কি মাটিতে মাথা দিয়ে ডিগবাজিও খেতে লাগল। তারপর টলে পড়ে কাচ্চাবাচ্চা সমেত ঘুমতে শুরু করে দিলে সবাই। মর্দাটা কিন্তু ক্ষেপে উঠল নেশায়।

ভয়ানক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে মল্লভূমির মাঝখানকার একটা গাছের গুঁড়ির দিকে ধেয়ে গেল বেগে, এমন জোরে দাঁত বসিয়ে দিলে যে পরে তা ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল তাকে।

মাতাল শুয়োরের কাণ্ডে আমরা এমন নিমগ্ন হয়ে ছিলাম যে হাতিদের আসা খেয়াল করিনি। সবুজ পথটা থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তারা, মাপা পা ফেলে ফেলে। আসছিল একের পর এক সারি বেঁধে। গাছের গুঁড়িটার চারপাশের এলাকাটা তখন ঠিক এক সার্কাসের রঙ্গভূমির মতো। এত বেশি সংখ্যায় চতুষ্পদ খেলোয়াড় সার্কাস কখনো দেখিনি। স্বীকার করব যে অতগুলি হাতি দেখে সত্যিই ভয় লেগেছিল। দেখাচ্ছিল যেন অতিকায় সব ইঁদুরের মতো — সংখ্যায় গোটা কুড়িরও বেশি।

কিন্তু কী যে ভীমরতি ধরল মাতাল শুয়োরটার! ভালোয় ভালোয় পালিয়ে বাঁচার বদলে সে সরোষে গর্জন করে তীরের মতো ছুটে গেল হাতির দঙ্গলটার দিকে। সর্দার হাতিটা স্পষ্টই থতমত খেয়ে গেছল, কেননা কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে দেখছিল ধেয়ে আসা জন্তুটার দিকে। শুয়োর এসে দাঁত বসাল তার পায়ে। হাতিটা তার শুঁড় গুটিয়ে মাথা নামিয়ে দাঁত দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে শুয়োরটাকে যে সেটা একেবারে উড়ে গিয়ে পড়ল ঠিক জলার জলে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুয়োরটা হুড়মুড়িয়ে ফের উঠল তীরে, সেই সঙ্গে যেন একটু সাহস সঞ্চয়ের জন্য দু এক ঢোঁক জলও খেয়ে নিলে, তারপর ফের ছুটে এল হাতিটার দিকে। কিন্তু এবার সতর্ক ছিল হাতিটা। শুয়োর ছুটে আসতেই একেবারে বিঁধে গেল হাতির দাঁতে। মুমূর্ষু জন্তুটাকে দাঁত থেকে ঝেড়ে ফেলে তার ওপর একটি পা চাপিয়ে দিলে হাতিটা। দেহ বলতে অবশিষ্ট রইল শুধু শুয়োরের মাথা আর লেজটুকু। পায়ের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল মূল দেহটা।

ধীর নিয়মিত পদক্ষেপে সর্দার হাতিটা 'মল্লভূমির' মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল এমন ভাবে যেন কিছুই ঘটেনি। মাদীগুলো আর বাচ্চারা মাটির ওপর বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল সাবধানে তাদের পাশ কেটে হ্রদের কাছে গিয়ে হাতিটা শুঁড় নামাল জলে। অসীম কৌতূহলে চেয়ে রইলাম আমরা, কী হয় এবার।

জল খেতে শুরু করল হাতিটা, তারপর শুঁড় উঠিয়ে এখানে ওখানে

জল শুঁকতে লাগল, বোঝা গেল বিভিন্ন জায়গায় জল পরখ করে দেখছে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে যেখানে মুখ নামাল সেটা আমাদের বেড় দেওয়া জায়গাটা পেরিয়ে। সেখানে মাদক দিয়ে জল বিষাক্ত করা হয়নি।

ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমাদের খেল খতম।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম আর কি। হাতিটা তার প্রথম জায়গায় এসে হস্তি-সুরা খেতে শুরু করেছে। বোঝা গেল পানীয়টা তার ভালোই লাগছে। পালের গোদার পেছু পেছু গোটা পাল এসে জুটল। আমাদের ঘেরা জায়গাটা কিন্তু খুব বেশি বড়ো ছিল না, তাই দলের বেশ কিছু হাতিকে বিশুদ্ধ তাজা জলই খেতে হল।

মনে হচ্ছিল যেন জল খাওয়া ওদের শেষ হবে না। দেখছিলাম পালের গোদাটার পেট ঢিপ হয়ে ফুলে উঠছে জল খেয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পুকুরের জল নেমে গেল অর্ধেকে। এক ঘণ্টার মধ্যে পালের গোদা ও তার সহচররা মিলে তলানিটুকুও শেষ করতে লাগল। কিন্তু শেষ করতে না করতেই টলতে শুরু করে দিলে তারা। একটা হাতি তো ভয়ানক সোরগোল তুলে জলের মধ্যেই টলে পড়ল। ডাক ছেড়ে ফের উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নেতিয়ে পড়ল। তীরে শুঁড় রেখে এমন জোরে সে নাক ডাকাতে লাগল যে ভয় পেয়ে পাখিরা সব উড়ে গেল একেবারে গাছের ডগায়।

সজোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গোদা হাতিটা হ্রদ থেকে উঠে এল, শুঁড় তার একেবারে ন্যাতার মতো ঝুলছে। একবার কান খাড়া করল, তার পরই নিস্তেজের মতো ফের ঝুলে গেল কান। ধীরে ধীরে, তালে তালে আগেপিছে দুলতে লাগল হাতিটা, তার চারপাশে বুলেটে ধরাশায়ীর মতো পড়ে যাচ্ছিল তার সঙ্গীরা। যেসব হাতির হস্তি-সুরা জোটেনি, তারা দলের এই 'মড়ক' দেখতে লাগল অবাক হয়ে। হুঁশিয়ারি ডাক ছাড়লে তারা, মাতালদের চারপাশে পাক খেতে লাগল, এমন কি ঠেলে তোলারও চেষ্টা করলে। একটা মস্ত মাদী হাতি গোদার কাছে গিয়ে তার মাথায় শুঁড় বুলিয়ে উদ্বেগ জানাল। এই দরদের জবাবে গোদাটা তার লেজটা নাড়ালে দুর্বল ভাবে, কিন্তু নিয়মিত দুলুনিটা বন্ধ হল না। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকিয়ে ধড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। সুস্থ হাতিগুলো বিব্রতের মতো ফিরে দাঁড়াল তার চারপাশে। গোদাকে ফেলে যেতে সাহস হচ্ছিল না তাদের।

'ওগুলো যদি থেকেই যায়, তাহলে তো ভারি মুশকিলে ফেলবে,' বেশ জোরে জোরেই বললেন ভাগ, 'মেরে ফেলতে হবে তাহলে, কী বলেন? দেখা যাক, কী হয়।'

সুস্থ হাতিগুলো যেন একটা বৈঠকের মতো করল, অদ্ভুত শব্দ করলে, ক্রমাগত শুঁড় নাড়ালে। বেশ কিছুক্ষণ চলল তা। তারপর নতুন একটা গোদা নির্বাচন করে তারা যখন সঙ্গীদের 'শবাকীর্ণ মল্লভূমি' ছেড়ে এক এক করে সার বেঁধে চলে গেল তখন অস্ত সূর্যের আভায় লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা।

৯। রিঙের হস্তিদেহ লাভ

এবার গাছ থেকে নেমে আসার পালা। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম মল্লভূমির দিকে, চেহারাটা তার যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। কাত হয়ে পড়ে আছে বিশালকায় হাতিরা, মাঝে মাঝে বনশুয়োরগুলো। এই নেশার ঘোর থাকবে কতক্ষণ? মস্তিষ্ক স্থানান্তরণ অপারেশন শেষ হবার আগেই যদি হাতিদের নেশা কেটে যায়? আমার শঙ্কা বাড়িয়ে তোলার জন্যেই যেন হাতিগুলো ঘুমের মধ্যেই থেকে থেকে শুঁড় নড়াচ্ছিল আর কোঁ কোঁ করছিল।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না ভাগ। দ্রুত গাছ থেকে নেমে কাজে লেগে গেলেন। দেশীয়রা ওদিকে ঘুমন্ত শুয়োরগুলোকে জবাই করতে শুরু করল। ভাগ আর আমি অপারেশন চালালাম। আগে থেকেই সব তৈরি ছিল। বিশেষ এক ধরনের ডাক্তারি অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন ভাগ, শক্ত আইভরির ওপরেও যাতে কাজ চলবে। হাতির কাছে গিয়ে তিনি একটা বাক্স থেকে স্টেরিলাইজড ছুরি বের করে চালিয়ে দিলেন হাতির মাথায়. তারপর চামড়া তুলে ধরে ভেতরের খুলিতে করাত চালাতে লাগলেন। হাতির শুঁড়টা কেঁপে কেঁপে উঠল দু একবার। আমি ভারি নার্ভাস বোধ করছিলাম, কিন্তু ভাগ আশ্বস্ত করে বললেন:

'ভয়ের কারণ নেই। আমার মাদকটার গুণ সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিতে পারি। তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে হাতিটা, তার ভেতরেই মস্তিষ্কটা বার করে আনতে পারব। তখন আর কোন ভয় থাকবে না।'

খুলির ভেতর দিয়ে সমান তালে করাত চালাতে লাগলেন ভাগ। যন্ত্রপাতিগুলো সত্যিই চমৎকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই করোটির একটা অংশ তিনি উঠিয়ে ফেললেন। বললেন:

'কখনো যদি হাতি শিকারে যান তাহলে এইটে মনে রাখবেন· এই ছোট্ট জায়গাটায় আঘাত করতে পারলেই তবে হাতি মারা সম্ভব।' যে জায়গাটা ভাগ দেখালেন সেটা চোখ আর কানের মাঝখানে বিঘৎ খানেক জায়গা। 'রিঙের মস্তিষ্ককে আগেই বলে রেখেছি, এই জায়গাটা যেন সে বাঁচায়।'

হাতির মাথা থেকে মস্তিষ্কটা ভাগ শিগগিরই বার করে নিলেন। তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। মস্তিষ্কহীন হাতিটা একটু সরে গিয়ে তার প্রকাণ্ড দেহটা দিয়ে গা ঝাড়া দিল, তারপর আমাদের সবাইকে ভয়ানক চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হে'টে গেল কয়েক পা। চোখ খোলা থাকলেও স্পষ্টতই কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না হাতিটা, পথে তার যে সঙ্গীটি পড়েছিল তাকে এড়িয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই সে করলে না, ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ল মাটিতে। শুঁড় আর পায়ে কেমন খি'চুনি হতে লাগল। ভাবলাম, 'মরছে নাকি?' আফশোস হচ্ছিল, সব মেহনত বৃথা গেল।

ভাগ চুপ করে অপেক্ষা করলেন শুধু, তারপর হাতির নড়ন-চড়ন থেমে গেলে ফের অপারেশন শুরু করলেন।

বললেন, 'হাতিটা এখন মরা, মস্তিষ্কহীন যে কোনো প্রাণীর মতোই। কিন্তু বাঁচিয়ে তুলব ওকে। সেটা কঠিন নয়। চট করে রিঙের মস্তিষ্কটা এবার দিন... কোনো রকম সংক্রমণ ঘটেনি আশা করি!..'

সাবধানে হাত ধুয়ে হাতির মাথার যে খোলটা আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা থেকে রিঙের মস্তিষ্ক বার করে এগিয়ে দিলাম ভাগের দিকে।

'এ্যা-এ্যাই ...' খুলির মধ্যে মস্তিষ্কটা বসালেন তিনি।

'মাপ সই হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অল্প একটু ছোটো, কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। মস্তিষ্ক কক্ষের চেয়ে বেশি বড়ো হলেই বরং মুশকিল হত। এই বার সবচেয়ে কঠিন কাজ, নার্ভের ডগাগুলো সেলাই করা। এক একটা নার্ভ জুড়ব আর রিঙের মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতির দেহের যোগাযোগ ঘটতে থাকবে। আপনি এখন একটু জিরিয়ে নিতে পারেন। বসে বসে দেখুন, কিন্তু আমার কাজে ব্যাঘাত করবেন না।'

অতি সাবধানে ও দ্রুত গতিতে কাজ করে চললেন ভাগ। বলতে কি, তাঁকে মনে হচ্ছিল এক শিল্পী, আঙুলগুলো তাঁর পিয়ানোর জটিল একটা গৎ তোলার মতো করে দ্রুত নড়ে যাচ্ছিল। মুখের ভাব নিমগ্ন, দুই চোখের দৃষ্টিই একই লক্ষ্যে নিবদ্ধ, এটা তাঁর হয় যখন একান্ত মনোযোগ দেন কোনো কাজে। স্পষ্টতই, তার মস্তিষ্কের দুই অংশ দিয়েই একই কাজ করে যাচ্ছিলেন, দুই অংশই যেন পরস্পরের ওপর চোখ রেখে চলেছে। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের ওপর খুলি চাপানো হল, ধাতুর ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলেন সে খুলি, ফের যথাস্থানে চামড়া বসিয়ে সেলাই করে দিলেন।

'চমৎকার! এবার ঠিক ঠিক সেরে উঠলে চামড়ার ওপর এই দাগগুলো ছাড়া কিছুই থাকবে না। আশা করি, রিঙ সেটা আমায় মাপ করে দেবে।'

রিঙ মাপ করে দেবে! তা বটে, এখন তো আর এটা হাতি নয়, রিঙ, অথবা রিঙ হয়ে উঠেছে হাতি। মাথায় মানুষের মস্তিষ্কওয়ালা হাতিটার কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। কৌতূহলে তাকিয়ে দেখলাম তার খোলা চোখের দিকে। সে চোখ ঠিক আগের মতোই সমান নিষ্প্রাণ।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এর কারণ কী? রিঙের মস্তিষ্ক নিশ্চয় পুরোপুরি সচেতন অথচ চোখ তো... তার (হাতির না রিঙের, কি বলব বুঝে পেলাম না) দেখছি কেমন কাচের মতো।'

'খুবই সোজা,' ভাগ বললেন, 'মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো সেলাই করা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো এক হয়ে জুড়ে যায়নি। রিঙকে আমি সাবধান করে দিয়েছি, স্নায়ু তন্তুগুলো জুড়ে না যাওয়া পর্যন্ত যেন সে কোনো নড়াচড়া না করে। জুড়ে যেতে যাতে দেরি না হয়, তার জন্যে যা করবার সব আমি করেছি।'

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। হ্রদের তীরে বসে দেশীয়রা আগুন জেবলে বুনো শুয়রের মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছিল পরিতৃপ্তির সঙ্গে। কারো কারো কাঁচা খেতেই বেশি ভালো লাগছে। হঠাৎ মাতাল হাতির একটা ডাকতে শুরু করে দিলে। তার ডাকে অন্যেরাও জেগে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। ভাগ আর আমি ছুটে গিয়ে লুকোলাম ঝোপের আড়ালে, দেশীয়রাও এল আমাদের পেছু পেছু। হাতিগুলো তখনো টলছিল। তারা গিয়ে দাঁড়াল গোদা হাতিটার কাছে। সে হাতি অপারেশনের পর তখনো ঘুমিয়ে। শুঁড় দিয়ে তারা পরখ করে দেখল তাদের ভূতপূর্ব সর্দারকে, শুঁকল, নিজেদের জান্তব ভাষায় কী

সব আলাপ করলে। চোখে দেখতে এবং কানে শুনতে পেলে রিঙের তখন যে কী অবস্থা দাঁড়াত বেশ কল্পনা করা যায়। শেষ পর্যন্ত চলে গেল হাতিরা, আমরাও ফিরে এলাম রোগীর কাছে।

'চুপ করে থাকবেন, কোন জবাব দেবেন না,' হাতির উদ্দেশে ভাগ এমন ভাবে বললেন যেন হাতিও কথা কইতে পারে, 'যদি সক্ষম বোধ করেন, তাহলে কেবল চোখ মিটমিট করা চলতে পারে। এবার, আমার কথা যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে দুবার চোখ মিটমিট করুন।'

চোখ মিটমিট করল হাতিটা।

'খাসা!' ভাগ বললেন, 'আজ আপনাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে, তবে কাল হয়ত উঠবার অনুমতি দিতে পারব। আমরা হাতির চলা এই পথটা বেড় দিয়ে দেব, রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখব, ফলে কোনো হাতি বা বুনো জানোয়ার আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

২৪শে জুলাই। আজ প্রথম উঠে দাঁড়াল হাতিটা।

'অভিনন্দন!' সম্বর্ধনা জানালেন ভাগ, 'এবার আপনাকে কী বলে ডাকব? আপনার গুপ্তরহস্য এখনই প্রচার করা চলবে না। বরং আপনাকে স্যাপিয়েন্স বলে ডাকা যাবে, রাজী?'

মাথা নাড়ল হাতি।

'আমরা ইশারায় কথা কইব, মানে মোর্স কোডে।' বলে চললেন ভাগ, 'আপনি শুঁড় নাড়িয়ে বলবেন: ওপরে শুঁড় উঠলে টরে, পাশে নড়লে টক্কা। কিংবা এতে অসুবিধা হলে শব্দের সংকেত করতে পারেন। এবার আপনার শুঁড় নাড়ুন।'

শুঁড় নাড়ার চেষ্টা করলে হাতি কিন্তু খুবই আনাড়ীর মতো। একটা ভাঙা অঙ্গের মতো এদিক ওদিক দুলতে লাগল শুঁড়টা।

'এখনো আপনার অভ্যেস হয়নি। মানে, আপনার তো আগে কখনো শুঁড় ছিল না। আচ্ছা এবার দেখা যাক হাঁটতে পারেন কী রকম।'

হাঁটতে শুরু করল হাতি। সামনের পায়ের চেয়ে পেছনের পা দুটো যেন বেশি সচল বলে মনে হল।

'দেখছি, আপনার হাতি হওয়া অভ্যেস করে নিতে হবে,' মন্তব্য করলেন ভাগ, 'হাতির মস্তিষ্কে যা থাকে, আপনার মস্তিষ্কে সে জিনিস বেশি নেই।

কিন্তু শিগগিরই পা, শুঁড়, কান নাড়াতে শিখে যাবেন। অবিশ্যি হাতির সহজ প্রবৃত্তি হল সহজাত। লক্ষ লক্ষ পুরুষ হাতির অভিজ্ঞতার সার সেটা। আসল হাতি জানে কোনটা ভয়ের, বিভিন্ন ধরনের শত্রুর হাত থেকে কী করে আত্মরক্ষা করতে হয়, কোথায় মিলবে খাদ্য আর জল। এ সবের কোনো জ্ঞান আপনার নেই। এ আপনাকে শিখতে হবে অভিজ্ঞতা দিয়ে, বহু হাতি যে অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়েছে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু বিব্রত হবেন না, ভয় পাবেন না স্যাপিয়েন্স। আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। আপনি বেশ ভালো হয়ে উঠলেই আমরা সবাই রওনা দেব ইউরোপের উদ্দেশে। ইচ্ছে করলে আপনি আপনার স্বদেশ জার্মানিতে ফিরতে পারেন, নয়ত আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে আমাদের চিড়িয়াখানায় থাকবেন। কিন্তু এবার বলুন, কী রকম বোধ করছেন?'

দেখা গেল, শুঁড় নড়াচড়ার চেয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে সংকেত করা স্যাপিয়েন্স-রিঙের কাছে বেশি সহজ বোধ হচ্ছে। শুঁড় দিয়ে দীর্ঘ হ্রস্ব শব্দ করতে লাগল হাতি। ভাগ শুনে আমায় অনুবাদ করে দিলেন (সে সময় মোর্স কোড আমি জানতাম না):

'আমার দৃষ্টিশক্তি আগে যেমন ছিল তেমন বোধ হচ্ছে না। অবিশ্যি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, কেননা মাথায় আমি লম্বা, কিন্তু দৃষ্টির পরিধি যেন সংকীর্ণ। শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তি কিন্তু আশ্চর্য রকমের সূক্ষ্ম ও প্রখর। জগতে অত হাজার হাজার অদ্ভুত নতুন সব গন্ধ আছে আগে কল্পনাও করতে পারিনি। অসংখ্য এমন সব শব্দ শুনতে পাচ্ছি যার জন্যে মানুষের ভাষায় সম্ভবত কোনো উপযুক্ত শব্দ নেই। শন শন, ক্যাঁচক্যাঁচ, কিচিরমিচির, চিঁ'চিঁ', গোঁগোঁ, ঘেউ ঘেউ, হাঁক ডাক, গর গর, খচমচ, ঝনঝন, খসমস, চটাং চটাং, ফট ফট বা এই ধরনের আরো দু এক গণ্ডা শব্দতেই ধ্বনি প্রকাশের ভাষা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু যেমন ধরুন ওই যে পোকাটা গাছের ছাল কাটছে। আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, সেটা বোঝাব কী ভাষা দিয়ে? আর ঐ যে নানা ধরনের গোলমাল!'

'আপনার উন্নতি হচ্ছে স্যাপিয়েন্স!' বললেন ভাগ।

'তাছাড়া ঐ সব গন্ধ!' নিজের নতুন অনুভূতির কথা বলে চলল রিঙ, 'এখানে আমি একেবারে বেসামাল, কী যে অনুভব করছি তার একটা

কাছাকাছি ধারণা দিতেও আমি অক্ষম শুধু এইটুকু আপনারা বুঝতে পারবেন, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব এক একটা গন্ধ আছে।' হাতি তার শুঁড় নামিয়ে মাটির গন্ধ নিল, বলল, 'এই দেখুন, মাটিরও গন্ধ আছে, আর ঘাসের গন্ধ, সম্ভবত কোনো তৃণভোজী জীব জল খেতে যাবার সময় সে ঘাস ফেলে গেছে। বুনো শুয়োর, মহিষ, তামার গন্ধ তামার এ গন্ধটা আসছে কোথা থেকে কে জানে। ওহো, এই তো এক খণ্ড তামার তার, সম্ভবত আপনার হাত থেকেই পড়ে গিয়ে থাকবে ভাগনার।'

'সে কী করে হয়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'বোধশক্তির এই সূক্ষ্মতা, সে তো শুধু ইন্দ্রিয় প্রান্তের গ্রহণ যন্ত্রের সূক্ষ্মতার ওপর নির্ভর করে না, তদনুযায়ী মস্তিষ্ক গঠনও থাকা চাই।'

'তা ঠিক,' বললেন ভাগ, 'রিঙের মস্তিষ্ক যখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ঠিক হাতির মতোই সূক্ষ্ম বোধশক্তি হবে তার। এখন ওর বোধশক্তি সম্ভবত খাঁটি হাতির চেয়ে বহু গুণ কম তীক্ষ্ম। তবে তার সূক্ষ্ম শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ফলে আমাদের চেয়ে তার এখন অনেক সুবিধা।' তারপর হাতির উদ্দেশে বললেন, 'আমরা যদি আপনার পিঠে চেপে আমাদের পাহাড়ের ছাউনিতে যাই, তাহলে আশা করি খুব ভার বোধ করবেন না স্যাপিয়েন্স?'

স্যাপিয়েন্স প্রস্তাবে রাজী হয়ে অমায়িকভাবে মাথা নাড়ল। আমাদের মোটঘাটের একাংশ আমরা চাপালাম তার পিঠে, শুঁড় দিয়ে সে আমাকে আর ভাগনারকে তুলে নিলে। রওনা দিলাম আমরা, দেশীয়রা পায়ে হেঁটে চলল আমাদের পেছু পেছু।

'আমার ধারণা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই স্যাপিয়েন্স পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তার পিঠে চেপে আমরা যাব বম্-এ; সেখান থেকে জাহাজ ধরে বাড়ি।'

পাহাড়ের ওপর ছাউনি ফেলা হল

'এখানে আপনার খাদ্য অঢেল,' ভাগ বললেন স্যাপিয়েন্সকে, 'কিন্তু ছাউনি ছেড়ে খুব বেশি দূরে যাবেন না যেন, বিশেষ করে রাত্রে। কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে আপনার, খাঁটি হাতি হলে অবিশ্যি কোনো ভাবনা ছিল না।'

মাথা নেড়ে হাতি তার শুঁড় দিয়ে আশেপাশের গাছপালার ডাল ভাঙতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে শুঁড় গুটিয়ে সে ছুটে এল ভাগের কাছে।

'কী হয়েছে ?' ভাগ জিজ্ঞেস করলেন। হাতিটা তার শুঁড়টা এগিয়ে দিল একেবারে ভাগের মুখের কাছে।

'ঈস্, দেখ দেখি!' ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলেন ভাগ, তারপর আমাকে ডেকে শুঁড়ের ডগাটা দেখালেন ঠিক একটা আঙুলের মতো ডগাটা। 'অন্ধ লোকের আঙুলের চেয়েও এর এ আঙুলটায় বেশি বোধ। হাতির সবচেয়ে নরম জায়গা এটি। দেখুন, স্যাপিয়েন্স তার এ আঙুলে কাঁটা ফুটিয়ে বসেছে।'

সন্তর্পণে কাঁটাটি তুলে ভাগ সাবধান করে দিলেন:

'সাবধানে চলবেন কিন্তু। যে হাতির শুঁড় জখম, সে পঙ্গু। জল পর্যন্ত খেতে পারবেন না। হাতিরা শুঁড় দিয়ে জল টেনে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। কিন্তু তেষ্টা পেলে আপনাকে তখন জলের মধ্যে নেমে মুখ ডুবিয়ে জল খেতে হবে। এখানে কাঁটা গাছ আছে অনেক রকম। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করে দেখুন, বিভিন্ন জাত চিনে ফেলাটা শিখে নিন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুঁড় দুলিয়ে হাতি চলে গেল বনের দিকে।

২৭শে জুলাই। সবকিছুই বেশ চলছে। হাতিটা খায় কত। প্রথম প্রথম খুব বাছবিচার ছিল খাওয়া সম্পর্কে, মুখে তুলত কেবল ঘাস, পাতা, আর নরম কচি ডাল। কিন্তু ক্ষিদে যেন ওর কিছুতেই মেটে না, তাই শিগগিরই খাঁটি হাতির মতো মোটা মোটা, প্রায় হাতের মতো চওড়া ডাল পালা ভেঙে মুখে পুরতে লাগল।

ছাউনির চারপাশের গাছগুলোর চেহারা হয়েছে শোচনীয়! মনে হবে বুঝি উল্কাপাত হয়েছে, নয়ত বা এক সর্বভুক পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে গেছে সেখান দিয়ে। ঝোপঝাড়গুলোর একটি পাতাও নেই, উঁচু উঁচু গাছগুলোর তলেকার শাখাগুলোও তথৈবচ। ডগাগুলো ভাঙা ছেঁড়া, ছাল উঠে গেছে, মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে বিষ্ঠা, দু একটা ডাল, ছোটো ছোটো গাছের কান্ড। এই সব ধ্বংস কান্ডের জন্যে স্যাপিয়েন্স ক্রমাগত মাপ চাইছে, কিন্তু 'অবস্থা চক্রে বাধ্য হচ্ছি' — শব্দ সংকেতে এই কথা সে জানিয়েছে ভাগকে

১লা আগস্ট। আজ সকালে স্যাপিয়েন্সকে দেখা গেল না। ভাগনার প্রথমটা বিচলিত হননি। বললেন:

'ও তো আর হারিয়ে যাবার মতো একটা সূচ নয়। পাওয়া যাবে ঠিকই। কী আর হবে ওর? ওকে আক্রমণ করার সাহস কোনো জানোয়ারের হবে না। সম্ভবত রাত্রে কিছুটা দূরে চলে গিয়ে থাকবে।'

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, স্যাপিয়েন্সের কোনো পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত ওর খোঁজে যাব ঠিক হল। পায়ের চিহ্ন খুঁজে বার করতে দেশীয়রা ওস্তাদ, অচিরেই হাতির পথ আবিষ্কার করলে ওরা। আমরা তাদের পেছু নিলাম। একজন বুড়ো দেশীয় হাতির পথ দেখেই বলে যেতে লাগল কী হয়েছিল:

'এখানে হাতিটা কিছু ঘাস খেয়েছিল, ওইখানে কাঁচা ঝোপটা খেতে শুরু করে। তারপর এগিয়ে গিয়েছিল। এখানে বোধহয় লাফ দেয়, কিছুতে ভয় পেয়েছিল নিশ্চয় — একটা চিতাবাঘের দাগ। আবার লাফায়, এইখান থেকে হাতিটা দৌড়তে শুরু করে, পথের সবকিছু দলে পিষে যায়। আর চিতাটা? সেটাও পালায় হাতির কাছ থেকে, ঠিক উল্টো দিকে।'

হাতির পথ ধরে এগুতে গিয়ে ছাউনি ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়লাম। একটা জলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেছে সে। পায়ের ছাপগুলোতে জল জমেছে। কাদার মধ্যে পা ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু বহু কষ্টে পা টেনে টেনে তুলে ছুটে গেছে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম কঙ্গো নদীতে। হাতিটা জলে নেমেছিল, অপর তীরে ওঠার জন্যে।

একটা দেশী গাঁয়ের খোঁজে গেল আমাদের লোকেরা। সেখান থেকে একটা নৌকা জোগাড় করে আমরা নদী পেরলাম, কিন্তু ওপারে হাতির পায়ের কোনো ছাপ দেখা গেল না। ডুবে গেল নাকি? হাতিরা সাঁতরাতে পারে, কিন্তু রিগু পেরেছিল কি? হাতির মতো করে সাঁতার দেবার নৈপুণ্য অর্জন করতে পেরেছে কি? সঙ্গের লোকেরা বললে, হাতি নিশ্চয় স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে থাকবে। কয়েক মাইল আমরা ভাটিতে নৌকা চালিয়ে দেখলাম। কিন্তু হাতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ভাগ বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। আমাদের সমস্ত মেহনত বৃথা গেল। কী হল হাতিটার? বেঁচে থাকলেও বনের জন্তু জানোয়ারের মাঝে দিন কাটাবে কী করে?..

৮ই আগস্ট। হাতির সন্ধানে এক সপ্তাহ কাটালাম, সবই ব্যর্থ হল। কোনো চিহ্ন না রেখে উধাও হয়ে গেছে সে। লোকগুলোকে টাকা মিটিয়ে দিয়ে দেশে ফেরা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

১০। দুষমন — চারপেয়ে আর দুপেয়ে

দেনিসভ বললে, 'পড়া হয়ে গেল।'

'তাহলে এই নিন তার পরেরটুকু,' হাতির ঘাড়ে চাপড় মেরে বললেন ভাগ, 'আপনি যখন পড়ছিলেন, তখন স্যাপিয়েন্স ওরফে হৈটি টৈটি ওরফে রিং তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। ওকে জীবন্ত দেখতে পাব এ আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিজের চেষ্টাতেই ইউরোপে ফেরার ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছে সে। এই শর্ট হ্যান্ড নোটগুলোর মর্মোদ্ধার করে আমার জন্যে টাইপ করে দেবেন।'

ভাগনারের কাছ থেকে নোটবইটা নিল দেনিসভ, ড্যাশ আর কমায় সব ভর্তি। প্রথমে পড়ল তারপর লিখে ফেলল হাতির নিজের বলা কাহিনীটা। ভাগনারকে স্যাপিয়েন্স যা বলেছিল সেটা এই:

হাতি হওয়ার পর থেকে যত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা সব আপনাকে বলে উঠতে পারা সহজ নয়। সবচেয়ে উদ্দাম স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি যে আমি প্রফেসর টার্নারের সহকারী হঠাৎ রূপান্তরিত হব হাতিতে, জীবনের একাংশ কাটাব আফ্রিকান অরণ্যের গভীরে। যাই হোক পর পর ঘটনাগুলোর রূপরেখা আপনাকে জানাবার চেষ্টা করা যাক।

ছাউনি থেকে বেশ দূরেই চলে গিয়েছিলাম, একটা মাঠের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছিলাম। তুলছিলাম একেবারে গোছা ধরে, শেকড় বাকড়ের মাটিগুলো ঝেড়ে ফেলে রসালো ঘাস চিবুচ্ছিলাম। ওখানকার ঘাস শেষ হয়ে গেলে বনের মধ্যে ঢুকি আরো চারণভূমির সন্ধানে। রাতটা বেশ স্বচ্ছ, জ্যোৎস্নাভরা। জোনাকি, বাদুড়, এবং প্যাঁচার মতো আরো কিছু অজানা নৈশ পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল চারিদিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে অসুবিধা হচ্ছিল না, নিজের দেহের প্রকাণ্ড ভারটা টেরই পাচ্ছিলাম না। চেষ্টা করছিলাম যাতে শব্দ হয় যথা সম্ভব কম। শুঁড় দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে নানা ধরনের বুনো

জন্তুর গন্ধ পাচ্ছিলাম কিন্তু জানতাম না কোন ধরনের জন্তু। মনে হয় যেন আমার ভয় পাবার কিছু নেই। সমস্ত জানোয়ারের চেয়ে আমার শক্তি বেশি। সিংহ পর্যন্ত আমায় সম্মান করে পথ ছেড়ে দেবে। অথচ এতটুকু খসখস, পলায়মান ইঁদুর কি শেয়ালের মতো এতটুকু একটা জন্তুর একটুকু শব্দেই কেমন যেন চমকে উঠছিলাম। একটা ছোটো বনশুয়োর দেখে আমিই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। সম্ভবত আমার পুরো শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না আমি একটা জিনিসে আশ্বস্ত বোধ করছিলাম: জানতাম লোকজন অদূরেই আছে, আমার সাহায্যে ছুটে আসবার জন্যে তারা সদাই প্রস্তুত।

তাই আস্তে আস্তে পা ফেলে এলাম একটা ছোট ফাঁকা মতো জায়গায়। এক দলা ঘাস ছেঁড়ার জন্যে শুঁড় নামাতে যাব, এমন সময় একটা বুনো জন্তুর গন্ধ নাকে এল, নলখাগড়ার মধ্যে খসখস শব্দও শুনতে পেলাম। শুঁড় তুলে বেশ গুটিয়ে রাখলাম নিরাপত্তার জন্যে, তারপর আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা স্রোতের ধারে নলখাগড়ার মধ্যে একটা চিতাবাঘ, লুব্ধ হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সমস্ত শরীরটা তার টানটান, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ মুহূর্ত দেরি হলেই সে যেন লাফিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে। কী যে আমার হল বলা কঠিন, সম্ভবত হাতি হওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, অনুভূতি ও যুক্তি তখনো নিতান্তই মানুষের মতো। কেমন একটা উন্মাদ আতঙ্ক আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না, ভয়ানক কেঁপে উঠে ছুটতে শুরু করে দিলাম।

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেঙে পড়তে লাগল। আমার উদ্দাম ছুট দেখে ভয় পেয়ে গেল বহু জানোয়ার; ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে তারা দিগ্বিদিকে পালাতে লাগল আর তাতে করে আরো বেড়ে উঠল আমার ভয়। মনে হল যেন কঙ্গো অববাহিকার সবকিছু বুনো জন্তু আমায় তাড়া করছে। কতক্ষণ ধরে যে ছুটেছিলাম, বা কোন দিকে যাচ্ছিলাম, খেয়াল ছিল না। শেষ পর্যন্ত থমকে দাঁড়াতে হল এক প্রতিবন্ধকের সামনে — নদী। আমি সাঁতার কাটতে পারি না, মানে যখন মানুষ ছিলাম তখন সাঁতার জানতাম না। অথচ মনে হল চিতাবাঘটা আমার পেছনে, তাই নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম, পা নাড়াতে লাগলাম এমন ভাবে যেন তখনো দৌড়ে চলেছি। দেখা গেল সত্যিই সাঁতরাতে শুরু করেছি। জলে মস্তিষ্ক কিছুটা ঠাণ্ডা হল, খানিকটা সুস্থির বোধ

করলাম। তবুও এ অনুভূতিটা কাটেনি, যেন গোটা বন ভরে আছে যত ক্ষুধিত জানোয়ারে, তীরে ওঠা মাত্র আমার ওপর যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা ব্যগ্র। তাই সাঁতরেই চললাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সূর্য উঠছে, অথচ আমি সাঁতরেই চলেছি। নদীতে নৌকা দেখা গেল, তাতে লোকজন। কিন্তু মানুষকে আমার ভয় ছিল না, অন্তত নৌকা থেকে একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত প্রথমটা ভাবতেই পারিনি যে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছে। তাই সাঁতরেই যাচ্ছিলাম এবার ফের বন্দুকের আওয়াজ হল, মনে হল যেন আমার ঘাড়ের ওপরে একটা বোলতা কামড়াল। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, একজন শাদা চামড়ার লোক, ইংরেজদের মতো পোষাক, নৌকায় বসে আছে আর দাঁড় টানছে দেশীয়রা। সেই গুলি করছিল আমার দিকে। হায়রে কপাল! মানুষও দেখছি বুনো জানোয়ারের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়!

কী করি তাহলে? ইচ্ছে হল ইংরেজটাকে চেঁচিয়ে বলি গুলি করা বন্ধ করতে। কিন্তু মুখ দিয়ে কেবল একটা ক্যাঁককেঁকে শব্দ বেরুল। ইংরেজটা তার লক্ষ্যভেদ করলেই আমি গেছি... আপনার মনে আছে — আপনি আমায় বলেছিলেন কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, চোখ আর কানের মাঝখানের জায়গাটা, যেখানে মস্তিষ্ক থাকে। আপনার উপদেশ মনে পড়ে যাওয়াতে ওই জায়গাটা আড়াল করে মাথা ঘুরিয়ে পূর্ণ বেগে তীরের দিকে ছুটলাম। যখন তীরে উঠছিলাম, তখন আমার শরীরটাকে গুলি বিদ্ধ করা খুবই সোজা ছিল, কিন্তু মাথাটা আমার অন্তত ছিল বনের দিকে।

বোঝা যায় হাতি শিকারের নিয়ম ইংরেজটা ভালোই জানে, স্থির করল আমার পাছায় গুলি মেরে কোনো ফল হবে না। তাই গুলি বন্ধ করে সম্ভবত অপেক্ষা করতে লাগল আমি মুখ ফিরাই কিনা। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের কথা আর একটুও না ভেবে আমি দ্রুত ঢুকে পড়লাম জঙ্গলের মধ্যে।

বন ক্রমশ ঘন হয়ে উঠতে লাগল। লতায় পথ বন্ধ হয়ে গেল আমার। শিগ্‌গির এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লাম যে উপায়ান্তর না পেয়ে থামতে হল। এমন অসহ্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কাত হয়ে শুয়েই পড়লাম মাটিতে, হাতিদের সে ভাবে শোয়া উচিত কিনা একটুও ভাবলাম না।

তখন একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্ন দেখলাম আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রফেসর টার্নারের সহকারী। বার্লিনের আন্টার ডেন লিন্ডেনে আমার ছোট্টো ঘরখানায় বসে আছি। চমৎকার গ্রীষ্মের রাত, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবল একটি নিঃসঙ্গ তারা। বাইরে থেকে ভেসে আসছে ফুটন্ত লাইম গাছের গন্ধ; ছোট্ট টেবলটার ওপর একটা নীল ভেনিসিয়ান কাচের গেলাসে কিছু সুগন্ধি লাল কার্নেশন। এই সব সুগন্ধের মধ্যে থেকে অনাহূত অতিথির মতো আসছে কেমন একটা তীক্ষ্ম কটুমিষ্টি ঘ্রাণ — কালো কারেন্টের ঘ্রাণের মতো — টের পেলাম সেটা কোনো বুনো জানোয়ারের গন্ধ... কিন্তু পরের দিনের লেকচার তৈরি করছি আমি। মাথা গুঁজে রেখেছি বইয়ে; তারপর একটু তন্দ্রা এল আমার, লাইম, কার্নেশন আর বুনো জানোয়ারের গন্ধটা কিন্তু তখনো টের পাচ্ছি। তারপর আরে একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমি হাতি হয়ে গেছি, রয়েছি এক গ্রীষ্মমণ্ডলীর অরণ্যে... বুনো জানোয়ারের গন্ধ তীব্র হয়ে উঠে আমায় বিচলিত করছে। জেগে উঠলাম আমি। কিন্তু এতো স্বপ্ন নয়, সত্যিই যে হাতি হয়ে গেছি আমি, লুসিয়াস যেমন হয়ে গিয়েছিল গাধা*। কেবল আমার বেলায় ব্যাপারটা ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞানের যাদুতে।

দুপেয়ে জন্তুর গন্ধ পেলাম, কোনো এক দেশীয় আফ্রিকানের ঘামের গন্ধ। সেই সঙ্গে মিশে আছে শাদা চামড়ারও একটা গন্ধ; সম্ভবত নৌকা থেকে আমায় যে গুলি করেছিল সেই। তার মানে ফের আমার পিছু নিয়েছে। হয়ত এই মুহূর্তেই কোনো একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সে, বন্দুকের নল তাক করছে আমার চোখ আর কানের মাঝখানে বিপজ্জনক ছোট্ট জায়গাটার দিকে...

ঝট করে লাফিয়ে উঠলাম। গন্ধটা আসছিল ডান দিক থেকে, তার মানে আমাকে ছুটতে হবে বাঁ দিকে। তাই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতে শুরু করে দিলাম। তারপর — জানি না কোত্থেকে এ চালটা শিখলাম — পশ্চাদ্ধাবককে বিপথ চালিত করার জন্য হাতিরা যা করে তাই করলাম। খুব সোরগোল তুলে খানিকটা পিছু হটে যাবার পর হাতি হঠাৎ খুব চুপচাপ হয়ে যায়।

---

* লুসিয়াস - প্রাচীন রোমের লেখক আপুলেই-এর ব্যঙ্গ কাহিনী 'স্বর্ণ গর্দভ'এর প্রধান চরিত্র। — সম্পাঃ

কোনো শব্দ না শুনতে পেয়ে শিকারী ভাবে যে হাতিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতি কিন্তু ওদিকে তখনো পালাতে থাকে, কেবল পা ফেলে সে অতি সাবধানে, এত আস্তে ডালপালা সরিয়ে যায় যে একটা নিঃশব্দসঞ্চারী বেড়ালও তা পারবে না।

অন্তত দু কিলোমিটার ছুটে যাবার পর সাহস করে মাথা ফিরিয়ে গন্ধ নিলাম। তখনো লোকের গন্ধ আসছিল, কিন্তু মনে হল অন্তত কিলোমিটার দূর থেকে। হাঁটা থামালাম না।

নেমে এল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাত, গুমোট, অসহ্য গরম, আর সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও ফিরে এল। সে আতঙ্ক যেন আমায় চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরল, অন্ধকারের মতোই তার যেন শেষ নেই। কোথায় পালালে নিরাপদ হব? কী করব? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন বেশি ভয়ংকর মনে হল। তাই অবিচল অক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়েই চললাম।

কিছুক্ষণ পরেই পায়ের নিচে জল ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল। আরো কয়েক পা এগতেই দেখলাম একটা তীরে এসে পড়েছি। কিসের তীর? নদী, হ্রদ? ঠিক করলাম সাঁতরে যাব। জলের মধ্যে অন্তত বাঘ সিংহের আক্রমণ থেকে নিরাপদ বোধ করা যাবে। সাঁতরাতে শুরু করলাম, কিন্তু শিগ্‌গিরই অবাক হয়ে দেখলাম, আমার পা ঠেকছে তলার মাটিতে, জল গভীর নয়। তাই হেঁটেই চললাম আমি।

পথে অনেক জলা, কাদর, নদী পেরতে হল। ঘাসের মধ্য থেকে ছোটো ছোটো অদৃশ্য প্রাণীর হিস হিস শোনা গেল। বড়ো বড়ো ব্যাঙ ভয় পেয়ে লাফিয়ে ছিটকে যেতে লাগল। সারা রাত ধরে আমি ঘুরে বেড়ালাম। সকাল নাগাদ মানতেই হল যে একেবারে চূড়ান্ত রকমের বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

আরো কয়েকদিন গেল। আগে যাতে আতঙ্ক হত এমন অনেক কিছুর ভয় আমার কেটে গেল। আশ্চর্য মনে হবে, আমার নতুন জীবনের প্রথম কয়েকদিন এমন কি কাঁটা দেখেও ভয় হত বুঝি বিঁধে যাবে। হয়ত আমার শুঁড়ের ডগায় সেই কাঁটা বেঁধার ঘটনাটা থেকে এই ভয় জন্মেছিল। যাই হোক, অচিরেই আবিষ্কার করলাম যে সবচেয়ে কড়া তীক্ষ্ণ কাঁটাতেও আমার কোনো ক্ষতি হয় না, আমার শক্ত চামড়াটা বর্মের মতো আমায় রক্ষা করে। আগে ভয় হত, দৈবাৎ বুঝি বা কোনো বিষাক্ত সাপের গায়ে পা দিয়ে বসব। এটা যখন

প্রথম ঘটেছিল, সাপটা আমার পা জড়িয়ে কামড়াবার চেষ্টা করেছিল, তখন আমার বৃহৎ হস্তিহৃদয়ও ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তক্ষুণি টের পেলাম সাপে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না তারপর থেকে আমার পথ থেকে সরে যেতে দেরি করলে পায়ের তলে সাপ পিষে মারতে বেশ একটু মজাই লাগে আমার।

তাহলেও ভয় পাবার মতো বস্তু ছিল বৈকি। রাত্রে ভয় হত, বড়ো বড়ো হিংস্র জানোয়ার, সিংহ বা চিতাবাঘ আক্রমণ করবে। তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি, কিন্তু লড়াইয়ের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তাছাড়া যেসব সহজ প্রবৃত্তির দৌলতে হাতিরা লড়তে পারে, সেটাও আমার নেই। দিনের বেলাতে ভয় পেতাম শিকারীদের, বিশেষ করে শাদা চামড়াদের। আহ্, এই শাদা চামড়ারা! সবকিছু বুনো জানোয়ারের চেয়েও তারা বেশি ভয়াবহ। তাদের ফাঁদ, ফাঁস, হাতি ধরা গর্ত — এসবে আমার ভয় ছিল না। চেঁচামেচি করে আগুন জ্বালিয়ে ভয় পাইয়ে আমাকে খেদায় তাড়িয়ে ঢোকানোও সহজ নয়। আমার পক্ষে ভয় ছিল কেবল ক্যামুফ্লেজ করা গর্ত। তাই সব সময় খুব সতর্ক হয়ে পথ পরীক্ষা করে আমি এগোতাম।

বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেই আমি গাঁয়ের গন্ধ পেতাম; সব রকম লোকালয় থেকেই বেশ শতহস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করতাম আমি। আমার ঘ্রাণশক্তিতে বিভিন্ন দেশীয় উপজাতিদেরও পার্থক্য ধরতে পারতাম। তাদের কেউ কেউ আমার কাছে বেশি বিপজ্জনক, কেউ অত বিপজ্জনক নয়, কেউ বা আবার মোটেই নয়

একদিন শুঁড় বাড়িয়ে বাতাস শুঁকছি, হঠাৎ একটা নতুন গন্ধ পেলাম। বুঝতে পারলাম না গন্ধটা মানুষের নাকি বুনো জানোয়ারের। খুব সম্ভবত মানুষের। উৎসুক হয়ে উঠলাম। অন্তত জঙ্গলের সবকিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলাম আমি। আমার পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে এমন সবকিছু সম্পর্কেই খানিকটা জ্ঞান আমার থাকা দরকার। গন্ধটা অনুসরণ করে এগুতে লাগলাম আমি খুব সাবধানে। সময়টা তখন রাত্তির — দেশীয়রা সাধারণত তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যত এগিয়ে যেতে লাগলাম, গন্ধটা ততই জোরাল হয়ে উঠছিল। যাচ্ছিলাম যথাসম্ভব চুপি চুপি, সেই সঙ্গে সামনের পথে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম

সকাল নাগাদ পৌঁছলাম বনের একটা প্রান্তে। ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় উঁকি দিয়ে দেখলাম। বনের মাথায় একটা পান্ডুর চাঁদ, তা থেকে ছাই রঙের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে কতকগুলো নিচু ছুঁচলো মতো কুঁড়ের ওপর। মাঝারি লম্বা একটা লোক যদি বসে থাকে তবেই এ ধরনের কুঁড়েতে তাকে ধরা সম্ভব। চারিদিক চুপচাপ, একটা কুকুরও ডাকছে না। বাতাসের উল্টো দিক থেকে আমি এগোলাম। ঘরগুলো মনে হয় যেন ছেলেদের খেলা ঘর, কারা থাকে এখানে, ভাবছিলাম মনে মনে।

হঠাৎ মানুষের মতো দেখতে একটা ছোট্ট প্রাণী মাটির একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে শিস দিল মৃদুস্বরে। তার জবাবে গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে নামল আর একটা লোক। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল আরো দুজন। একটা বড়ো মতো প্রায় দেড় মিটার উঁচু একটা কুঁড়ের কাছে জড়ো হয়ে কী যেন একটা বৈঠক বসাল তারা। সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়তেই আমি পিগমিগুলোকে দেখতে পেলাম — এই ক্ষুদে প্রাণীরাই পিগমি। টের পেলাম দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম মানুষদের এক গ্রামে এসে পড়েছি আমি। গায়ের চামড়া এদের হালকা বাদামী, চুল প্রায় লাল। বেশ সুঠাম সুগঠিত দেহ, কিন্তু লম্বায় আশি কি নব্বই সেণ্টিমিটারের বেশি নয়। এই 'বালক'দের কারো কারো মুখে আবার ঘন কোঁকড়া দাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি কিচ্ মিচ্ করে কী যেন বলছে তারা।

দৃশ্যটা অতি চিত্তাকর্ষক কিন্তু ভারি আতঙ্ক হল আমার। এই ক্ষুদে বামনদের চেয়ে বরং অতিকায় দানবদের মুখে পড়তেও আমি রাজী। বলতে কি শাদা চামড়াদের সঙ্গে সাক্ষাতেও আমার আপত্তি নেই। দেখতে অতি ক্ষুদে হলেও পিগমিরা হল হাতির সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। হাতি হবার আগেই সেটা আমি জানতাম। তীর আর বল্লম ছোড়ায় এরা ওস্তাদ। তীরে বিষ মাখিয়ে রাখে, তার একটি খোঁচাতেই মারা পড়তে পারে হাতি। চুপি চুপি এগিয়ে আসে পেছন থেকে, হাতির পেছনকার পায়ে ফাঁস লাগায়, নয়ত ছুড়ি দিয়ে তার গোড়ালির রগ কেটে ফেলে। গাঁয়ের চারপাশে ছড়িয়ে রাখে বিষাক্ত কাঁটা আর ডান্ডা ...

ঝট করে ফিরেই ছুটতে লাগলাম আমি, চিতাবাঘের কাছ থেকে পালাবার সময় যত জোরে ছুটেছিলাম, ততো জোরে। পেছনে চিৎকার, তারপর দ্রুত তাড়া

করে আসা লোকজনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সমান পথ পেলে সহজেই তাদের পিছে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু বনের এ পথে অসংখ্য দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক পাশ কাটিয়ে এগুতে হচ্ছিল আমায়। ওদিকে আমার পশ্চাদ্ধাবকেরা মর্কটের মতো ক্ষিপ্র, টিকটিকির মতো সচল, কুকুরের মতো অক্লান্ত। দ্রুত ছুটে আসতে লাগল তারা, কোনো বাধাই যেন তাদের কাছে বাধা নয়। ক্রমেই কাছিয়ে আসছিল তারা, কয়েকটা বল্লমও ছুঁড়লে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঘন ঝোপঝাড়ের ফলে গায়ে লাগল না। ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি, ক্লান্তিতে টলে পড়ি আর কি। অথচ ঐ ক্ষুদে মানুষেরা না থেমে না হোঁচট খেয়ে সমানে পিছু ধাওয়া করে চলেছে।

তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই টের পেলাম যে হাতি হওয়া সহজ ব্যাপার নয়; হাতির মতো প্রকাণ্ড প্রবল এক প্রাণীর সারা জীবনই হল অস্তিত্বের জন্য এক নিয়ত সংগ্রাম, মুহূর্তের জন্যেও তার বিরাম নেই। মনে হল হাতি একশ বছর কি তারও বেশি বাঁচে, এ খুবই অসম্ভব। এত দুশ্চিন্তা নিয়ে মানুষের চেয়ে অনেক আগেই তাদের প্রাণ যাওয়ার কথা। কিন্তু আসল হাতি হয়ত আমার মতো এমন দুশ্চিন্তা করে না। আমার মস্তিষ্কটা মানুষের, তা খুবই স্নায়বিক, খুব সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপনাকে সত্যি বলেছি, এই সব সময়ে মনে হত, পেছনে অনবরত মৃত্যু তাড়া করে ফিরছে এমন জীবনের চেয়ে বরং মৃত্যুই ভালো। হাল ছেড়ে দেব কি? দাঁড়িয়ে পড়ব, আমার দুপেয়ে শত্রুদের বিষাক্ত বল্লম আর তীরের সামনে বুক পেতে দেব?.. হয়ত তাই করতাম, কিন্তু হঠাৎ আমার মনোভাব বদলে গেল। একদল হাতির কড়া গন্ধ পেয়ে গেলাম শুঁড়ে। হাতির দলের মধ্যে গিয়ে বেঁচে যাব হয়ত?

ঘন জঙ্গল পাতলা হয়ে এসে ক্রমে তৃণভূমিতে মিলিয়ে যেতে লাগল। সেখানকার ছাড়া ছাড়া উঁচু উঁচু গাছগুলোর কল্যাণে তখনো তীরের খোঁচা খাইনি।

ছুটতে লাগলাম আঁকাবাঁকা পথে। বনের মধ্যে পিগমিদের যে রকম সুবিধা হয়েছিল এখানে তেমন হল না। আমার পায়ে বেশ চওড়া একটা পথ হয়ে গেলেও সাভানা গাছ আর ঘাসের প্রবল ডাঁটায় ধাওয়া করা মুস্কিল হচ্ছিল তাদের। হাতিদের গন্ধ আরো কড়া হয়ে উঠল যদিও তখনো তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না।

পথে দেখলাম বড়ো বড়ো গর্ত, হাতি ধরা পড়ে আছে সেখানে। মনে হচ্ছিল মাটির ওপর থেবড়ে বসে আছে মুরগি। মাঝে মাঝে হাতির নাদি চোখে পড়ছিল। তারপর হঠাৎ এক ঝাড় গাছের কাছে পৌঁছতেই দেখলাম একদল হাতি মাটিতে বসে জাবর কাটছে। আরো কতকগুলো হাতি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে আর পাখার মতো করে শুঁড় দিয়ে দোলাচ্ছে গাছের বড়ো বড়ো ডাল। কানগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে ছাতার মতো। আরো কতকগুলো হাতি শান্তভাবে স্নান করছে নদীতে। আমি আসছিলাম বাতাসের উল্টো দিক থেকে, তাই আমার গন্ধ পায়নি ওরা। সোরগোল উঠল কেবল আমার পায়ের শব্দ শোনার পর। তখন একেবারে হুলুস্থুলু পড়ে গেল! নদীর তীরে দাপাদাপি করে পাগলার মতো ডাক ছাড়তে লাগল সবাই। পালের গোদা সবাইকে রক্ষা করার বদলে সবার আগে ছুটল নদীর দিকে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে উঠল অপর পারে। মাদি হাতীগুলো বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে, যদিও আয়তনে সে বাচ্চারা পূর্ণবয়স্ক জানোয়ারের মতোই। পশ্চাদভাগ রক্ষার দায় আবার পড়ল কেবল মাদি হাতিগুলোর ওপর। আমার হঠাৎ আগমনেই কি এমন ভয় পেয়ে গেল ওরা, নাকি আমি যে কারণে ছুটছি তাছাড়াও অন্য কোনো একটা বিপদ দেখতে পেয়েছে তারা?

সর্বশক্তিতে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাচ্চাবাচ্চা সমেত বেশ কয়েকটি মাদি হাতিকে পিছনে ফেলেই পার হয়ে গেলাম নদী। চেষ্টা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে যাব যাতে পেছনে হাতির দলটা থাকার ফলে পশ্চাদ্ধাবকদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারি। এটা অবশ্য আমার স্বার্থপরতা, কিন্তু দেখলাম, মাদি হাতিগুলো ছাড়া অন্য হাতিগুলোও ঠিক একই ব্যাপার করছিল। কানে এল পিগমিরা নদীর তীর পর্যন্ত ছুটে এসেছে। তাদের ক্যাঁচকেঁচে গলার সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল হাতির ডাক। নিশ্চয় খুনজখম হচ্ছিল সেখানে, কিন্তু পেছন ফিরে তাকাবার সাহস ছিল না আমার। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটেই চললাম। ক্ষুদে মানবদের সঙ্গে অতিকায় প্রাণীদের এই নদী তীরের যুদ্ধটার শেষ কী হয়েছিল জানি না।

হাতিদের সঙ্গে মিলে দৌড়লাম কয়েক ঘণ্টা। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ওদের সঙ্গে তাল রাখা দায় হয়েছিল। কিন্তু সংকল্প করেছিলাম, কিছুতেই

পেছনে পড়ে থাকব না। হাতিরা যদি আমাকে তাদের দলে নেয়, তাহলে অনেকটা নিরাপদে থাকা যাবে. জায়গাটা তারা জানে, শত্রুদের তারা ভালো করে চেনে আমার চেয়ে।

১১। হাতির পালে

শেষ পর্যন্ত পালের গোদাটা থামল, অন্যেরাও থামল তার সঙ্গে। সবাই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। পশ্চাদ্ধাবন থেমে গেছে। কেবল দুটো জোয়ান হাতি আর তাদের মাদিরা আসছিল আমাদের পেছন পেছন!

মনে হল আমাকে যেন ওরা নজরই করছে না। পিছিয়ে পড়ারা সবাই কিন্তু যখন এসে সঙ্গ ধরল এবং সবাই শান্ত হয়ে এল একটু, তখন হাতিগুলো এসে শুঁড় দিয়ে আমায় শুঁকে দেখতে লাগল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল আমাকে, অথবা এমনিই খানিক ঘুরে বেড়াল আমার চারপাশে। একটা নরম বিড়বিড় আওয়াজ করলে তারা, সম্ভবত কিছু একটা জিজ্ঞেস করছিল আমাকে, কিন্তু কোনো জবাব দিলাম না আমি। ওরা যে শব্দ করছিল তার মানেই আমি জানতাম না, জানতাম না সেটা বিরক্তির নাকি তৃপ্তির শব্দ।

সবচেয়ে ভয় ছিল পালের গোদাটাকে জানতাম, ভাগনার অপারেশন করার আগে আমিও ছিলাম গোদা হাতি। হয়ত এটা সেই দলটাই! পালের নতুন গোদাটা হয়ত আমার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই বাধিয়ে বসবে স্বীকার করছি যে প্রকাণ্ড মহাবল গোদাটা যখন আমার কাছে এগিয়ে এল, যেন নিতান্তই দৈবাৎ তার দাঁতটা দিয়ে খোঁচা মারলে আমার গায়ে, তখন বেশ নার্ভাস হয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু নিরীহ ভাব করেই রইলাম আমি। দ্বিতীয় বার সে খোঁচা মারলে, যেন চ্যালেঞ্জ করলে লড়াইয়ে কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ না নিয়ে আমি কেবল একটু পাশে সরে গেলাম। হাতিটা তখন আলগোছে শুঁড় গুটিয়ে মুখের মধ্যে পুরে চুষতে লাগল। পরে জেনেছিলাম, হাতিরা বিস্ময় বা বিহ্বলতা প্রকাশ করে এই ভাবে। আমার নিরীহতায় গোদাটা স্পষ্টই বিব্রত হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিল না কী করবে. হাতির ভাষা আমার তখন জানা ছিল না। ভাবলাম ওটা বোধহয় আমাকে স্বাগত করার ইঙ্গিত, তাই আমিও আমার শুঁড় গুঁজলাম মুখে। অস্ফুট শব্দ করে সরে গেল হাতিটা।

হাতির প্রতিটি শব্দ এখন আমি জানি। জানি যে নরম, গম গম শব্দটা আর এই অস্ফুট ক্যাঁচকেঁচে শব্দ, এ দুটোই পরিতৃপ্তির শব্দ আতঙ্ক প্রকাশ করা হয় একটা উচ্চ গর্জনে, আচমকা ভয় পেলে করে একটা সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শব্দ। আমায় প্রথম দেখে ঠিক অমনি সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠেছিল দলটা। রাগে, জখম বা বিচলিত হলে তারা একটা গভীর গর গর শব্দ তোলে। পিগমিদের আক্রমণের সময় নদী তীরে যে একটা হাতি রয়ে গেছল সে এই রকম শব্দ করছিল। সম্ভবত একটা বিষাক্ত তীরের মারাত্মক ঘা খেয়েছিল সে। আর যখন শত্রুকে আক্রমণ করে, তখন একটা কর্ণভেদী চিৎকার করে তারা। এ হল হাতিদের শব্দকোষের কয়েকটা মূল শব্দ — যাতে কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটা অনুভূতিই ব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই 'শব্দগুলো' ছাড়াও আবার অর্থের রূপভেদ আছে।

প্রথম প্রথম খুবই ভয় ছিল, হাতিরা হয়ত টের পেয়ে যাবে যে আমি সাধারণ হাতি নই, দল থেকে তেড়ে ভাগাবে আমায়. আমার যে কিছু একটা গোলমাল আছে সেটা তারা হয়ত সত্যিই ধরেছিল, কিন্তু দেখা গেল, তাদের মনোভাব যথেষ্ট শান্তিপূর্ণই। ভাবল হয়ত আমি একটা ন্যালাখ্যাপা ছেলে, মাথাটা কিছু খারাপ, তবে কারো কোনো অনিষ্ট করে না।

এবার থেকে আমার যা অভিজ্ঞতা সেটা বেশ একঘেয়ে। সর্বত্রই আমরা হাঁটতাম একের পর এক লাইন বেঁধে। সকাল দশটা এগারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম. তারপর ফের চরে বেড়ানো। রাত্রেও কয়েক ঘণ্টা অবকাশ। কেউ কেউ গড়িয়ে নিত, প্রায় সকলেই ঢুলত, কিন্তু একজন থাকত পাহারায়।

সারা জীবন একটা হাতির পালের সঙ্গে কাটাব এটা কিছুতেই মনে ধরছিল না. মানুষের জন্য মন কেমন করত। দেহটা আমার হাতির হলেও সাধারণ লোকজনের সঙ্গে শান্তিতে নির্ভাবনায় দিন কাটানোই আমার পছন্দ শাদা চামড়াদের কাছে চলে যেতে খুবই রাজী ছিলাম, কিন্তু ভয় ছিল আমার দাঁতের জন্যে ওরা হয়ত আমায় মেরে ফেলবে। সত্যি বলতে কি দাঁতটা নষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, তাতে মানুষের কাছে আমার মূল্য থাকত না, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। হয় দাঁত আমার অক্ষয়, নয়ত কী করে

ভাঙতে হয় তা আমার জানা ছিল না। এইভাবে হাতির পালের সঙ্গেই মাসাধিক ঘুরে বেড়ালাম।

একদিন খোলা মাঠে চরছি, চারদিকে তৃণের আর শেষ নেই। পাহারার পালা আমার। তারায় ভরা রাত, চাঁদ নেই আকাশে। পালের সবাই খানিকটা চুপচাপ। আমি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম একটু ভালো করে শোনবার আর গন্ধ নেবার জন্যে। কিন্তু গন্ধ যা পাচ্ছিলাম সে কেবল ঘাসের, কাছাকাছি নিরীহ ছোটোখাটো সরীসৃপ আর জীবজন্তুর। হঠাৎ অনেক দূরে, প্রায় দিগন্তের রেখায় একটা আলো দেখা গেল। আলোটা নিভে গিয়ে ফের জ্বলে উঠল আগুনের শিখায়।

কয়েক মুহূর্ত যেতে প্রথম আলোটার বাঁ দিকে জ্বলে উঠল আরো একটা আগুন, তারপর আরো কিছু দূরে তৃতীয় ও চতুর্থ আগুন। শিকারীরা রাত্রের জন্য ছাউনি ফেলে যে আগুন জ্বালে এ তা নয়। আগুন জ্বলছিল নিয়মিত এক একটা দূর পরপর, যেন একটা বড়ো রাস্তা পেতে বাতি জ্বালানো হয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম, উল্টো দিক থেকেও ঠিক একই রকম আলোর ঝক্‌ঝকানি। দুই সারি আগুনের মাঝখানে পড়েছি আমরা। শিগগিরই এই দুই সারির এক প্রান্ত থেকে হল্লা শুরু করবে শিকারীরা আর অন্য মুখে থাকবে হয় গর্ত নয়ত খেদা — শিকারীরা আমাদের জ্যান্ত ধরতে চায় নাকি মারতে চায় সেই অনুসারে। গর্তে পড়লে আমরা পা ভেঙে বসব, তখন কোনো কাজেই লাগব না, মরণ ছাড়া। খেদায় পড়লে দাসত্বের এক জীবন। হাতিরা আগুন দেখে ভয় পায়। সাধারণত ভীরু জন্তু তারা। হৈহল্লায় চকিত হয়ে উঠে তারা ছুটতে থাকে খোলা মুখটার দিকে, যেখানে আগুন বা হৈহল্লা নেই — আর সেই দিকেই থাকে নীরব ফাঁদ বা মৃত্যু।

গোটা পালের মধ্যে একমাত্র আমিই অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু সেটা কি আমার পক্ষে একটা সুযোগ? কী করব আমি? আগুনের দিকে ছুটে যাব? সেখানে আছে সশস্ত্র মানুষ। হয়ত বেষ্টনী ভেদ করে যাবার সৌভাগ্য হতে পারে। অনিবার্য মৃত্যু বা দাসত্বের চেয়ে এই ঝুঁকি নেওয়া ভালো, কিন্তু সে ক্ষেত্রে দল ছাড়া হয়ে যাব, নিঃসঙ্গ হাতি হিসেবে জীবন শুরু করতে হবে। আর আজ হোক কাল হোক প্রাণ দিতে হবে একটা বুলেটে, একটা বিষাক্ত তীর নয়ত কোনো জন্তুর নখরে।

মনে হবে তখনো যেন ইতস্তত করছি, অথচ আসলে পথ আমার বাছা হয়ে গিয়েছিল, কেননা অজ্ঞাতসারেই আমি দল থেকে সরে আসছিলাম, চকিত হয়ে হাতির দল যেই দাপাদাপি শুরু করবে, তখন হস্তিদেহের সেই ভিড়ের টানে আমি যেন বিপদের মুখে না পড়ি।

ততক্ষণে শিকারীদের চেঁচামেচি, ঢাকের বাদ্যি, হুইসল, গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। খুব গভীর একটা শিঙার মতো আওয়াজ করলাম আমি। হাতিরা জেগে উঠে চকিত হয়ে ডাক ছেড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিলে। এমন অসম্ভব গর্জন যে মাটি থর থর করে উঠল। আশেপাশে তাকিয়ে হাতিরা দেখল, আগুনগুলো যেন ক্রমশ কাছিয়ে আসছে (সত্যি সত্যিই কাছিয়ে আসছিল আগুন)। ডাক থামিয়ে সব এক দিক পানে ছুটল হাতিরা, কিন্তু সেদিকে শিকারীদের হৈহল্লা বেড়ে ওঠাতে তারা ছুটল ঠিক উল্টো দিকে — সর্বনাশের মুখে। মৃত্যু অবশ্য তখনো খুব কাছে নয় — এই হাতি তাড়া চলে কয়েকদিন ধরে। ক্রমাগত কাছিয়ে আসবে আগুন, কাছিয়ে আসবে শিকারীরা, ধীরে ধীরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাতিদের যতক্ষণ না তারা গিয়ে পড়বে হয় গর্তে নয় খেদায়।

আমি কিন্তু হাতির দলের সঙ্গে গেলাম না। একলা রয়ে গেলাম। হাতির গোটা পালের মধ্যে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল তা সঞ্চারিত হয়ে গেল আমার হস্তি-স্নায়ুতে, সেখান থেকে মানব মস্তিষ্কে। আমার সচেতন মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভয়ে। ঐ দলের সঙ্গেই হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছিলাম আর কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবিক সাহস, সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করলাম। না! আমার মানব মস্তিষ্ক দিয়ে জয় করতে হবে আমার হস্তিসুলভ আতঙ্ক; রক্ত মাংসের, অস্থির যে বিরাট পাহাড়টা আমায় ধ্বংসের দিকে টানছে তাকে শাসন করতে হবে।

ঠিক একজন লরি ড্রাইভারের মতো আমার 'লরি'র হুইল আমি ঘুরিয়ে দিলাম সোজা নদীর দিকে। ছলাৎ করে উঠল জল, ছিটকে পড়ল চারিদিকে, তারপরেই সব চুপচাপ ... জলে আমার হস্তিরক্ত শান্ত হয়ে এল। মস্তিষ্কের জয় হল। এখন আমার হাতির পা যুক্তির লাগামে কড়া করে বাঁধা। আমার ইচ্ছার বশ মেনে ওরা এখন নদীর পাঁকালো তলদেশে পা ফেলে চলেছে।

ঠিক করলাম, হিপোপটেমাসের মতো সমস্ত শরীরটা জলে ডুবিয়ে রাখব সাধারণ হাতি এ ব্যাপার করার কথা কখনো ভাবতেও পারে না। নিঃশ্বাস নেব শুঁড়ের ডগা দিয়ে। অন্তত তাব চেষ্টা করলাম। কিন্তু চোখে আর কানে জল লেগে অস্বস্তি হচ্ছিল। থেকে থেকে মাথা তুলে শোনার চেষ্টা করছিলাম। খুবই কাছে এসে গেছে শিকারীরা। ফের ডুব দিলাম জলে। শেষ পর্যন্ত আমায় না লক্ষ্য করেই পেরিয়ে চলে গেল শিকারীরা।

অবিরত এই আতঙ্ক আর উত্তেজনা ইতিমধ্যে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। যাই হোক না কেন, ঠিক করলাম শিকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। কঙ্গো নদী বেয়ে সাঁতরে যাব কোনো একটা কুঠির খোঁজে। স্ট্যানলিপুল আর বমের মাঝখানে এমন কুঠি আছে কতকগুলো। কোনো একটা খামার বা কুঠিতে গিয়ে হাজির হব, যে করে হোক লোককে বোঝাব যে আমি বুনো হাতি নই, ট্রেনিং পাওয়া হাতি। তারা আমায় মারবে না বা তাড়া করবে না।

১২। বোম্বেটেদের চাকরি

দেখা গেল, পরিকল্পনাটা কাজে হাসিল করা তেমন সহজ নয়। অচিরেই কঙ্গোর প্রধান নদী পথ দিয়ে রওনা দিলাম। চললাম স্রোতের অনুকূলে। দিনের বেলা যেতাম তীর বরাবর, রাত্রে সাঁতরে চলতাম মাঝ নদী দিয়ে। এ ভাবে যাওয়াটা নিরাপদ। নদীর এ অংশে নৌকা চলাচল করে, তাই বুনো জানোয়াররা তীর ঘেঁসে যেতে ভয় পায়। গেলাম প্রায় মাসখানেক ধরে, তার মধ্যে কেবল একবার শুনেছিলাম দূরে একটা সিংহের ডাক, আর একবার একটা বিশ্রী মোলাকাত হয়েছিল — বলা যায় ধাক্কা লেগেছিল একটা জলহস্তীর সঙ্গে। ঘটনাটা ঘটে রাত্রে। কেবল নাকটি বার করে সে জলকেলি করছিল। আমি নজর করিনি। সাঁতরাতে সাঁতরাতে তুষার শিলায় জাহাজের ধাক্কা লাগার মতো করে ধাক্কা লাগল বিদঘুটে জন্তুটার সঙ্গে। জানোয়ারটা একেবারে গভীরে তলিয়ে গেল, তার ভোঁতা মুখটা দিয়ে কষে গুঁতো মারতে লাগল আমার পেটে। আমি তাড়াতাড়ি করে সাঁতরে দূরে চলে গেলাম। জলহস্তী ভেসে উঠে রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পিছু নিলে আমার। যাই হোক, ওর নাগাল ছাড়িয়ে যেতে অসুবিধা হল না।

এইভাবে সাঁতরে নিরাপদে এসে পৌঁছলাম লুকুঙ্গাতে এখানে একটা মস্ত বেলজিয়ান কুঠি আছে, অন্তত পতাকাটা দেখে তাই অনুমান করলাম। ভোর বেলায় বন ছেড়ে মাথা দোলাতে দোলাতে হেঁটে গেলাম বাড়ির দিকে। কিন্তু তাতে কোনো সুবিধা হল না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো চৌকি কুকুর প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে আমার পেছনে লাগল। শাদা শার্ট পরা একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু আমায় দেখেই ফের ঢুকে পড়ল। চেঁচামেচি করে কতকগুলো নিগ্রো আঙিনা পেরিয়ে গিয়ে আশ্রয়ও নিল বাড়িটায়। তারপর .. রাইফেল চলল দুবার। তৃতীয় বারের জন্য আর অপেক্ষা করলাম না। জায়গাটা ফেলে ফের বনে এসে ঢুকতে বাধ্য হলাম।

একদিন রাত্রে একটা পাতলা বিষণ্ণ বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। মধ্য আফ্রিকায় এ রকম বন অনেক। কালো কালো গাছপালা, পায়ের নিচের মাটি কাদা-কাদা, কালো কালো গুঁড়ি। কিছু আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে, বিষুবমণ্ডলের পক্ষে রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা, ফুর ফুরে হাওয়া বইছিল। মোটা চামড়া সত্ত্বেও অন্যান্য হাতির মতো আমারও স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া সহ্য হয় না। বৃষ্টি পড়লে বা আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে থাকলে আমি শরীর গরম রাখার জন্যে হাঁটিতে থাকি।

নিয়মিত গতিতে কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর একটা আগুন দেখতে পেলাম। এলাকাটা রীতিমতো বুনো; আশেপাশে একটি নিগ্রো গ্রামও চোখে পড়ে না। এ আগুন জ্বালল কে? একটু দ্রুত এগিয়ে গেলাম। বন শেষ হয়ে গেল। সামনে নিচু তৃণভূমি। নিশ্চয় কিছু আগে এখানে একটা দাবানল দেখা দিয়েছিল, ঘাস এখনো বেড়ে ওঠেনি বন থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে একটা পুরনো জীর্ণ তাঁবু। তার সামনেই আগুন জ্বলছে, কাছে দু জন লোক, স্পষ্টতই ইউরোপীয়। ওদের একজন আগুনের ওপর ঝোলানো একটা পাত্রে রান্না নাড়ছে। তৃতীয় লোকটি বেশ সুপুরুষ, স্পষ্টতই দেশীয়, অর্ধনগ্ন — অগ্নিকুণ্ড থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো।

ওদের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে আগুনের দিকে এগুলাম। আমার দিকে তাকাতেই আমি পোষা হাতির মতো হাঁটু জুড়ে বসলাম পিঠে বোঝা নেবার মতো করে। শোলার টুপি পরা বেঁটে লোকটা একটা রাইফেল টেনে নিল

স্পষ্টই গুলি করার জন্যে। কিন্তু দেশীয় লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল:

'মারিস না, মারিস না, ভালো হাতি, পোষমানা হাতি!' আমার কাছে ছুটে এল সে।

'সরে যা ওখান থেকে, নয়ত তোর মাথাটাই ফুটো করে দেব। এই! কী নাম তোর?' নিশানা করতে করতে বললে শাদা লোকটা।

না সরেই উত্তর দিল দেশীয় লোকটা, 'ম্পেপো।' আমার আরো কাছে সরে এল সে, যেন তার দেহটা দিয়ে সে বুলেট আড়াল করতে চায়।

'দেখছিস না বানা*, এটা পোষমানা,' আমার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে সে বললে।

'ভাগ বলছি, বাঁদর কোথাকার!' রাইফেল হাতে লোকটা চ্যাঁচাল, 'গুলি করব কিন্তু, এক — দুই —'

'দাঁড়া, বাকালা,' বললে দ্বিতীয় শাদা লোকটা। বেশ লম্বা, রোগা সে, 'ম্পেপো ঠিকই বলেছে। যথেষ্ট দাঁত জোগাড় হয়েছে আমাদের, কিন্তু মাথাড়ি পর্যন্ত হলেও বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না, শস্তাও পড়বে না। হাতিটা পোষমানাই বটে। কে তার মনিব, কেমন করে এখানে এসে পেঁছিল সে সব খোঁজ না নিয়ে কাজে লাগানো যাবে ওটাকে। টন খানেক বোঝা হাতি বেশ তুলতে পারে, যদিও তা নিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না। ধরা যাক আধটন বইতে পারবে ঠিক। তিরিশ কি চল্লিশটা কুলির কাজ করে দেবে। বুঝছিস না, তাতে একটা পয়সাও খরচ লাগবে না আমাদের। যখন আর আমাদের দরকার লাগবে না তখন মেরে ফেললেই হবে। ওর খাসা দাঁত দুটোও পাওয়া যাবে। কী বলিস?'

বাকালা নামধারী লোকটা অধৈর্যভরে শুনতে শুনতেই কয়েকবার নিশানা করলে। কিন্তু তার সঙ্গী যখন বললে হাতির বদলে কুলি ভাড়া করলে কত খরচ পড়বে তখন সে শেষ পর্যন্ত কথা শুনে রাইফেল নামিয়ে রাখল।

'এ্যাই, কী নাম তোর?' চেঁচাল সে দেশীয় লোকটার উদ্দেশে।

জবাব এল, 'ম্‌ — ম্পেপো'। পরে দেখেছি যে দেশীয় লোকটাকে ডাকবার

---

* বানা — কর্তা, সাহেব। — সম্পাঃ

সময় বাকালা সর্বদাই ওই কথা জিজ্ঞেস করত আর ও-ও ঠিক ঐ একই জবাব দিত, ম্ অক্ষরের ওপর থেমে যেত একটু, যেন নিজের নামটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'এদিকে আয়, নিয়ে আয় হাঁতিটাকে।'

স্পেপো যখন আমাকে আগুনের কাছে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে, তখন সাগ্রহেই তা পালন করলাম আমি।

'কী বলে ডাকা যায় ওকে? এ্যাঁ? ট্রুয়েন্ট* নামটা বেশ যুৎসই হবে কী বলিস কক্স?'

কক্সের দিকে তাকালাম আমি। ওর সমস্ত গায়ের রঙটা কেমন নীলচে। বিশেষ করে অবাক হলাম ওর নাকটা দেখে, মনে হয় যেন লাইলাক রঙে ডুব দিয়ে উঠেছে। নীলচে গায়ের ওপর আবার একটা নীলচে শার্ট, গলা খোলা, আস্তিন কনুইয়ের উপর গুটানো। গলাটা ভাঙা ভাঙা, কেমন অস্ফুট তোতলামির সুরে কথা বলে, সে সুরটাও কেমন যেন নীলচে বলে মনে হল আমার। ভাঙা গলাটা তার শার্টের মতোই বিবর্ণ।

'বেশ,' সায় দিল কক্স, 'ট্রুয়েন্ট বলেই ডাকা যাবে।'

আগুনের কাছেই এক দলা ছেঁড়া কাপড়চোপড় যেন নড়ে উঠল। মোটা গলায় কে জিজ্ঞেস করলে:

'কী ব্যাপার?'

'এখনো বেঁচে আছিস তাহলে? আমরা তো ভেবেছিলাম সেঁটে গেছিস,' কাপড়ের স্তূপটার উদ্দেশে বাকালা বললে শান্ত গলায়।

স্তূপটা ফের নড়ে চড়ে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা মস্ত হাত। ছেঁড়া কাপড়চোপড় ঝেড়ে ফেলে উঠে বসল বেশ দীর্ঘকায় সুপুরুষ একটি লোক, দুই হাতে ভর দিয়ে দুলতে লাগল একটু। মুখটা ভয়ানক ফ্যাকাশে, লালচে দাড়ি এলোমেলো। স্পষ্টতই লোকটার খুব অসুখ — মুখটা বরফের মতো শাদা। নিষ্প্রভ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

'তিন ভবঘুরের সঙ্গে জুটল চার নম্বর। শাদা চামড়া — কালো মন, কালো চামড়া শাদা মন। একটি কেবল সৎ, আর সে বাকুবা।' বলে নিস্তেজ হয়ে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা।

---

* ট্রুয়েন্ট (ইং) — ভবঘুরে। — সম্পাঃ

'ভুল বকছে,' মন্তব্য করলে বাকালা।

কক্স বললে, 'এ ধরনের ভুল বকুনি কিন্তু অপমানকর। হেঁয়ালি করে কথা কইছে। একজন সৎ আর সে হল বাকুবা। কী বলছে বুঝলি? স্পেপো হল বাকুবা জাতের লোক। ওর দাঁত দেখলেই বুঝবি। ওর ওপরের পাটির সামনের দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটা বাকুবা প্রথা। তার মানে ওই কেবল সৎ লোক আর আমরা সবাই ছ্যাঁচোড়।'

'ব্রাউন সমেত। ওর চামড়া আমাদের চেয়েও শাদা, তার মানে মনটা ওর আরো কালো। ব্রাউন, তুইও একটা ছ্যাঁচোড়, বুঝেছিস?'

কিন্তু কোনো জবাব দিল না ব্রাউন।

'ফের জ্ঞান হারিয়েছে।'

'সেই ভালো, মরলে আরো ভালো। ও আর এখন আমাদের কাজে লাগছে না বিশেষ, বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু সেরে উঠলে ও একাই আমাদের দুজনের কাজ করবে।'

'সেই আনন্দই থাক। বুঝতে পারছিস না ও এখন নিতান্তই ফালতু।'

বিড়বিড় করে কী একটা ভুল বকল ব্রাউন, আলাপটা তাই ওখানেই থেমে গেল।

'এাই — কী নাম তোর?'

'স্-স্পেপো...'

'হাতিটা নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ, পালায় না যেন।'

'না পালাবে না,' আমার পায়ে হাত বুলিয়ে জবাব দিলে স্পেপো।

পরের দিন সকালে আমার মনিবদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। সবচেয়ে ভালো লাগল স্পেপোকে। সব সময়েই সে হাসিখুশি, ঝকঝক করছে তার শাদা দাঁত — অবশ্য ওপরের দুটি দাঁত না থাকায় একটু বিকৃত। বোঝা গেল, হাতি ভালোবাসে স্পেপো, বেশ যত্ন করত আমার। আমার কান, চোখ, পা, চামড়ার ভাঁজগুলো সব ধুয়ে দিত। উপহারও আনত আমার জন্যে মিষ্টি ফল পাকুড়, আমার জন্যেই বিশেষ করে এসব খুঁজে আনত সে।

ব্রাউন তখনো অসুস্থ তাই লোকটা ঠিক কেমন তা বিশেষ বোঝা গেল না। মুখখানা ওর ভালো লাগত, আর সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলার খোলামেলা ধরনটা। কিন্তু বাকালা আর কক্সের প্রতি আমার একটা গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল।

বিশেষ করে বাকালা তার নোংরা ছেঁড়া স্যুটে এক অদ্ভুত অপ্রীতিকর জীব বলে বোধ হল. স্যুটটার কাট বেশ ভালো, কাপড়টাও দামী, সম্ভবত কোনো এক ধনী পরিব্রাজকের। মনে হল, এই স্যুট আর তাঁবু দুই ই বাকালা কোনো একটা বেআইনী উপায়ে অর্জন করেছে। হয়ত কোনো নামজাদা ব্রিটিশ অভিযানকারীকে খুন করে লুটপাট করেছে। চমৎকার রাইফেলটাও এই ইংরেজের সম্পত্তি হওয়ারই সম্ভাবনা ওর চওড়া বেল্টে সর্বদাই থাকত একটা বড়ো রিভলভার আর অতিকায় একটা ছোড়া। জাতে সে হয় পর্তুগীজ নয় স্প্যানিশ — স্বদেশ, পরিবার বা নির্দিষ্ট কোনো পেশা, কিছুই নেই।

ঝাপসা নীলাভ চেহারার কক্স হল ইংরেজ, স্বদেশের আইন বহির্ভূত। তিনজনেই বোম্বেটে, হাতি মারে কেবল তার দাঁতের জন্যে, কোনো আইন-কানুন বা সীমান্তের কোনো পরোয়া করে না।

তাদের পথপ্রদর্শক আর নির্দেশকের কাজ করত স্পেপো। বয়স খুব কম হলেও হাতির ব্যাপারে এবং হাতি শিকারে সে ওস্তাদ। হাতি শিকারের পদ্ধতি তার অবশ্য নিষ্ঠুর ও বর্বর, কিন্তু অন্য কোনো পদ্ধতি সে জানত না। পুরুষানুক্রমে পাওয়া পদ্ধতিরই প্রয়োগ করত সে। বোম্বেটেদের কাছে অবিশ্যি সবই সমান, হাতি কী ভাবে মারা হল তাতে কিছুই তাদের এসে যায় না। আগুনের বেষ্টনীতে ফেলে তারা হাতিদের পুড়িয়ে মারত দমবন্ধ করে, মারত তীক্ষ্ম খুঁটি গাড়া গর্তে ফেলে, গুলি করত, পেছনের পায়ের শিরা কেটে দিত, গাছের ওপর থেকে ভারি গুঁড়ি ফেলে অজ্ঞান করে দিয়ে পরে শেষ করে দিত। স্পেপো ছিল ওদের কাছে খুব কাজের।

১৩। ট্রুয়েন্টের বেয়াদবি

ব্রাউন কিছুটা ভালো হয়ে উঠলেও তখনো হাতি শিকারে যাবার মতো সক্ষম নয়। কক্স আর বাকালা আমার পিঠে চেপে রওনা দিল কয়েক দশক কিলোমিটার দূরে, আগের দিন যে হাতি মারা হয়েছিল তার দাঁত জোগাড়ের জন্যে। মন খুলেই কথা বলছিল ওরা, ভেবেছিল কেউ শুনছে না; ওদের কাছে আমি তো একটা ভারবাহী পশু মাত্র।

'ওই চকোলেট রঙের বাঁদরটা — কী নাম যেন ওর — পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে ওকে। সেই চুক্তি।' বাকালা বলছিল।

কক্স বললে, 'বেশ মোটা বখরাই বটে।'

'যা বাকি রইল সেটা আবার তিনভাগ; তুই, আমি আর ব্রাউন। যদি ধরি এক কিলোগ্রামে পাওয়া যাবে প'চাত্তর থেকে একশ মার্ক ...'

'অত দাম কেউ দেবে না। ব্যবসার কোনো মাথা নেই তোর। দু রকমের আইভরি আছে, একটা হল নরম বা মরা আইভরি, আর একটা শক্ত বা জ্যান্ত আইভরি। প্রথমটা নামেই শুধু নরম, আসলে জিনিসটা খুবই শক্ত, শাদা, আর চিকন — বিলিয়ার্ড বল, পিয়ানোর চাবি, চিরুণি ইত্যাদিতে যা ব্যবহার করা হয়। তার জন্যে বেশ দাম মেলে। কিন্তু এখানকার হাতির দাঁত সে রকম না। তা পেতে হলে যেতে হবে পূর্ব আফ্রিকায় — তবে একটি হাতি মারার আগেই তারা সেখানে তোর শক্ত হাড়কে নরম করে ছাড়বে। এখানকার আইভরি শক্ত, জ্যান্ত, স্বচ্ছ। এ কাজে লাগে কেবল ছাতার বাঁট, ছড়ি আর শস্তা চিরুণিতে।'

'তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী?' গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল বাকালা, 'এত যে খাটলাম সব বেকার?'

'বেকার হবে কেন? কিছু মিলবে। যদি চার জনে শিকার করে আর লাভটা ভাগ করে নেয় দুজনে, তাহলে মন্দ দাঁড়াবে না ...'

'মাইরি বলছি, আমিও ভেবেছিলাম ব্যাপারটা।'

'ভাবনার ব্যাপার নয়, করবার ব্যাপার। আজ কালের মধ্যেই ব্রাউন খাড়া হয়ে উঠবে, তখন আর ওকে বাগে আনা যাবে না। হারামজাদাটার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। আর স্পেপোটা মর্কটের মতো ক্ষিপ্র। এক দফায় ওদের শেষ করে দেওয়া দরকার। ভালো হয় রাত্রিতেই। প্রথমটা মদ খাইয়ে মাতাল করে দেওয়া ভালো, বলা যায় না। তার মতো যথেষ্ট স্পিরিট এখনো আমাদের আছে।'

'কখন?'

'এসে গেছি ...'

একটা বিরাট গর্তের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে হতভাগ্য হাতিটা, ছুঁচল খুঁটিতে পেটটা ফুঁড়ে গেছে তিনদিন আগে। তখনো বেঁচে ছিল। বাকালা গুলি করে মারলে তাকে। তারপর কক্সের সঙ্গে নেমে গেল গর্তে,

দাঁত খসাবার জন্যে। সে দাঁত খসাতে সারা দিনই লেগে গেল। আমার পিঠের ওপর দাঁত চাপিয়ে যখন রওনা দিলে ওরা, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

কঙ্ক যখন তার স্থগিত আলাপ ফের শুরু করল তখন ছাউনির কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।

বললে, 'ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। আজ রাতেই শেষ করে দেওয়া যাক।'

কিন্তু হতাশ হতে হল তাদের অবাক হয়ে দেখল ব্রাউন ছাউনিতে নেই। স্পেপো বললে 'বানা' বেশ সুস্থ বোধ করছিল, তাই শিকারে গেছে, সম্ভবত রাতে ফিরবে না। বাকালা চাপা মুখ খিস্তি করলে খুনটা তাই পেছিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে যখন কঙ্ক আর বাকালা ঘুমুচ্ছে তখন ফিরল ব্রাউন। স্পেপোর কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলে। পাহারায় ছিল স্পেপো, দরাজ ঠোঁটে হাসল সে, ঝকঝক করে উঠল দাঁত। ব্রাউন তাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে এল আমার কাছে, চাপতে বললে। স্পেপোর ইঙ্গিত পেয়ে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। দুজনেই ওরা চাপল আমার পিঠে। বনের ধার বরাবর নিয়ে চললাম ওদের।

'চমৎকার একটা উপহার দেওয়া যাবে ওদের ভাবছে আমার অসুখ, আমি কিন্তু ঠিক হয়ে গেছি। চমৎকার দাঁতওয়ালা একটা মস্ত হাতিকে মেরেছি কাল রাতে, চল দাঁত খসাতে সাহায্য করবি আমায় বাকালা আর কঙ্ক একেবারে অবাক হয়ে যাবে।'

উদীয়মান সূর্যের আলোয় দেখলাম, নদীর ধারে কফি গাছের ঝোপের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে হাতির ফুলো লাসটা।

দাঁত খসাবার কাজ শেষ হলে ছাউনির দিকে রওনা দিলাম আমরা — মৃত্যুর দিকে। শিগগিরই মরতে হবে ব্রাউন আর স্পেপোকে — তার কিছু পরে আমারও ঐ একই ভাগ্য। মানুষের কাছ থেকে অবশ্য আমি সর্বদাই পালাতে পারি। আশু কোনো বিপদ এখনো আমার নেই, ইচ্ছে হচ্ছিল পারলে ব্রাউন আর স্পেপোকে বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করে দেখি। তাই পালালাম না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছিল স্পেপোর জন্যে এমন হাসিখুশি জোয়ান ছেলে, অ্যাপলোর মতো শরীর। কিন্তু কী করে হুঁশিয়ার করি ওদের। কী বিপদ যে ওদের কপালে আছে সে কথা তো আমি বলতে পারি না — কিন্তু ছাউনিতে ওদের বয়ে নিয়ে যেতে যদি আপত্তি করি?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে সোজা চললাম কঙ্গো নদীর দিকে। ভেবেছিলাম একবার নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের দেখা পেয়ে যাব, কোনো সভ্য দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারবে ব্রাউন। কিন্তু আমি যে কেন অত একগুঁয়ে হয়ে উঠেছি সেটা সে বুঝতে পারল না, ধারালো লোহার শিক দিয়ে আমার ঘাড়ে খোঁচাতে লাগল। আমার চামড়া খুবই স্পর্শাতুর, সহজে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। নদী থেকে সেই যে ইংরেজটা আমায় গুলি করেছিল, সে গুলির ক্ষত সারতে কতদিন লেগেছিল আমার তা মনে ছিল। কানে এল স্পেপো ব্রাউনকে অনুরোধ করছে আমার ঘাড়টা যেন না খোঁচায়। কিন্তু আমার অবাধ্যতায় এত ক্ষেপে উঠেছিল ব্রাউন যে কেবলি জোরে জোরে ঘা মারতে লাগল সে।

আমায় বোঝাবার জন্যে স্পেপো তার নিজের ভাষার সবচেয়ে আদুরে কথায় আমায় সান্ত্বনা দিলে কী সব বললে, তার একবিন্দু বুঝলাম না। কিন্তু সুরটা এমন যে মানুষ পশু সকলের কাছেই তা সমান বোধগম্য। সে সুরটা আমি বেশ বুঝেছিলাম। ঝুঁকে আমার গলায় চুমু খেল সে। বেচারি স্পেপো! আমায় কী করতে বলছে তা যদি সে জানত!

'মেরে ওকে খতম করে দে,' চ্যাঁচাল ব্রাউন। 'ট্রুয়েন্ট যদি মাল বওয়া নেওয়া করতে না চায় তো তার দাঁতদুটো ছাড়া কী দরকার ওকে? বড্ড লাই পেয়েছে। ট্রুয়েন্ট বটে। আগের মালিককে ছেড়ে পালিয়েছে, এখন আমাদের কাছ থেকেও পালাবার ফিকিরে আছে। সেটি হবে না। তার আগে ওর চোখ আর কানের মাঝখান দিয়ে একটি বুলেট চালিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া।'

কথাটা শুনে শিউরে উঠলাম। হাতি শিকারী ব্রাউন, হাতির পিঠ থেকে সে যদি গুলি করে তবে লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ. নিজে মরব নাকি নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে নিয়ে যাব ওদের? কানে আসছিল স্পেপো মিনতি করছে ব্রাউনের কাছে, আমায় যেন না মারে. কিন্তু ইংরেজটা নাছোড়বান্দা, কাঁধ থেকে সে ততক্ষণে রাইফেল টেনে নিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে আমি ছাউনির দিকে ফিরলাম।

ব্রাউন হেসে বললে, 'দেখছিস, হাতিটা যেন মানুষের ভাষা বুঝে ফেলেছে, টের পেয়েছে কী আমি করতে যাচ্ছিলাম।'

বাধ্যের মতো আমি কয়েক পা এগিয়ে তারপর ঝট করে ব্রাউনকে শুঁড়ে

জাপটে নিয়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। স্পেপোকে পিঠে নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলাম বনের দিকে। চ্যাঁচালে ব্রাউন, গালাগালি দিলে। আসলে বিশেষ জখম হয়নি সে, কিন্তু অসুখের ফলে তখনো সে দুর্বল, চট করে খাড়া হয়ে উঠতে পারেনি। তারই সুযোগ নিয়ে এগিয়ে ঢুকে পড়লাম বনে। ভাবলাম, 'যদি দুজনকে বাঁচাতে না পারি তাহলে অন্তত স্পেপোকে বাঁচাব।' কিন্তু স্পেপোও ছাউনির লোকেদের সঙ্গে থাকতেই ব্যগ্র। কয়েকমাস ধরে হাতি শিকারে সে যে নিজের জীবন বিপন্ন করে চলেছে, সে তো খামকা নয়। পয়সা পাওনা হয়েছে তার। স্পেপোকে আমার শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু সে কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। ভেবেছিলাম আমার উঁচু পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়বার সাহস হবে না তার। কিন্তু ছোকরাটা বাঁদরের মতো ক্ষিপ্র। অন্যরকম একটা কাণ্ড করল সে। বন ঘেঁসে আমি চলেছি, ও হঠাৎ একটা ডাল ধরে লাফিয়ে উঠে গেল একটা গাছে, একেবারে আমার নাগালের বাইরে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম... শেষপর্যন্ত গন্ধ থেকে টের পেলাম চুপি চুপি ব্রাউন এগিয়ে আসছে আমার পেছনে। গুলি করার আগেই ছুটে গেলাম জঙ্গলের ভেতরে।

ওরা তো গেল। কিন্তু ভাগ্যের কবলে ওদের ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরতি পথ ধরলাম। অন্য পাশে চলে গিয়ে ছাউনিতে পৌঁছলাম ওদের আগেই। কক্স আর বাকালা ভারি অবাক হয়ে গেল আমায় দেখে, আরোহী নেই, অথচ চমৎকার দাঁত দুটি চাপানো আছে পিঠে।

বোঝার বাঁধন খুলতে খুলতে কক্স বলল, 'ব্রাউন আর স্পেপোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় কি তাহলে হাতি আর বন্য জন্তুরাই আমাদের সাহায্য করলে?'

কিন্তু আনন্দটা টিকল না। গালাগালি দিতে দিতে শিগগিরই এসে হাজির হল ব্রাউন, তার সঙ্গে স্পেপো। আমায় দেখে ফের আর এক দফা মুখ খিস্তি শুরু করল সে। শোনাল, কী ভাবে আমি ওদের সঙ্গে বেয়াদবি করেছি। তক্ষুণি আমায় মেরে ফেলার জন্যে ওদের মত করাবার চেষ্টা করলে সে। কক্স চিরকেলের হিসেবী, সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলে। সে আর বাকালা বললে, ভারি খুশি হয়েছে তারা, ব্রাউন ভালো হয়ে উঠেছে, নিরাপদে ফিরে এসেছে ছাউনিতে, সঙ্গে আবার এমন চমৎকার এক জোড়া হাতির দাঁত।

১৪। চারটে লাস আর হাতির দাঁত

সকাল সকাল ঘুমতে গেল সবাই। এ রাতে স্পেপোর পাহারা দেবার পালা ছিল না, তাই বেহুঁশ হয়ে ঘুমল সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ব্রাউন, সেও নিঃসাড়ে ঘুমল। পাহারার পালা ছিল কক্সের, আর কম্বলের তলে এপাশ ওপাশ করছিল বাকালা, বোঝা যায় জেগে আছে। কয়েকবার মাথা তুলে সপ্রশ্ন চোখে সে চাইল কক্সের দিকে। কক্স মাথা নেড়ে বোঝাল, এখনো সময় হয়নি।

বনের ওপারে দেখা দিল কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, আবছা একটু আলো হয়ে উঠল ফাঁকা জায়গাটা। কচি ছেলের কান্নার মতো একটা করুণ চিৎকার শোনা গেল কোথায়, সম্ভবত বনের মধ্যে কোনো একটা ছোটো প্রাণী ধরা পড়েছে বুনো জন্তুর দাঁতে। চিৎকারে ব্রাউন জেগে উঠল না, বোঝা গেল অঘোরে ঘুমচ্ছে সে। কক্স মাথা নেড়ে সংকেত দিলে বাকালাকে, সর্বক্ষণই ও সতর্ক হয়েছিল, সংকেত পাওয়ামাত্র উঠে দাঁড়াল, হাত বাড়াল পেছনকার পকেটের দিকে, নিশ্চয় রিভলভারটা বার করার জন্যে। ঠিক করলাম, আমাকেও এখুনি কাজে লাগতে হবে। শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যে ভারতীয় হাতিরা যা করে, আমিও তাই করলাম: অর্থাৎ শুঁড়টা মাটিতে চেপে জোরে ফুঁ দিলাম। একটা বিদঘুটে ভয়াবহ শব্দ বেরুল — কেমন একটা ক্যাঁককেঁকে, ঘড়ঘড়ে, ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ। মরা মানুষও জেগে উঠবে তাতে আর ব্রাউন তো মরা নয়।

'কোন হারামজাদা আবার ট্রমবোন বাজাতে শুরু করেছে?' মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলে সে, ঘুমে ভরা চোখদুটো বিস্ফারিত করে। চট করে মাটিতে বসে পড়ল বাকালা।

'তোর আবার কী হল, নাচন শুরু করবি নাকি?' জিজ্ঞেস করলে ব্রাউন।

'আমি... মানে ঐ হতভাগা হাতিটা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। ভাগ বলছি!'

আমি কিন্তু ভাগলাম না। কিছুক্ষণ পরে ব্রাউন যখন ফের ঘুমিয়েছে, তখন ঐ একই কান্ড করলাম আবার। কক্স একেবারে ব্রাউনের কাছে গিয়ে পে'ৗছেছে, রিভলভার তৈরি — ঠিক সেই সময় সর্বশক্তিতে শব্দ করলাম

আমি। ব্রাউন লাফিয়ে উঠে ছুটে এল আমার দিকে, কষে একটা থাবড়া মারল আমার শুঁড়ের ডগায়। আমি চট করে শুঁড় গুটিয়ে সরে এলাম।

'হতভাগা জানোয়ারটাকে খুনই করব আমি।' চ্যাঁচাল সে, 'হাতি নয়, ও একটা পিশাচ! স্পেপো, জানোয়ারটাকে খেদিয়ে নিয়ে চল তো একটা জলায়... আর রিভলভার নিয়ে কী করছিস তুই?' হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে কক্সের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে সে।

'ভাবছিলাম গোটা দুয়েক বুলেট খাইয়ে — সরিয়ে দিই প্রুয়েণ্টকে।'

ব্রাউন ফের শুয়ে ঘুমতে লাগল। আমি কয়েক পা সরে গিয়ে ছাউনির ওপর নজর রাখলাম।

'হারামজাদা হাতি!' আমার দিকে ঘুঁসি দেখিয়ে হিসিয়ে উঠল কক্স।

'কোনো একটা বুনো জন্তুর গন্ধ পেয়েছে ও,' স্পেপো বললে। আমায় সমর্থন করার চেষ্টা করছিল সে। তার ধারণা ছিল না কী সত্যি কথাই না সে বলেছে। সত্যিই আমি হাঁক ছাড়ছিলাম কারণ জানোয়ারেরই গন্ধ পেয়েছি — নিষ্ঠুর দুপেয়ে জানোয়ার।

প্রায় সকাল হয়ে এসেছে, এমন সময় কক্স সংকেত করল বাকালাকে। দ্রুত ছুটে গেল তারা — কক্স ব্রাউনের দিকে, বাকালা স্পেপোর দিকে, গুলি চালাল একসঙ্গে। একটা করুণ, কর্ণভেদী চিৎকার করে উঠল স্পেপো, প্রথম রাতে সেই যে একটা ছোট জীব চিৎকার করে উঠেছিল বনে, তার মতো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কেঁপে উঠে ফের পড়ে গেল। খিঁচনি খেতে লাগল পাদুটো। ব্রাউন কোনো শব্দ করলে না। সমস্ত ব্যাপারটা এত পলকের মধ্যে ঘটে গেল যে শব্দ করে হতভাগ্য দুটিকে সতর্ক করে দেবার কোনো সময় পাইনি আমি... .

কিন্তু ব্রাউন তখনো মরেনি। কক্স তার ওপর ঝুঁকে আসতেই সে হঠাৎ ডান কনুইয়ে ভর দিয়ে গুলি করল। মাটিতে পড়ে গেল কক্স, ব্রাউন তার দেহের আড়াল নিয়ে গুলি করতে লাগল বাকালাকে। বাকালা চেঁচিয়ে উঠল :

'আরে শালা লালচুলো শয়তান!' একবার গুলি করেই সে পালাতে শুরু করল। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সে এক জায়গায় ঘুরতে লাগল, বুলেট গিয়ে মাথায় বিঁধলে লোকে যেমন করে। তার পর পড়ে গেল মাটিতে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব্রাউনও ধরাশায়ী হল। রক্তের একটা তীক্ষ্ম গন্ধে ভরে গেল বাতাস। সবকিছু চুপচাপ, কেবল গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে ব্রাউনের। আমি কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে পড়েছে। একটা খিঁচুনির ভঙ্গি করে ফের গুলি করল সে। আমার সামনের ডান পায়ের চামড়া ঘেঁসে ছুটে গেল বুলেটটা।

১৫। সফল চাল

আমার প্রথম সৌভাগ্য দেখা দিল যখন শেষ পর্যন্ত এসে পেঁাছলাম মাথাডিতে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, সমুদ্র আর কঙ্গো অববাহিকার মাঝখানকার গিরিশ্রেণীর পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। নদী থেকে অনতিদূরে বনের মধ্যে ছিলাম, মনের মধ্যে একরাশ ভাবনা। আফশোস হচ্ছিল গোটা পালের সঙ্গে খেদার মধ্যে কেন যাইনি। তাহলে এমন ফেরারীর মতো ঘুরে বেড়াতে হত না। সেক্ষেত্রে হয় আমার সমস্ত ভবযন্ত্রণা থেমে যেত, নয়ত একটা সৎ, চাকুরে হাতি হয়ে দিন কাটত। আমার ডান দিকে, নদীতটের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অস্তসূর্যের আলোয় লাল হয়ে জবলছে নদী, বাঁ দিকে মস্ত মস্ত রবার গাছ; গাছের ছাল কাটা কাটা। তার মানে নিশ্চয় কাছেই লোকজন থাকে।

আরো কয়েক শ মিটার এগুতেই এসে পড়লাম ম্যানিওক, জোয়ার, কলা, আনারস, আখ, তামাকের চষা ক্ষেতে। আখ আর তামাক খেতের মাঝখানের পথ ধরে আমি সাবধানে এগিয়ে এসে পেঁাছলাম একটা খোলা মাঠে, তার মাঝখানে একটি বাড়ি। বাড়ির আশেপাশে কাউকে দেখা গেল না, শুধু কিছু দূরে খেলা করছিল দুটি শিশু — একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, বছর সাত আট বয়স হবে।

মাঠে এসে যখন পেঁাছই তখন ওরা আমায় দেখেনি। আমি পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব মজাদার নানা শব্দ করে নাচ দেখাতে শুরু করি। আমায় দেখে ওরা দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে। ওরা যে পালিয়ে গেল না বা চেঁচিয়ে উঠল না, তাতে ভারি আনন্দ হল আমার; নানা রকম মজার সব খেলা দেখাতে লাগলাম — কোনো ট্রেনিং পাওয়া হাতি যা কখনো স্বপ্নেও

ভাবতে পারে না। খুশির উচ্ছ্বাসে ছেলেটাই প্রথমে হেসে উঠল খিলখিল করে, আর হাততালি দিতে লাগল মেয়েটা। আমি নেচে কুঁদে চললাম, কখনো সামনের দু'পায়ে দাঁড়াই, কখনো পেছনের দু'পায়ে, কখনো ডিগবাজি খাই।

সাহস পেয়ে ওরা আরো কাছে সরে এল আমার, শেষ পর্যন্ত শুঁড়টা বাড়িয়ে ছেলেটিকে ডাক দিলাম দোলার জন্যে। কিছুটা ইতস্তত করে ছেলেটা বসলে আমার বাঁকানো শুঁড়ের ওপর, দোল খেতে লাগল। খুকিটিকেও দোল খাওয়ালাম একটু। সত্যি বলতে কি, এই নিশ্চিন্ত শ্বেতকায় খোকাখুকির সাহচর্যে এত আনন্দ হয়েছিল যে একেবারে তন্ময় হয়ে খেলতে লাগলাম ওদের সঙ্গে। লক্ষ্যই করিনি কখন এসে দাঁড়িয়েছে একটা লম্বাটে রোগা লোক। গায়ের চামড়া হলদেটে, কোটরে ঢোকা চোখ। বোঝা যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জ্বর থেকে সম্প্রতি উঠেছে। ভয়ানক অবাক ও হতভম্ব হয়ে সে দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি, 'বাবা, বাবা, দেখো কেমন একটা হেটি টেটি পেয়েছি আমরা।'

'হেটি টেটি!' ভাঙা গলায় পুনরাবৃত্তি করলে লোকটা। দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে। বুঝে পাচ্ছিল না কী করবে। আমি সবিনয়ে অভিবাদন করলাম তাকে, হাঁটু গেড়েও বসলাম। লোকটা আমার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে হাসল।

'জিতে গেলাম, জিতে গেছি তাহলে,' উল্লসিত হয়ে উঠলাম আমি...

* * *

হাতির কাহিনী এখানেই শেষ। সত্যি বলতে কি, এখানেই সে কাহিনীর শেষ হওয়া উচিত, কেননা পরে তার কী হল সেটা খুব কৌতূহলের ব্যাপার নয়। যাই হোক, ভাগনার, দেনিসভ আর হাতি ভালোই সফর করে সুইজারল্যাণ্ডে। টুরিস্টদের অবাক করে ভেভের উপকণ্ঠে ঘুরে বেড়াল হাতিটা, আগে রিঙ এই এলাকাটা খুব পছন্দ করত। মাঝে মাঝে সে স্নান করেছে লাক দে জেনেভ হ্রদে, কিন্তু সে বছর দুর্ভাগ্যবশত শীত এসে পড়ল

একটু তাড়াতাড়ি, তাই বিশেষ এক মালগাড়িতে করে বার্লিনে ফিরে আসে আমাদের টুরিস্টরা।

বুশ সার্কাসে এখনো খেলা দেখাচ্ছে হৈটি টৈটি, সদুপায়ে উপার্জন করছে তার দৈনন্দিন তিনশ পঁইষট্টি কিলোগ্রাম পথ্য এবং শুধু বার্লিনবাসীদের নয়, অবাক করে দিচ্ছে অনেক বিদেশীদেরও, যারা এই 'হস্তি-প্রতিভাকে' দেখার জন্য বিশেষ করে সফরে আসে বার্লিনে। এই প্রতিভা নিয়ে এখনো তর্ক করে চলেছে বৈজ্ঞানিকেরা। কেউ বলছে এ সবই একটা বুজরুকি, কেউ বলছে কনডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেকস, কেউ বলছে এসবই একটা গণ হিপনোটিজম।

ভারি অমায়িক আর ভদ্র হয়ে উঠেছে যুঙ্গ, ভারি যত্ন করে হাতির। আসলে ভেতরে ভেতরে সে ভয় পায় হৈটি টৈটিকে, ভাবে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ভুতুড়ে কিছু না থেকে পারে না। আপনারাই বলুন: রোজ খবরের কাগজ পড়া চাই হাতির; একদিন তো সে যুঙ্গের পকেট থেকে এক প্যাকেট তাসই মেরে দেয়। তারপর কী হল জানেন? একদিন হাতির কাছে হঠাৎ এসে যুঙ্গ দেখে একটা পিপে উলটিয়ে তার ওপর একমনে তাস বিছিয়ে পেশেন্স খেলছে হাতি। ব্যাপারটা যুঙ্গ অবশ্য কাউকে বলেনি — কী দরকার, লোকে ভাববে যুঙ্গটা মিথ্যেবাদী।

* * *

আকিম ইভানভিচ দোনিসভের মালমসলা থেকে লেখা। পাণ্ডুলিপি পড়ে ই. স. ভাগনার এই মন্তব্যটি জুড়ে দেন:

'এ সবই সত্যি ঘটেছিল। অনুরোধ করি, লেখাটা যেন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা না হয়। অন্তত রিঙের আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে রিঙের গুপ্ত রহস্য গোপন রাখা উচিত।'

আনাতলি দ্নেপ্রভ

ম্যাকসওয়েল সমীকরণ

ব্যাপারটার সূচনা এক শনিবারের সন্ধ্যায়। আমার গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্থানীয় সান্ধ্য পত্রিকাটায় চোখ বুলাতে গিয়ে শেষ পাতায় এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল:

> ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানি
> হিসাব, বিশ্লেষণ ও সর্ববিধ পরিগণক কাজের জন্য
> ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে
> অর্ডার গ্রহণ করে।
> উচ্চ শ্রেণীর গ্যারান্টি যুক্ত কাজ। আবেদন করুন
> ১২ ভেলতম্প্লাস্‌সে।

ঠিক এইটেই আমার দরকার। একটা বিশেষ গঠনের বিষম মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের আচরণ সংক্রান্ত ম্যাকসওয়েল সমীকরণ নিয়ে আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি স্থূলায়ন ও সরলীকরণ মারফত হিসাবটাকে এমন একটা আকারে দাঁড় করানো গেল যা একটা বৈদ্যুতিক কম্পিউটারে কষা যায়। ভাবছিলাম রাজধানীতে গিয়ে হিসেবটা কষে দেবার জন্যে কম্পিউটার কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের কাছে কাকুতি মিনতি করতে হবে। হাতে পায়ে ধরারই ব্যাপার কেননা কম্পিউটার কেন্দ্র সামরিক সমস্যা নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত, মফঃস্বল শহরের এক পদার্থবিদ রেডিও-তরঙ্গের

গতি নিয়ে যে সব তাত্ত্বিক অনুশীলন করছে, তার দিকে কেউ নজরই দেবে না।

অথচ আমাদের এই ছোটো শহরটার মধ্যেই দেখছি একটা কম্পিউটার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, অর্ডারের জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে স্থানীয় কাগজে!

এ কোম্পানির সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্যে টেলিফোন তুলে নিলাম। তখন খেয়াল হল বিজ্ঞাপনটায় ঠিকানা দেওয়া আছে, কিন্তু কোনো টেলিফোন নম্বর দেয়নি। গুরুগম্ভীর কম্পিউটার কেন্দ্র অথচ টেলিফোন নেই! এ হতে পারে না। কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে ফোন করলাম।

সেক্রেটারি জবাব দিলেন, 'মাপ করবেন, বিজ্ঞাপনের জন্য ঐটুকুই আমরা পেয়েছিলাম। কোনো টেলিফোন নম্বর দেওয়া ছিল না।'

টেলিফোন ডাইরেক্টরিতেও ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির নাম নেই।

অধীর হয়ে সোমবারের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। জটিল পদার্থিক প্রক্রিয়া নিহিত রয়েছে এই যে সমীকরণগুলোর মধ্যে, তা থেকে চোখ ফেরালেই মনে হচ্ছিল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির কথা। 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে বটে। আমাদের এ কালে প্রতিটি ভাবনাকেই যখন এক একটা গাণিতিক রূপ নিতে হচ্ছে, তখন এর চেয়ে লাভজনক কারবার কল্পনা করা কঠিন।'

কিন্তু কে এই ক্রাফৎশ্‌তুদৎ? এ শহরে আমি অনেক দিন আছি কিন্তু এ নাম প্রায় অজানা। অথচ কেমন যেন মনে হয় কবে যেন এরকম নাম শুনেছি। কিন্তু কবে, কোথায়, কী উপলক্ষে কিছুই মনে পড়ল না।

অবশেষে সোমবার এল। সমীকরণের কাগজপত্র পকেটে পুরে আমি বেরুলাম ১২ নং ভেল্লতস্ত্রাস্‌সের সন্ধানে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ট্যাক্সি নিতে হল।

'বেশ দূরে আছে,' ড্রাইভার বললে, 'নদী পেরিয়ে, মানসিক হাসপাতালের পাশে।'

আমি চুপ করে মাথা নাড়লাম।

যেতে লাগল প্রায় চল্লিশ মিনিট। শহরের ফটক পেরিয়ে নদীর ওপরকার ব্রিজ দিয়ে একটা হ্রদের পাশ দিয়ে পৌঁছলাম ফাঁকা মাঠের এলাকায়। কোথাও কোথাও নব বসন্তের সবুজ দেখা দিয়েছে। রাস্তাটা বাঁধানো নয়, প্রায়ই ঢিপির মধ্যে থামতে হচ্ছিল গাড়িকে, কাদায় পিছলে যাচ্ছিল পেছনের চাকা।

শেষ পর্যন্ত ঘর বাড়ির চালা দেখা গেল, তারপর একটু নিচুতে মানসিক হাসপাতালের লাল ইঁটের দেয়াল। হাসপাতালটাকে লোকে ঠাট্টা করে বলে 'জ্ঞানীগৃহ'।

লম্বা ইঁটের দেয়ালের ওপর ভাঙা কাঁচ গাঁথা। তারই গা বরাবর একটা খোয়া ঢালা রাস্তা। কয়েকবার মোড় নিয়ে গাড়ি থামল একটা অনতিবৃহৎ দরজার সামনে।

'এইটে বারো নম্বর।'

অপ্রীতিকর বিস্ময়েই লক্ষ্য করলাম ক্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানির অবস্থানটা জ্ঞানীগৃহেরই একাংশে। '"সর্ববিধ গাণিতিক কাজের" জন্যে ক্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানি পাগলাদের লাগায়নি তো?' ভেবে হাসি পেল।

দরজার বেল টিপলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, মিনিট পাঁচেক! পরে দরজা খুলে দেখা দিল ফ্যাকাশে মতো একটা লোক, মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল, দিনের আলোয় চোখ মিট মিট করছিল।

আমার দিকে চেয়ে বললে, 'কী চাই বলুন?'

'এইটাই ক্রাফৎশ্তুদৎ-এর গণনা কোম্পানি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন...'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের কাছে আমার একটা অর্ডার দিতে চাই।'

'বেশ তো, আসুন ভেতরে।'

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে আমি মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ হতেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে পড়ে গেলাম।

'আমার পেছন পেছন আসুন। হুঁশিয়ার — এইখানে সিঁড়ি। এবার বাঁয়ে। ফের সিঁড়ি। এবার চলুন ওপরে...'

আমার পথপ্রদর্শক আমার হাত ধরে অন্ধকার বারান্দা বেয়ে কখনো নেমে, কখনো সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিয়ে চলল আমাকে।

অবশেষে একটা আবছা হলদেটে আলো দেখা গেল মাথার ওপর। একটা খাড়াই পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পেঁছিলাম একটা ছোটো হলে।

যুবকটি তাড়াতাড়ি পার্টিশনের ওদিকে গিয়ে টিকিট ঘরের মতো একটা চওড়া জানলার ঢাকা খুলে বললে

'বলুন ...'

কেমন মনে হচ্ছিল ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। এই আধো অন্ধকার, এই মাটির তলার গোলকধাঁধা, শেষ পর্যন্ত জানলাহীন এই গহনকক্ষ, সিলিঙে একটা মিটমিটে বিদ্যুতের আলো - এর ফলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার।

হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে।

'বলুন কী বলছিলেন,' জানলা দিয়ে মাথা বার করে বললে লোকটা।

'ও হ্যাঁ, মানে, ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির পরিগণক কেন্দ্র তাহলে এখানেই?'

'হ্যাঁ এখানেই,' একটু বিরক্ত হয়েই বললে লোকটা, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি। আপনার অর্ডারটা কী?'

পকেট থেকে সমীকরণের কাগজটা বার করে জানলা দিয়ে এগিয়ে দিলাম।

'এটা হচ্ছে ঐ সমীকরণগুলোর আংশিক ডেরিভেটিভের একটা রৈখিক মূল্যায়ন...' অনিশ্চিতভাবে শুরু করলাম আমি, 'অন্তত সংখ্যাগত ভাবে তার সমাধান হলেও চলবে, মানে দুই মাধ্যমের ঠিক সীমারেখাটায়... বুঝতে পারছেন তো? এটা একটা ডিসপার্সন সমীকরণ, রেডিও তরঙ্গের বিস্তারের গতিবেগ এখানে প্রতি বিন্দুতে বদলে যাচ্ছে।'

কাগজটা আমার হাত থেকে ঝট করে টেনে নিয়ে লোকটা বললে:

'বুঝতে পেয়েছি। কবে চাই?'

'কবে মানে?' অবাক লাগল আমার, 'সেটা আপনারা আমায় বলবেন কবে পারবেন।'

'কাল হলে চলবে?' গভীর কালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে সে।

'কাল?'

'হ্যাঁ কাল, ধরুন বেলা বারোটা নাগাদ ...'

'সে কী! এ কী ধরনের পরিগণক যন্ত্র আপনাদের? আশ্চর্য স্পীড!'

'তাহলে কাল বেলা বারোটায় আপনার সমাধান পাবেন। চার্জ চারশ মার্ক। নগদ।'

একটি কথা না বলে আমি আমার ভিজিটিং কার্ডের সঙ্গে টাকাটা এগিয়ে দিলাম। কার্ডে আমার নাম ঠিকানা লেখা ছিল।

ভূগর্ভের গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে আমায় এগিয়ে দিতে দিতে লোকটা বললে:

'তার মানে আপনিই প্রফেসর রাউখ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'এমনি। আমরা জানতাম আজ হোক কাল হোক আপনি আমাদের কাছে আসবেন।'

'কেমন করে জানতেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তাছাড়া আর কেই বা আমাদের এখানে অর্ডার দিতে আসবে এই পাণ্ডববর্জিত শহরে।'

জবাবটা বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হল।

বিদায় জানাতে না জানাতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'জ্ঞানীগৃহের' পাশাপাশি এ রকম একটা অদ্ভুত পরিগণক কেন্দ্র! সারা রাস্তা সেই কথাই ভাবলাম। কিন্তু ক্রাফৎশ্‌তুদৎ — কবে কোথায় শুনেছিলাম এ নামটা?

২

পরের দিন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম দিনের ডাকের জন্যে। সাড়ে এগারোটায় ঘণ্টা বাজতেই লাফিয়ে উঠে ছুটে এগিয়ে গেলাম পিয়নের প্রত্যাশায়। তার বদলে অবাক হয়ে দেখলাম একটি ফ্যাকাশে রোগা মেয়েকে, হাতে তার একটা মস্ত নীল খাম।

'আপনিই কি প্রফেসর রাউখ?' জিজ্ঞেস করলে সে।

'হ্যাঁ, আমিই।'

'ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানি আপনাকে এই প্যাকেটটা পাঠিয়েছে। সই করে দিন।'

যে পিয়ন খাতাটা সে এগিয়ে ধরল, তার প্রথম পাতায় কেবল একটি নাম — সেটা আমার। সই করে একটা বখশিস দিতে গেলাম।

লাল হয়ে উঠে সে বলে উঠল, 'না, না,' তারপর অস্ফুট স্বরে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

ঘেঁসাঘেঁসি করে লেখা পাণ্ডুলিপির ফটোকপিগুলো দেখে হতভম্ব লাগল। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার থেকে অন্য জিনিস আশা করেছিলাম আমি: লম্বা সারিভরা সংখ্যা — তার এক সারিতে আর্গুমেন্টের ভ্যাল্যু, অন্য সারিতে সমাধানের ভ্যাল্যু।

তার বদলে যেটা পেলাম সেটা আমার সমীকরণগুলোর একেবারে সঠিক ও নিখুঁত সমাধান!

পাতার পর পাতায় যে হিসেব করা হয়েছে তার মৌলিকতা ও চমৎকারিত্বে আমার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এ সমাধান যে কষেছে তার অঙ্কের জ্ঞান অসাধারণ — সর্বাগ্রগণ্য গাণিতিকরাও হিংসে করতে পারেন। গণিতের প্রায় সমস্ত সাম্প্রতিক তত্ত্বই কাজে লাগানো হয়েছে: রৈখিক ও অরৈখিক অন্তরকলন ও সমাকলনের তত্ত্ব, জটিল পরিবর্তী বিদ্যুতের ফাংকশন তত্ত্ব, গ্রুপ ও বহুলতার তত্ত্ব, এমন কি টপলজি, রাশিতত্ত্ব, গাণিতিক যুক্তি ইত্যাদি বাহ্যত অপ্রাসঙ্গিক বিদ্যার প্রয়োগও বাদ যায়নি।

হিসাবের শেষে অসংখ্য উপপাদ্য, অন্তর্বর্তী হিসাব, সূত্র ও সমীকরণের সংশ্লেষ করে যে চূড়ান্ত সমাধানটি দেওয়া হয়েছে তা দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। সে সমাধান হল পুরো তিন লাইন জুড়ে একটি গাণিতিক সূত্র।

কিন্তু সবচেয়ে অপূর্ব, অজানা এই গাণিতিক দীর্ঘ সূত্রটিকে সহজতর সূত্রে রূপান্তরিত করার কষ্টও স্বীকার করেছেন। এমন একটা সংক্ষিপ্ত ও নিখুঁত রূপের সন্নিকটে তাকে পরিবর্তিত করেছেন, যাতে কেবল প্রাথমিক বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

সব শেষে একটা অনতিবৃহৎ গ্রাফ কাগজের ওপর সমাধানের লৈখিক চিত্রও দেওয়া আছে।

একেবারে আশাতীত ব্যাপার। যে সমীকরণটা চূড়ান্ত রূপে কখনো সামাধান করা যাবে না বলে ভেবেছিলাম, তার সমাধান করা হয়েছে।

আমার প্রাথমিক বিস্ময় ও অভিভূতি কিছুটা কাটলে ফের ফটোকপিগুলো দেখতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, যে অংকটা কষেছে তার হাতের লেখাটা খুব তাড়াতাড়ি আর ঘেঁসাঘেঁসি — যেন কাগজের প্রতিটি টুকরো, সময়ের প্রতিটি সেকেন্ড সে বাঁচাতে চায়। সব মিলিয়ে সে লিখেছে আটাশ পাতা — এটা যে কী বিপুল পরিশ্রমের কাজ সেটা কল্পনা করলাম মনে মনে। একদিনে ঘেঁসাঘেঁসি করে লেখা আটাশ পাতার একটা চিঠি লেখার কথা একবার কল্পনা করে দেখুন। তাও নয় — কিছু না ভেবেচিন্তে একটা বই থেকে নকল করুন তো আটাশ পাতা। দেখবেন কী ভুতুড়ে মেহনত।

অথচ আমার সামনে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিও নয়, বই থেকে নকল করা একটা উপন্যাসও নয়। এ হল অতি জটিল একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান — এবং তা করা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায়!

ঘেঁসাঘেঁসি লেখা পাতাগুলো চোখ বড়ো বড়ো করে খুঁটিয়ে দেখলাম কয়েক ঘণ্টা ধরে। কেবলি বিস্ময় বাড়তে লাগল আমার।

এমন এক গাণিতিককে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ পেলে কোথা থেকে? কোন সর্তে সে কাজ করে? কে সে লোক? অজানা একজন প্রতিভা? নাকি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের সীমারেখায় যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, মানব প্রকৃতির তেমন এক বিস্ময়? 'জ্ঞানীগৃহ' থেকে কোনো একটা অদ্বিতীয় মস্তিষ্ক খুঁজে বার করেছে কি ক্রাফৎশ্‌তুদৎ?

চমৎকার গাণিতিক শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছেন উন্মাদ হাসপাতালে এরকম ঘটনা তো কম নেই। আমাদের এই গণিতজ্ঞটিও হয়ত তাদেরই একজন?

সারা দিন এই প্রশ্নগুলোই আমায় অস্থির করতে লাগল।

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার: অংকটা যন্ত্রে কষা হয়নি, অংক কষেছে মানুষ, গণিতের এক যাদুকর, যার কথা পৃথিবী এখনো জানে না।

পরের দিন একটু শান্ত হয়ে আমি পুরো সমাধানটা আর একবার পড়ে দেখলাম — এবার পড়লাম কেবল পড়ার আনন্দেই, লোকে যেমন ভালো সঙ্গীতটা বার বার শুনতে চায়। সমাধানটা এত সঠিক, এত নিখুঁত, এত চমৎকার স্বচ্ছ যে ঠিক করলাম... আর একবার পরীক্ষা করে দেখব। সমাধানের জন্যে আরো একটা সমস্যা দেব ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানিকে।

তার কোনো অসুবিধা ছিল না। এমন সমস্যার কমতি ছিল না আমার। এমন একটা সমীকরণ বাছলাম যা চূড়ান্তরূপে সমাধান করা তো দূরের কথা, কম্পিউটার যন্ত্রে ফেলবার মতো আকারে ভেঙে নেওয়াও সম্ভব বলে ভাবিনি।

এটাও রেডিও তরঙ্গের বিস্তার নিয়ে, কিন্তু খুবই জটিল ও বিশেষ ধরনের একটা পরিস্থিতিতে। এটা সেই ধরনের একটা সমীকরণ যা তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা নেহাৎ মাথা থেকে বার করেন ও অচিরেই তা ভুলে যান, কারণ অতি জটিল বলে তা কারো কাজে লাগবে না।

দিনের আলোয় চোখ মিটমিট করা সেই যুবকটির সঙ্গেই দেখা হল। একটা অনিচ্ছুক হাসি দেখা গেল তার মুখে।

বললাম, 'আর একটা সমস্যা এনেছি আমি...'

সংক্ষেপে মাথা নেড়ে সে আমায় ফের সেই অন্ধকার বারান্দার গলি-ঘুঁজি দিয়ে নিয়ে এল সদর ঘরে।

পদ্ধতিটা এবার আমার জানা ছিল। তাই জানলার কাছে গিয়ে অঙ্কটা এগিয়ে দিলাম।

'এ সব কাজ তাহলে এখানে যন্ত্র দিয়ে করা হয় না?'

'দেখতেই পাচ্ছেন,' আমার সমীকরণটা থেকে চোখ না তুলেই সে বললে।

'আমার প্রথম সমীকরণটা যে কষেছে সে খুবই গুণী গণিতজ্ঞ,' আমি বললাম।

কোনো জবাব দিল না লোকটা, আমার সমীকরণটায় মগ্ন হয়ে ছিল সে।

'কেবল কি ঐ একজন লোকই আপনাদের আছে, নাকি একাধিক?'

'আপনার যা দরকার তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কী? কোম্পানি গ্যারান্টি দিচ্ছে যে...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, ঘরের গভীর নীরবতা ছিঁড়ে গেল একটা অমানুষিক আর্তনাদে। চমকে উঠে কান পাতলাম আমি। শব্দটা আসছিল কাচের পার্টিশনের ওপাশের দেয়ালের ভেতর থেকে। মনে হচ্ছিল যেন কারো ওপর অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন চলছে। আমার অঙ্কটার কাগজপত্র মুঠো করে লোকটা চকিতে একবার পাশে চেয়ে আমায় টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে যাবার দরজায়।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'ওটা কী ব্যাপার?'

জবাব না দিয়ে সে বললে, 'উত্তরটা পাবেন পরশু, বারোটায়। টাকাটা দিয়ে দেবেন বেয়ারাকে।'

এই বলে ট্যাক্সির কাছে আমায় ফেলে রেখে সে চলে গেল।

■

বলা বাহুল্য এ ঘটনাটার পর আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছিলাম না সেই ভয়ঙ্কর চিৎকারটা — ক্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানির পাথুরে দেয়ালটা যেন কেঁপে উঠেছিল তাতে। তাছাড়া একটা লোক একদিনের মধ্যেই অমন জটিল একটা অঙ্ক কষে দিল তার ধাক্কাও সামলে উঠতে পারিনি। দ্বিতীয় অঙ্কটার সমাধানের জন্যে উত্তেজিত অপেক্ষায় রইলাম। এটাও যদি কষে দেয়, তাহলে ...

দুই দিন পর ক্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানির মেয়েটির কাছ থেকে কম্পিত হাতে প্যাকেটটা নিলাম তার আয়তন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অতি জটিল ঐ গাণিতিক সমস্যাটার সমাধানই আছে তাতে। সভয়ে তাকালাম আমার সামনে দণ্ডায়মান ক্ষীণ প্রাণীটির দিকে। হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

'ভেতরে আসুন, আমি টাকাটা এনে দিচ্ছি।'

'না, না, ঠিক আছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।' যেন ভয় পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল মেয়েটা।

'ভেতরে আসুন, বাইরে ঠাণ্ডায় জমে লাভ কী?' বলে তাকে প্রায় টেনে ভেতরে ঢোকালাম, 'টাকা দেবার আগে অঙ্কটা একবার দেখে নিতে হবে।'

মেয়েটা দরজায় পিঠ দিয়ে বড়ো বড়ো চোখে লক্ষ্য করতে লাগল আমায়।

'আমাদেব বারণ আছে' ফিসফিসিয়ে বললে সে

'কী বারণ?'

'খরিদ্দারদের বাড়ির ভেতর যাওয়া এই নির্দেশ।'

'রেখে দিন নির্দেশ। এ বাড়ির কর্তা আমি, কেউ জানবে না যে আপনি এখানে এসেছিলেন।'

'না, না, ওরা সব জানতে পারবে... আর তখন...'

'কী হবে তখন?' জিজ্ঞেস করলাম ওর কাছে এসে।

'ও সে ভয়ংকর ব্যাপার...'

হঠাৎ মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে উঠল সে।

আমি ওর কাঁধে হাত দিলাম, কিন্তু শিউরে উঠে সে পিছিয়ে গেল।

'সাত শ মার্ক দিয়ে দিন, আমি চলি।'

টাকাটা এগিয়ে দিলাম। সে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

প্যাকেটটা খুলে প্রায় বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠতে হল। ফোটো কপিগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম কয়েকমিনিট, নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। অন্য লোকের হাতের লেখা।

আর একজন গাণিতিক প্রতিভা! প্রথমটির চেয়ে এর কৃতিত্ব বেশি। তিপ্পান্ন পাতা জুড়ে বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সে যে সমীকরণগুলোর সমাধান করেছে সেগুলো প্রথমবারকার অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। সমাকলন চিহ্ন, সমাহার চিহ্ন, পরিবর্তন চিহ্ন প্রভৃতি উচ্চতম গণিতের নানা সংকেত-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল যেন এক আশ্চর্য গণিত জগতে গিয়ে পড়েছি যেখানে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়।

দুই সংখ্যার রাশি নিয়ে যোগ বিয়োগ করা যেমন সহজ, এ গণিতজ্ঞও যেন ঠিক তেমনি সহজে আমার অঙ্কটা কষে দিয়েছেন।

পাণ্ডুলিপিটা কয়েকবার রেখে গণিতের কোষ পুস্তকের পাতা উল্টিয়ে মিলিয়ে দেখতে হল। অতি জটিল সব উপপাদ্য ও প্রমাণ সে প্রয়োগ করেছে এমন নৈপুণ্যে যে অবাক হতে হয়। গাণিতিক যুক্তি ও সমাধান পদ্ধতিতে এতটুকু খুঁত নেই। নিউটন, লেইবনিৎস, গাউস, এইলার, লোবাচেভস্কি, ভেইয়েরস্ট্রাস, হিলবার্ট প্রভৃতি সর্বজাতি ও সর্বযুগের সেরা গণিতজ্ঞরাও যদি দেখতেন কী ভাবে সমাধান করা হয়েছে অঙ্কটার, তাহলে তাঁরাও আমার চেয়ে কম অবাক হতেন না।

অঙ্কটা অনুধাবন করার পর ভাবতে বসলাম।

এই গণিতজ্ঞদের কোথা থেকে জোগাড় করল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ। সংখ্যায় এরা যে কেবল দু তিন জন না, গোটা একটা টিম, সে বিষয়ে এখন আর আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। শুধু দু তিন জন গণিতজ্ঞ নিয়ে তো আর একটা গোটা কম্পিউটার ফার্ম চালানো যায় না। কিন্তু এত লোক সে পেল কেমন করে? ফার্মটা আবার এর পাগলা গারদের পাশেই বা কেন? দেয়ালের ওপাশে ওই অমানুষিক চিৎকারটা কার? কেনই বা চিৎকার করছিল সে?

ক্রাফৎশ্‌তুদৎ, ক্রাফৎশ্‌তুদৎ! নামটা কেবলি গুঞ্জন করতে লাগল মাথার মধ্যে। কোথায় এবং কবে শুনেছি এ নামটা? কী আছে এ নামের পেছনে? মাথায় হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম আমি। স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।

তারপর ফের বসলাম, প্রতিভাদীপ্ত অংকটা নিয়ে পড়তে লাগলাম আনন্দে মগ্ন হয়ে, এক একটা অংশ ধরে, অন্তর্বর্তী উপপাদ্য ও সূত্রের প্রমাণে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। তারপর লাফিয়ে উঠলাম হঠাৎ। ফের মনে পড়ে গেল ঐ অমানুষিক আর্তনাদটার কথা, সেই সঙ্গে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ নামটা।

এ অনুসঙ্গ অকারণ নয়। ঠিক এই-ই হবার কথা। নির্যাতিত একটা লোকের আর্তনাদ এবং ক্রাফৎশ্‌তুদৎ — এই দুইই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রাৎসের এক নাজি কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে জেরা করার কাজ চালাত এক ক্রাফৎশ্‌তুদৎ। খুন জখম ও অমানুষিক নিপীড়নের জন্যে ন্যুরেনবার্গ বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এরপর তার কথা আর শোনা যায়নি।

মনে পড়ল তার ছবিটা — সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এস এস ওবের-ষ্টুর্মফুয়েরার পোষাক পরা, চোখে পাঁশনে, একটা মোটা সোটা ভালোমানুষ মুখে বড়ো বড়ো এমন কি বিস্মিত চোখ। যে মানুষের এমন মুখ সে অমন জল্লাদ হতে পারে এ কথায় বিশ্বাস হচ্ছিল না। অথচ বিশদ সাক্ষ্য ও পরিপূর্ণ তদন্ত থেকে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

বিচারের পর কী হল তার? অন্যান্য অনেক জল্লাদের মতো তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি তো?

কিন্তু তার সঙ্গে গণিতের কী সংস্পর্শ? একজন নিপীড়ক পুলিসকর্তার সঙ্গে অন্তরকলন ও সমাকলনের এই প্রতিভাদীপ্ত সমাধানের যোগ কোথায়?

আমার যুক্তির সূত্র এইখানে ছিঁড়ে গেল। এ দুটো জিনিসকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। স্পষ্টতই একটা লুপ্ত সূত্র আছে কোথাও কোনো একটা রহস্য।

এ নিয়ে বহু মাথা খুঁড়েও কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না তারপর আবার ঐ মেয়েটা। বললে, 'ওরা জানতে পারবে...' কী ভয়ই না সে পায়!

দিন কয়েক পীড়িত অনুমানের পর বুঝলাম, এ রহস্য ভেদ না করতে পারলে সম্ভবত আমি নিজেই পাগল হয়ে যেতে পারি।

ঠিক করলাম আগে দেখতে হবে এই ক্রাফৎশ্‌তুদৎ সেই যুদ্ধ অপরাধী কিনা।

৪

তৃতীয় বার ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির সেই নিচু দরজাটার কাছে পেঁছে কেমন যেন মনে হল এবার এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে যাতে আমার গোটা জীবন বদলে যাবে। কেন যে এটা করলাম সেটা তখনো বুঝিনি, পরেও ভেবে উঠতে পারিনি — ড্রাইভারকে পয়সা মিটিয়ে বেল টিপলাম গাড়িটা মোড়ে অদৃশ্য হবার পর।

মনে হল যেন সেই তোবড়ানো, প্রায় বুড়োটে মুখওয়ালা যুবকটি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কোনো কথা না বলে সে আমার হাত ধরে তলকুঠরির গলি-ঘুঁজি বেয়ে নিয়ে এল সেই অভ্যর্থনা কক্ষে যেখানে ইতিমধ্যেই দুবার আমি হাজিরা দিয়েছি।

'তা এবার আপনার আগমন কীসের জন্যে?' উপহাসের সুরে জিজ্ঞেস করলে সে।

'হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে চাই।'

'আমাদের ফার্মের কাজে কি আপনি সন্তুষ্ট হননি প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' লোকটার বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটো তখন বিদ্বেষে ও উপহাসে জ্বলছিল। সেদিকে তাকাবার চেষ্টা না করে জেদ করলাম আমি।

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে,' বহুক্ষণ আমায় খুঁটিয়ে দেখে সে বললে, 'এইখানে অপেক্ষা করুন একটু।'

এই বলে সে কাচের পার্টিশনের পেছনকার একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল। আধঘণ্টা কেটে গেল।

প্রায় ঢুলছিলাম আমি, এমন সময় একটা খসখস শব্দ শোনা গেল কোণে, আধা অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা শাদা আলখাল্লা পরা মূর্তি, হাতে একটা স্টেথোস্কোপ। 'একজন ডাক্তার,' মনের মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল, 'আমায় পরীক্ষা করতে চায়? ক্রাফৎশ্তুদৎ মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে হলে কি তা অপরিহার্য?'

'আমার সঙ্গে আসুন,' কর্তৃত্বের সুরে বললে ডাক্তার। আমিও তার পেছন পেছন চললাম, ভেবে পাচ্ছিলাম না কী হবে, কেনই বা এর মধ্যে এসে জড়ালাম।

একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, ওপরের কোথা থেকে যেন দিনের আলো এসে পড়ছিল। বারান্দার শেষে একটা উঁচু, জগদ্দল দুয়োর। ডাক্তার থামল সেখানে।

'এখানে একটু অপেক্ষা করুন। ক্রাফৎশ্তুদৎ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

মিনিট পাঁচেক পরে দরজাটা হাট করে খুললে ডাক্তার।

'চলুন তাহলে।' ও বললে যে সুরে তাতে যেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে একটু খেদই ঝরে পড়ল।

আমি বাধ্যের মতো চললাম তার সঙ্গে। পৌঁছলাম একটা মণ্ডপের মতো জায়গায়, তার চারিদিকে বড়ো বড়ো জানলা। অজ্ঞাতেই চোখ বন্ধ করতে হল।

আমার ঘোর ভাঙল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে।

'এই দিকে আসুন প্রফেসর রাউথ।'

ডান দিকে ফিরে দেখলাম একটা বেতের নিচু আরাম কেদারায় বসে আছে ক্রাফৎশ্তুদৎ। এ সেই লোক, খবরের কাগজ থেকে যার চেহারাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন আপনি?' কোনো রকম সৌজন্য না দেখিয়ে আসন থেকেও না উঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'তার মানে পেশা বদলেছেন, তাহলে?' স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম আমি। এ পনের বছরে বুড়িয়ে এসেছে সে, গোল ভাঁজ পড়েছে মুখের চামড়ায়।

'কী বলতে চাইছেন প্রফেসর?' মন দিয়ে আমায় লক্ষ করে বলল সে।

'আমি ভেবেছিলাম, মানে আশা করেছিলাম যে আপনি এখনো...'

'ওহ্, এই ব্যাপার!'

হো হো করে হেসে উঠল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ।

'কাল বদলেছে রাউথ, দিন বদলেছে। যা হোক, আমার আগ্রহ আপনার আশা নিয়ে তত নয়, কী উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এলেন সেইটে নিয়ে।'

'হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি গণিতের একটু চর্চা করি মানে আধুনিক গণিতের। প্রথমে ভেবেছিলাম ইলেকট্রনিক যন্ত্র নিয়ে একটা সাধারণ কম্পিউটিং কেন্দ্র গড়েছেন আপনি। কিন্তু এখন দুই দৃষ্টান্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ব্যাপার তা নয়। আপনার এ কেন্দ্রে অঙ্ক কষে মানুষে এবং কষে একেবারে প্রতিভাধর ব্যক্তির মতো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য — অতি অস্বাভাবিক অমানুষিক দ্রুততায়। বলতে কি, আমি এসেছি আপনার গণিতজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করতে, অসাধারণ ব্যক্তি এঁরা।'

ক্রাফৎশ্‌তুদতের মুখে প্রথমে একটু হাসি ফুটল, তারপর ক্রমশ সেটা পরিণত হল অট্টহাস্যে।

'এতে হাসির কী হল হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ?' বিরক্ত লাগল আমার, 'আমার এ ইচ্ছেটা কি ভারি নির্বোধ ও হাস্যকর? কিন্তু যে সমস্যার সমাধান আমি পেয়েছি তা দেখে গণিতভক্ত যে কোনো লোকই তো আশ্চর্য হবে।'

'আমি হাসছি একেবারে অন্য একটা কথা ভেবে। আমি হাসছি আপনার মফঃস্বলী সীমাবদ্ধতায়। আপনি প্রফেসর রাউথ, শহরের একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, যাঁর পাণ্ডিত্যের কথায় অপরিণত বালিকা আর অবিবাহিত বৃদ্ধারা উচ্ছ্বসিত, সেই আপনি আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রুতগতির কত পিছনেই না পড়ে আছেন!'

প্রাক্তন নাজী-পুলিস কর্তার এই ঔদ্ধত্যে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। চেঁচিয়ে বললাম, 'থামুন আপনি! মাত্র পনের বছর আগে আপনার পেশা ছিল কেবল নিরীহ লোককে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়ায়। বর্তমান বিজ্ঞানের কথা বলার কী অধিকার আছে আপনার? যদি জানতে চান তবে শুনুন,

যে কাজ করতে প্রতিভাধরদের পক্ষেও কয়েক বছর এমন কি সারা জীবন লেগে যায় তা আপনি একদিনের মধ্যে আদায় করছেন কী পদ্ধতি প্রয়োগ করে, ঠিক সেইটে জানতেই আমি এসেছি। আপনার দেখা পেয়ে আমি খুবই খুশি। একজন বৈজ্ঞানিক ও নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য শহরের সবাইকে এই কথা জানানো যে একজন প্রাক্তন নাজী জল্লাদ বিজ্ঞানীদের হেনস্থা করার পেশা বেছেছেন যে বিজ্ঞানীদের কর্তব্যই হল মানুষের সুখের জন্যে কাজ করে যাওয়া।'

ক্রাফৎশ্‌তুদৎ চেয়ার ছেড়ে ভ্রূকুটি করে এগিয়ে এল আমার দিকে।

'বলি শুনুন রাউথ। ভালো কথায় বলি আমায় রাগাবেন না। আমি জানতাম আজ হোক, কাল হোক আপনি আসবেন। কিন্তু আমার আপিসে একজন মূর্খকে দেখব তা কখনো আশা করিনি। সত্যি বলতে কি, ভেবেছিলাম আপনি হবেন আমাদের একজন সহযোগী ও সহায় '

'কী বললেন?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'আগে পরিষ্কার করে বলুন, যে লোকদের কল্যাণে আপনি মুনাফা লুঠছেন, তাদের আপনি শোষণ করছেন সৎভাবে নাকি অসৎভাবে?'

ক্রাফৎশ্‌তুদতের মুখখানা কুঁকড়ে একটা হলদেটে-নোংরা চামড়ার পুঁটলি হয়ে দাঁড়াল। পাঁশনের পেছনকার পান্ডু-নীল চোখদুটো পরিণত হল দুটো সংকীর্ণ ছিদ্রে, তাতে ঝলক দিতে লাগল কেমন তিক্ত সবজেটে একটা আগুন। মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন আমি একটা বেচা কেনার বস্তু-খরিদ্দার পরখ করে দেখছে আমায়।

'বটে? আমাদের কারবার কতটা সৎভাবে চলছে তাই বুঝিয়ে বলতে হবে আপনাকে? আপনার নির্বোধ অঙ্কগুলো যে কষে দেওয়া হয়েছে বিশ শতকে যে ভাবে কষা উচিত সেইভাবে, তাতে আপনি সন্তুষ্ট নন দেখছি? আপনার নিজেই ভুক্তভোগী হয়ে দেখার সাধ হয়েছে তাহলে?' হিসিয়ে উঠল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ, রাগে বিদ্বেষে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল তার জঘন্য মুখটা।

'আমি বিশ্বাস করি না যে এখানকার কারবারটা খুব খাঁটি। আপনার প্রাক্তন খ্যাতিই এ সন্দেহের পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া আপনাদের একজন সহকারীর চিৎকার শোনবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার '

'খুব হয়েছে, থামুন।' হুঙ্কার দিল ক্রাফৎশ্তুদৎ, 'অন্তত পক্ষে আমি আপনাকে এখানে আসার নিমন্ত্রণ করিনি। কিন্তু আপনি নিজেই এই মেজাজে যখন এসেছেন, তখন আপনি চান না চান, আমাদের কাজে লাগবেন।'

খেয়াল ছিল না যে ডাক্তারটি আমায় পথ দেখিয়ে এসেছিল সে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আমার পেছনে। ফার্মের কর্তার সংকেত পাওয়া মাত্র একটা পেশীবহুল হাত আমার মুখ চেপে ধরল, ঝাঁঝাল ওষুধে ভেজানো এক টুকরো তুলো গুঁজে দেওয়া হল আমার নাকে।

জ্ঞান হারালাম আমি।

৫

চেতনা ফিরে আসতে টের পেলাম যে একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমার চারপাশে উত্তেজিত তর্ক চলেছে কয়েকজন লোকের। প্রথম কিছুক্ষণ শুধু এইটুকু ধারণা হল যে তাদের বিষয়টা বৈজ্ঞানিক। পরে মাথাটা আর একটু খোলসা হলে তাদের অর্থটা বোধগম্য হল কিছুটা।

'কিন্তু তোমার নিকলস্ কোনো দৃষ্টান্তস্থানীয় নয়। উত্তেজনা কোডের ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিনির্ভর। একটা লোকের যাতে ইচ্ছাশক্তি উদ্রিক্ত হচ্ছে, তাতে অন্য একটা লোকের একেবারে অন্য একটা ভাব উদ্রিক্ত হতে পারে। যেমন, যে বিদ্যুৎ-উত্তেজনায় নিকলস্ আনন্দ পায়, তাতে আমার কানে তালা ধরে যায়। সেটা সইবার সময় মনে হয় যেন আমার দু কানে দুটো নল ঢোকানো হয়েছে আর নলের দু প্রান্তে গোঁ গোঁ করছে দুটো এরোপ্লেন।'

'তাহলেও মানুষের মস্তিষ্কের নিউরোন গ্রুপগুলোর ক্রিয়াচ্ছন্দে মানুষে মানুষে অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের গুরু সেইটাই কাজে লাগাচ্ছেন।'

'খুব সাফল্যের সঙ্গে নয় অবশ্য।' বলল একটা ক্লান্ত স্বর, 'আপাতত গাণিতিক বিশ্লেষণ ছাড়া বেশি এগোয়নি।'

'সেটা সময়ের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার চেয়ে পরোক্ষ পরীক্ষার গুরুত্ব বেশি। মস্তিষ্কের ভেতরে একটা ইলেকট্রড ঢুকিয়ে সেখানে কোন প্রেরণা সচল তা দেখা তো সম্ভব নয়, তাতে মস্তিষ্কই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ফলে প্রেরণাটাও। কিন্তু একটা জেনারেটরের ক্ষেত্রে কোডবদ্ধ প্রেরণা পরিবর্তনের একটা ব্যাপক পরিধি মেলে। তাতে মস্তিষ্কের ক্ষতি না করেও পরীক্ষা চালান যায়।'

'যাই বলো,' শোনা গেল সেই ক্লান্ত স্বরটা 'গোরিন আর ভয়েডের ব্যাপারটায় সে কথা সমর্থিত হচ্ছে না। ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে রাখার দশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যায় গোরিন, সেখানে পাঁচের দশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর সত্তর ফ্রিকোয়েন্সির উত্তেজনা প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল পরপর দশটি। আর ভয়েড যন্ত্রণায় এমন চিৎকার করে ওঠে যে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটর বন্ধ করে দিতে হয়। নিউরোকিবারনেটিকস-এর প্রধান কথাটাই ভুলে গেছ ভায়া, সেটা হল মনুষ্য দেহে নিউরোন জাল থেকে অসংখ্য সিন্যাপস জাগে এরা যে প্রেরণা সঞ্চালন করে তার নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি আর কোড আছে। এই স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে বিদ্যুৎ ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গতি ঘটে, অনুরণন হলেই মস্তিষ্কের সার্কিট প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হতে পারে। ডাক্তার কাজ চালাচ্ছে বলা যেতে পারে অন্ধের মতো। এখনো যে আমরা বেঁচে আছি সেটা নেহাৎই দৈবাৎ।'

এই সময় চোখ মেললাম আমি। যে ঘরটায় শুয়ে আছি সেটা একটা হাসপাতালের বড়ো ওয়ার্ডের মতো, দেয়াল বরাবর বিছানার সারি। মাঝখানে একটা মস্ত কাঠের টেবিল, ভুক্তাবশিষ্ট, খালি টিন, সিগারেটের টুকরোয় তা আকীর্ণ। আবছা আলো আসছে একটা বিজলী বাতি থেকে। কনুইয়ে ভর দিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলাপ থেমে গেল।

'কোথায় আমি?' আমার দিকে চেয়ে থাকা মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম অস্ফুটস্বরে।

কে একজন বললে, 'নোতুন লোকটার জ্ঞান ফিরেছে।'

'আমি কোথায়?' ওদের সকলের উদ্দেশে ফের জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার ডান দিকে আন্ডারওয়ার পরা একটা লোক বসে ছিল বিছানার ওপর। সে বললে, 'সে কি, আপনি জানেন না? এ হল আমাদের স্রষ্টা ও গুরু ক্রাফৎশ্তুদ্তের ফার্ম।'

'স্রষ্টা ও গুরু?' লোহার মতো ভারি কপালটা রগড়ে বললাম আমি, 'কী বলছেন, গুরু? সে যে একজন যুদ্ধ অপরাধী।'

'অপরাধ হচ্ছে একটা আপেক্ষিক কথা। সবই নির্ভর করে উদ্দেশ্যের ওপর। উদ্দেশ্য মহান হলে যে কোনো পদ্ধতিই ভালো।' এক নিঃশ্বাসে বললে আমার ডান পাশের সঙ্গীটি।

এই ইতর মাকিয়াভেলিপনায় অবাক হয়ে কৌতূহলে তাকালাম লোকটার দিকে।

'এই জ্ঞান আপনি কোথা থেকে আহরণ করেছেন যুবক?' পা ঝুলিয়ে আমি বসলাম ওর মুখোমুখি।

'হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ আমাদের স্রষ্টা ও গুরু।' হঠাৎ পরস্পরকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল সবাই।

বিষণ্ণচিত্তে ভাবলাম, বটে, 'জ্ঞানীগৃহেই' এসে পড়েছি তাহলে।

'সত্যিই, আপনারা যদি তাই ভাবেন তবে অবস্থা আপনাদের খুব খারাপই বলতে হবে,' বললাম ওদের দিকে ফের একবার চোখ বুলিয়ে।

'বাজি রেখে বলতে পারি, এই নতুন লোকটার গণিত এলাকা থাকবে নব্বই থেকে পঁচানব্বই চক্রের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ডে।' বিছানা থেকে অল্প একটু গা তুলে চেঁচিয়ে উঠল একজন তাগড়াই লোক।

'আর যন্ত্রণা জাগবে ১৪০ চক্রের বেশিতে নয়, সুষম স্পন্দিত প্রেরণার কোডে।' হাঁকল আরেকজন।

'আর দু-সেকেন্ড পর পর সেকেন্ডে ৮ প্রেরণার কোড সঞ্চালন করলেই ঘুমুবে।'

'আর প্রেরণার শক্তির লগারিথমিক বৃদ্ধি সহ ১০৩ চক্রে প্রেরণা হলে ক্ষিদে পাবে লোকটার।'

সবচেয়ে যা খারাপ হওয়া সম্ভব তাই ঘটেছে। সত্যি সত্যিই পাগলাদের মধ্যে এসে পড়েছি আমি। সবচেয়ে আশ্চর্য, এদের সকলের বাতিকই এক: আমার অনুভূতির ওপর কোনো একটা কোড ও প্রেরণার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। সবাই তারা আমায় ঘিরে ধরে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁকতে লাগল কতকগুলো অঙ্ক, কত মডুলেশন, কত প্রখরীকরণে জেনারেটরের অভ্যন্তরে আর দেয়ালের মাঝখানে কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে আমার এবং কতটা শক্তি দরকার হবে।

বই পড়ে জানা ছিল যে পাগলের কথায় কখনো প্রতিবাদ করতে নেই। তাই ঠিক করলাম কোনো রকম তর্ক না করে তাদেরই মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করব তাই যথাসম্ভব নিরীহ স্বরে আলাপ শুরু করলাম ডানপাশের লোকটার সঙ্গে। মনে হল অন্য সকলের চেয়ে সেই একটু স্বাভাবিক।

'আচ্ছা বলবেন কি, কী নিয়ে আলাপ করছেন আপনারা? সত্যি বলতে কি ও বিষয়টা আমার একেবারে জানা নেই। এই সব কোড, প্রেরণা, নিউরোন, উত্তেজন ...'

হো হো হাসিতে ঘর ফেটে গেল। হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল সবাই। রেগে উঠে দাঁড়ালাম, ইচ্ছে হচ্ছিল ধমকে দিই সবাইকে। হাসি কিন্তু থামল না।

'১৪ নং সার্কিট, ৮৫ চক্রের ফ্রিকোয়েন্সি! ক্রোধের উত্তেজনা।' চেঁচিয়ে উঠল একজন, সঙ্গে সঙ্গে আরো হররা উঠল হাসির

তখন বিছানায় বসে ঠিক করলাম হাসিটা থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

সবার আগে হাসি থামল আমার ডানপাশের লোকটির। আমার বিছানায় বসে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'মানে, সত্যিই কিছু জানো না তুমি?'

'দিব্যি দিয়ে বলছি কিছুই জানি না। এ সব একটা কথাও মাথায় ঢুকছে না।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি বলছি।'

'বেশ, তোমার কথাই বিশ্বাস করছি যদিও এমন ঘটেছে খুবই কম। ডেনিস উঠে বসে এই নতুনটাকে একটু বুঝিয়ে বলো কেন আমরা এখানে।'

'হ্যাঁ ডেনিস, বুঝিয়ে বল ওকে। ও-ও আনন্দে থাক আমাদের মতো।'

'আনন্দ?' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে, 'আনন্দে আছ তোমরা?'

'অবশ্যই, অবশ্যই আনন্দে আছি।' চেঁচিয়ে উঠল সবাই, 'আত্মজ্ঞান হয়েছে আমাদের। মানুষের চরম সুখ হল যখন সে নিজেকে জানে।'

'আগে জানতে না নিজেদের?' অবাক হলাম।

'নিশ্চয় না। মানুষ নিজেকে জানে না। কেবল যারা নিউরোকিবারনেটিক বিদ্যা জানে, তাদেরই আত্মজ্ঞান সম্ভব।'

'জয় হোক আমাদের গুরুর!' কে যেন ধ্বনি দিল।

'জয় হোক আমাদের গুরুর।' যন্ত্রের মতো প্রতিধ্বনি করল সবাই

ওরা যাকে ডেনিস বলেছিল, সে এসে বসল আমার পাশের বিছানায়। ফাঁপা ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'কতদূর পড়েছ বলো তো?'

'আমি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক!'

'নিউরোসাইকলজির কিছু জানো?'

'কিছু না।'

'কিবারনেটিক্স বিদ্যা?'

'ঝাপসা।'

'নিউরোকিবারনেটিক্স আর জৈবিক নিয়ন্ত্রণের সাধারণ তত্ত্ব?'

'বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল ঘরে।

ডেনিস বললে, 'কোনো আশা নেই। কিছু বুঝতে পারবে না ও।'

'তবু চালিয়ে যাও দয়া করে। বোঝবার চেষ্টা করব যথাসাধ্য।'

'বিশ দফা জেনারেটরে গেলেই ঠিক বুঝে যাবে।' কে যেন বললে।

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম পাঁচ বারের পর।' হাঁকল একজন।

'দেয়ালের মধ্যে বার দুয়েক থাকলেই বেশি কাজ হবে।'

'সে যাই হোক, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন ডেনিস,' জেদ ধরলাম আমি। ভয় পেয়ে বসল আমায়।

'আচ্ছা জীবন জিনিসটা কী তা বোঝো?'

কথা না বলে বহুক্ষণ চেয়ে রইলাম ডেনিসের দিকে।

অবশেষে বললাম, 'জীবন একটা জটিল প্রাকৃতিক ঘটনা।'

কে একবার জোরে হিহি করে উঠল। দ্বিতীয়বার হিহি। আরো আরো। ঘরের সবাই আমার দিকে তাকাল এমন ভাবে যেন কী একটা অশ্লীল বাজে কথা বলেছি। কেবল ডেনিস মাথা নাড়লে ভর্ৎসনাভরে।

'তোমার হাল খুব খারাপ। অনেক কিছুই শিখতে হবে।'

'ভুল বলে থাকলে, বলো কোথায় ভুল?'

'বুঝিয়ে দে ওকে ডেনিস, বুঝিয়ে দে,' সমস্বরে চেঁচাল সবাই।

'বেশ, শোনো। জীবন হল তোমার দেহযন্ত্রের নিউরোনের মধ্যে দিয়ে কোডবদ্ধ বৈদ্যুতিক রাসায়নিক উত্তেজনার অবিরত সঞ্চালন।'

একটু ভাবলাম। নিউরোনের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার সঞ্চালন। এরকম কথা আগেও কোথাও শুনেছি বলে মনে হল।

'বেশ, বলে যাও।'

'যে সব সংবেদন দিয়ে তোমার আত্মিক অহং তৈরি সেটা আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলো বিদ্যুৎ-রাসায়নিক প্রেরণা, গ্রাহক-ইন্দ্রিয় থেকে তা বাহিত হয়ে পেঁছয় মস্তিষ্কের উচ্চতম রেগুলেটারে, সেখানে জারিত হয়ে ফিরে আসে কারক ইন্দ্রিয়ে।'

'বেশ, তারপর?'

'বহির্জগতের সমস্ত সংবেদন স্নায়ুতন্তু দিয়ে পেঁছয় মস্তিষ্কে। প্রতিটি সংবেদনের আছে নিজস্ব কোড, ফ্রিকোয়েন্সি ও বিস্তারের গতি। আর এই তিনটে জিনিসের ওপরেই নির্ভর করে তার চরিত্র, প্রখরতা ও স্থায়িত্ব। বুঝলে?'

'ধরলাম তাই।'

'সুতরাং জীবন আর কিছুই নয় তোমার স্নায়ুতন্তু বেয়ে কোডবদ্ধ সংবাদের গতি। তার কমও নয় বেশিও নয়। চিন্তা হল স্নায়ুব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিউরোন সিন্যাপসগুলিতে নিয়ন্ত্রিত ফ্রিকোয়েন্সির সংবাদ সঞ্চালন।'

স্বীকার করলাম, 'ঠিক মাথায় ঢুকছে না।'

'ব্যাপারটা এই। মস্তিষ্ক হল প্রায় এক হাজার কোটি নিউরোন দিয়ে গড়া — এগুলো অনেকটা বৈদ্যুতিক রিলের মতো। পরস্পরের সঙ্গে গ্রুপ ও আংটির আকারে তারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে বিশেষ তন্তু মারফত, এই সংযোগ তন্তুগুলোকে বলে অ্যাক্সোন। এক নিউরোন থেকে আরেক নিউরোনে উত্তেজনা বাহিত হয় এইগুলো দিয়ে, এক নিউরোন গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপে। বিভিন্ন নিউরোনের ওপর উত্তেজনার এই ভ্রমণকেই আমরা বলি চিন্তা।'

আরো ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

'জেনারেটরে কিংবা দেয়ালের মধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত ও কিছুই বুঝবে না।' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

'ধরে নিলাম তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তা থেকে কী দাঁড়াচ্ছে?' ডেনিসকে বললাম আমি।

'দাঁড়াচ্ছে এই যে জীবনকে খুশিমতো গড়ে নেওয়া যায়। তা করা যায় প্রেরণা জেনারেটরের মারফত, যা নিউরোন সিন্যাপসগুলোতে প্রয়োজনীয় কোডের উত্তেজনা ঘটাবে। এ জিনিসটার ব্যবহারিক তাৎপর্য প্রচণ্ড।'

'তার মানে,' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম আমি, টের পাচ্ছিলাম ক্রাফৎশ্‌তুদৎ ফার্মের কাজের রহস্য এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠার উপক্রম হয়েছে।

'একটা উদাহরণ দিয়ে তা ভালো বোঝান যায়। ধরা যাক, গাণিতিক কর্মের উত্তেজনা। পশ্চাৎপদ দেশেরা বর্তমানে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করছে। এই সব যন্ত্রে ট্রিগার বা রিলের সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ হাজারের বেশি নয়। কিন্তু মনুষ্য মস্তিষ্কের গাণিতিক এলাকাটায় ট্রিগারের সংখ্যা প্রায় একশ কোটি। এর কাছাকাছি একটা সংখ্যার ট্রিগার আছে এমন যন্ত্র কেউ কখনো তৈরি করতে পারবে না।'

'বেশ, কী হল তাতে?'

'হল এই: গাণিতিক সমস্যা যে-কোনো মহার্ঘ যন্ত্রের চেয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে এবং সুলভে সমাধান করা যায় এমন একটা ব্যবস্থায় যা প্রকৃতি মাতা নিজেই সৃষ্টি করে স্থাপিত করেছে এইখানে।' কপালের উপর হাত বুলিয়ে দেখাল ডেনিস।

'কিন্তু যন্ত্র কাজ করে অনেক তাড়াতাড়ি,' আমি বলে উঠলাম, 'যত দূর মনে পড়ে, একটা নিউরোনকে সেকেণ্ডে দুশ' বারের বেশি উত্তেজিত করা যায় না অথচ একটা ইলেকট্রনিক ট্রিগার লক্ষ লক্ষ প্রেরণা নিতে পারে। সেই জন্যেই দ্রুতক্রিয় যন্ত্রগুলি এত সুবিধাজনক।'

ফের হাসির হররা উঠল ঘরে। মুখ গম্ভীর করে রইল কেবল ডেনিস।

'এইখানে তোমার ভুল। যদি উত্তেজকটার ফ্রিকোয়েন্সি হয় যথেষ্ট উঁচু সেক্ষেত্রে যে-কোনো গতিতে প্রেরণা গ্রহণ করতে পারে নিউরোন। তা করা যায় একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর দিয়ে, যা কাজ করছে প্রেরণাদায়ক একটা ব্যবস্থায়। এই রকম জেনারেটরের বিকিরণ ক্ষেত্রের মধ্যে মস্তিষ্ককে রাখলে তা যে-কোনো গতিতে কাজ করতে পারে।'

'ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানি তাহলে এই উপায়েই টাকা কামায়!' চেঁচিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'তিনি আমাদের গুরু,' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল সবাই, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বলো, তিনি আমাদের গুরু।'

'ছেড়ে দাও ওকে,' ডেনিস হুকুম করল হঠাৎ, 'যথা সময়ে ও বুঝবে যে হের ক্রাফৎশ্‌তুদৎ আমাদের গুরু। এখনো ও কিছুই জানে না। এই কথাটা

মনে রেখো হে, প্রতিটি অনুভূতির নিজস্ব কোড, প্রখরতা, ও স্থায়িত্ব আছে। সুখের অনুভূতি হল ১০০ প্রেরণার এক একটা কোড সিরিজের সেকেণ্ডে ৫০ সাইক্‌ল্‌। দুঃখের অনুভূতি হল ৬২ চক্র, দুই স্পন্দনের মধ্যে ০·১ সেকেণ্ড বিরতি। আনন্দের অনুভূতি ৪৭ চক্র, প্রেরণার শক্তি অনুসারে ক্রমবর্ধমান প্রখরতা। বিষাদের অনুভূতি ১৪ চক্র, কাব্যিক মেজাজ -- ৩১, ক্রোধ — ৮৫, ক্লান্তি — ১৭, নিদ্রাতুরতা ৮ চক্র ইত্যাদি। এই সব ফ্রিকোয়েন্সিতে কোডবদ্ধ প্রেরণা নিউরোনের বিশেষ বিশেষ সিন্যাপসগুলোর ওপর সচল হয়, তাই যা বললাম সেই সব অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়। আমাদের গুরুর তৈরি একটা প্রেরণা জেনারেটরে তা সবই উৎপন্ন করা যায়। জীবনের অর্থ কী সেদিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন তিনি।'

এই সব কথা শুনে মাথা ঘুরছিল। কী যে ভাবব তার দিশা পাচ্ছিলাম না. হয় এসবই নিতান্ত উন্মাদ প্রলাপ, নয়ত সত্যিই এমন একটা কিছু যাতে মানব জীবনের নতুন একটা দিক উন্মোচিত হচ্ছে। তখনো মাথায় অজ্ঞানের ওষুধটার ক্রিয়া কাটেনি। ক্লান্তিতে দেহ অবশ হয়ে এল। শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম।

'ওর ফ্রিকোয়েন্সি এখন সাত থেকে আট চক্র! ঘুম পাচ্ছে ওর!' কে একজন বললে।

'ঘুমোক। কাল থেকে ওর আত্মজ্ঞান শুরু হবে। জেনারেটরের কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে কাল।'

'না, কাল রেকর্ড করা হবে ওর স্পেকট্রাম ছক। অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে কিছু।'

আর কিছু কানে আসেনি। গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম।

৬

পরের দিন যার সঙ্গে দেখা হল সে লোকটাকে ভালোমানুষ ও বুদ্ধিমান বলে মনে হল। ফার্মের প্রধান দালানটার দ্বিতীয় তলায় তার কাজের ঘরে আমায় নিয়ে আসা হয়েছিল। একগাল হেসে লোকটা হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

'আরে প্রফেসর রাউখ, ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে।'

সংযতভাবে বললাম, 'নমস্কার। কিন্তু জানতে পারি কার সঙ্গে কথা কইছি?'

'আমার নাম বলৎস, হ্যান্স বলৎস। আমাদের কর্তা আমায় একটা অস্বস্তির কাজ চাপিয়েছেন — তাঁর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

'ক্ষমা চাওয়া? আপনার কর্তা কি সত্যিই বিবেকে ভোগেন?'

'জানি না রাউখ, সত্যিই জানি না। অন্তত, যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে তিনি অকৃত্রিমভাবে মাপ চেয়ে পাঠিয়েছেন। রাগ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মানে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে উনি ভারি রুষ্ট হন।'

একটু হাসলাম আমি।

'আমি তো তাঁর অতীত ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্যে আসিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। অমন চমৎকার করে যাঁরা অংক কষেছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম আমি ...'

'বসুন প্রফেসর, ঠিক এই বিষয়েই কথা বলতে চাই আমি।'

এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসে মস্ত ডেস্কের ওপারের স্মিত মুখখানাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। খাঁটি উত্তরদেশীয় জার্মান চেহারা বলৎসের, লম্বাটে মুখ, ফ্যাকাশে চুল, বড়ো বড়ো নীল চোখ। একটা সিগারেট কেস নিয়ে খেলা করছিল তার আঙুলগুলো।

বললে, 'এখানকার গণিত বিভাগের দায়িত্বে আছি আমি।'

'আপনি? আপনি কি গণিতজ্ঞ?'

'খানিকটা। অন্তত তা নিয়ে খানিকটা মাথা খাটাই।'

'তার মানে আপনার মারফত এখানকার গণিতজ্ঞদের দেখা মিলবে।'

'তাদের সকলকেই আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন রাউখ।' বলৎস বললে।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম আমি।

'একটা দিন, একটা রাত আপনি কাটিয়েছেন তাদের সঙ্গে।'

মনে পড়ল ঐ ওয়ার্ড আর তার অধিবাসীদের কথা, প্রেরণা আর কোড নিয়ে তাদের যত বাজে বকুনি।

'আপনি বলতে চান ঐ পাগলেরাই আমার অংক কষে দিয়েছে অমন প্রতিভাধরের মতো?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে হেসে উঠলাম আমি।

'ঠিক ওরাই। আপনার শেষ অংকটা কষেছেন ডেনিস নামে একজন লোক। যতদূর জানি, কাল রাতে আপনাকে সে নিউরোকিবারনেটিক্স বিদ্যা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিয়েছিল।'

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম·

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি কিছুই বুঝিনি। আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?'

'সানন্দে। কেবল এই জিনিসটা আগে একবার দেখুন।'

এই বলে বলৎস সকালবেলাকার কাগজটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। ধীরে ধীরে খুললাম কাগজটা। তারপর লাফিয়ে উঠলাম। প্রথম পাতায় কালো বর্ডারের মধ্যে থেকে তাকিয়ে আছে... আমারই নিজের ছবি। তার নিচে বড়ো হরফে ক্যাপশেন: 'পদার্থবিদ্যার প্রফেসর ডাঃ রাউথের শোচনীয় মৃত্যু।'

'এর মানে কী বলৎস? এ আবার কী রসিকতা?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'শান্ত হোন. ব্যাপারটা খুবই সোজা কাল রাতে হ্রদের কাছে একটু পায়চারি করে বাড়ি ফেরার সময় সাঁকোর ওপর 'জ্ঞানীগৃহের' দুটো পালাতক পাগল আপনাকে আক্রমণ করে, খুন করে থ্যাঁতলা করে ফেলে দেয় নদীতে। আজ ভোরে আপনার লাস পাওয়া গেছে বাঁধের কাছে। পোষাক এবং পকেটের কাগজপত্র থেকে সনাক্ত হয়েছে লাসটা আপনার. আজ সকালে পুলিস এসেছিল 'জ্ঞানীগৃহে', আপনার শোচনীয় মৃত্যুর পুরো কাহিনীটা তারা বার করেছে।'

কেবল তখনই তাকিয়ে দেখলাম আমার পোষাকের দিকে। যে স্যুটটা পরে আছি সেটা আমার নয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম যা দলিলপত্রাদি ছিল তার কিছু নেই।

'কিন্তু এ যে একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যা, প্রতারণা, বদমাইশি...'

'তা ঠিক। আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু কী করি বলুন রাউথ, কী করা যাবে? আপনাকে নইলে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ ফার্মকে ভয়ানক লোকসান সইতে হতে পারে, বলতে কি একেবারেই ফেঁসে যেতে পারে। আপনাকে বলতে অসুবিধা নেই যে অর্ডারে আমরা একেবারে ডুবে আছি। সবই সামরিক

অর্ডার এবং অত্যন্ত দামী তার মানে দিন রাত কাজ। সামরিক মন্ত্রিদপ্তরের প্রথম কিস্তি অর্ডার শেষ করার পরই কারবার বলা যেতে পারে চাঙ্গা হতে শুরু করেছে।'

'আপনাদের জন্যে আর একটি ডেনিস হতে হবে আমায়?'

'না, না, রাউথ মোটেই নয়!'

'তাহলে এ প্রহসনের অর্থ?'

'আমরা আপনাকে চাই গণিতের শিক্ষক হিসাবে।'

'শিক্ষক?'

ফের লাফিয়ে উঠে উদভ্রান্তের মতো তাকালাম বলৎসের দিকে। বলৎস একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলে চেয়ারের দিকে। একেবারে হতভম্বের মতো বসে পড়লাম আমি।

'গণিতজ্ঞ দরকার আমাদের প্রফেসর রাউথ। পেতেই হবে নইলে শিগগিরই কারবারের দফা রফা।'

আমি নীরবে তাকিয়ে রইলাম বলৎসের দিকে। এখন আর তাকে মোটেই তেমন ভালোমানুষ মনে হচ্ছিল না। মুখের ওপর কেমন একটা পাশবিক আভাস চোখে পড়তে লাগল আমার, খুব অস্পষ্ট হলেও কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা তার হার্দ্য ভাবটাকে ছাপিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'কিন্তু আমি যদি অস্বীকার করি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'খুবই খারাপ হবে তাহলে। সে ক্ষেত্রে ওদের একজন হতে হবে আপনাকে, মানে... কম্পিউটারদের একজন।'

'সেটা কি এতই খারাপ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়াল বলৎস, 'তার অর্থ আপনার জীবন শেষ হবে "জ্ঞানীগৃহে"।'

ঘরময় কয়েকবার পায়চারি করে বলৎস বক্তার মতো সুরে বলতে লাগল:

'মানব মস্তিষ্কের হিসাব ক্ষমতা একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের চেয়ে কয়েক লাখগুণ বেশি। একশ কোটি গাণিতিক কোষ, তার ওপর স্মৃতি, অবদমন, যুক্তি, স্বতঃবোধ ইত্যাদি সহায়ক যন্ত্রের ফলে মস্তিষ্ক যে কোনো সম্ভাব্য যন্ত্রের চেয়ে উচ্চস্তরের জিনিস। তাহলেও যন্ত্রের একটা প্রধান সুবিধা আছে।'

'কী সুবিধা?' ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী বলতে চাইছে বলৎস।

'ধরুন যদি একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের একটা বা একগুচ্ছ ট্রিগার নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ভালভ, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি বদলে দিলেই যন্ত্রটা ফের কাজ করতে শুরু করবে কিন্তু মস্তিষ্কের হিসাব এলাকাটার একটা কোষ বা একগুচ্ছ কোষ নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ অসম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত, এখানে মস্তিষ্কের ট্রিগারগুলোকে ভয়ানক দ্রুত বেগে খাটাতে হচ্ছে আমাদের। তার ফলে বলা যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অসম্ভব বাড়ে। জীবন্ত কম্পিউটাররা শিগগিরই ফুরিয়ে যায় এবং তখন...'

'তখন?'

'তখন তাদের গতি হয় "জ্ঞানীগৃহে"।'

'কিন্তু এটা যে অমানুষিকতা এবং অপরাধ!' বলে উঠলাম উত্তেজিতভাবে।

বলৎস আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখল আমার। এক গাল হেসে বললে, 'ঐসব কথা আর সংজ্ঞা আপনাকে এখানে ভুলে যেতে হবে রাউথ। আপনি নিজে থেকে যদি না ভোলেন তো আপনার স্মৃতি থেকে তা আমাদেরই মুছে ফেলতে হবে।'

'সে আশা দুরাশা আপনাদের।'

কাঁধ থেকে ওর হাত সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'ডেনিসের কথাগুলো আপনার মাথায় ঢোকেনি দেখছি। খুবই আফশোস কিন্তু খাঁটি কথাই বলেছিল সে। আচ্ছা, বলুন তো স্মৃতি কী জিনিস?'

'তার সঙ্গে কী সম্পর্ক? কী জন্যে আপনারা সবাই এখানে অমন ঢঙ শুরু করেছেন? কেন আপনারা..'

'স্মৃতি হল, প্রফেসর রাউথ, একটা পজিটিভ উল্টো সংযোগের ফলে একগুচ্ছ নিউরোনের দীর্ঘায়ত উত্তেজনা। অন্য কথায়, আপনার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এক গুচ্ছ কোষে প্রবহমান বৈদ্যুতিক রাসায়নিক উত্তেজনাই হল স্মৃতি। আপনি পদার্থবিদ, জটিল মাধ্যমের বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রক্রিয়ায় আপনার কৌতূহল আছে। আপনি কি বোঝেন না যে, আপনার মাথাটার উপর একটা উপযুক্ত বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র রেখে আমরা যে কোনো নিউরোনগুচ্ছের সেরকম উত্তেজনা বন্ধ করে দিতে পারি। এর চেয়ে সহজ আর কিছু নেই। আপনি যা জানতেন তা ভুলিয়ে দেওয়া শুধু নয়, যা কখনো জানতেন না তাকেও

স্মৃতিবদ্ধ করে দিতে পারি আমরা। তবে এই সব, মানে, কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ করায় আমাদের লাভ বেশি নেই। আশা করি, আপনার কাণ্ডজ্ঞানই বড়ো হবে। ডিভিডেণ্ডের একটা মোটা অংশ আপনাকে দিতে রাজী আছে আমাদের ফার্ম।'

'কী কাজ করতে হবে?'

'সে তো আপনাকে আগেই বলেছি — গণিত শেখাবেন। আমাদের দেশে সৌভাগ্যবশত বেকার অনেক, তাদের মধ্যে থেকে অঙ্কে মাথা আছে এমন বিশ ত্রিশ জন লোককে বেছে ক্লাশ করব। তারপর তাদের উচ্চ গণিত শেখাব মাস দুই তিনের মধ্যে...'

'সে অসম্ভব...' বললাম আমি, 'এ একেবারে অসম্ভব। এত অল্পদিনের মধ্যে...'

'খুবই সম্ভব রাউথ। মনে রাখবেন যে আপনার ছাত্ররা অতি বুদ্ধিমান, গাণিতিক স্মৃতি তাদের অত্যাশ্চর্য। সে ব্যাপারটা আমরা দেখব ওটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে...'

'এটাও কৃত্রিম উপায়ে? প্রেরণা জেনারেটরের সাহায্যে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি বলৎস মাথা নাড়ল।

'রাজী তাহলে?'

চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম আমি। ডেনিস ও ওয়ার্ডের অন্যান্য লোকেরা তাহলে স্বাভাবিক মানুষ, আমায় তারা সত্যি কথাই কাল বলছিল। তার মানে গ্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানি সত্যিই বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রেরণা ক্ষেত্রের সাহায্যে মানব চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি ও সংবেদনকে নিয়ে ব্যবসা করার পদ্ধতি বার করেছে। টের পাচ্ছিলাম বলৎসের তীক্ষ্ম দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অথচ সিদ্ধান্ত নেওয়া বিটকেলে রকমের শক্ত। যদি রাজী হই, তাহলে আমার ছাত্রদের জন্যে 'জ্ঞানীগৃহে' যাবার পথ প্রশস্ত করব, যদি রাজী না হই তাহলে নিজেই সেখানে পৌঁছব।'

আমার কাঁধে হাত দিয়ে ফের জিজ্ঞেস করল বলৎস, 'রাজী তো?'

'না,' দৃঢ়ভাবে বললাম আমি, 'না, এই জঘন্যতার সহযোগী হতে পারি না আমি।'

'আপনার যা অভিরুচি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে বলৎস, 'দুঃখ হচ্ছে আপনার জন্যে।'

পরের মুহূর্তেই কাজের ভাব করে টেবিল ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে ডাকল,

'এইডার, শ্রাঙ্ক, আসুন এদিকে!'

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করবেন আমায়?'

'প্রথমত, আপনার স্নায়ুপরিস্থিতির প্রেরণা-কোড কী কী তার একটা স্পেকট্রাম নেব।'

'তার মানে?'

'তার মানে কী কী রূপ, প্রখরতা, ও ফ্রিকোয়েন্সির প্রেরণায় আপনার কী কী আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা হয় তার চার্ট বানাব।'

'কিন্তু তাতে আমার আপত্তি আছে। আমি প্রতিবাদ করব। আমি '

'প্রফেসরকে টেস্ট ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাও,' নির্বিকার গলায় নির্দেশ দিয়ে বলৎস আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাল জানলার দিকে।

৭

টেস্ট ল্যাবরেটরিতে ঢোকার আগেই আমি আমার সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলাম। আমার যুক্তি ছিল এই রকম। আমায় এরা পরীক্ষা করে দেখবে তার ফলে ক্রাফৎশ্‌তুদতের দঙ্গল আমার আভ্যন্তরীণ সত্তার সমস্ত খবর পেয়ে যাবে। তারা জানতে চেষ্টা করবে তাদের অভিপ্রেত আবেগ বা সংবেদন আমার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হলে কী ধরনের বিদ্যুৎ-চুম্বক উত্তেজনা প্রয়োজন। এতে যদি তারা সফল হয় তাহলে আমি পুরোপুরি তাদের কবলস্থ হয়ে পড়ব, পরিত্রাণের কোনো আশা থাকবে না। যদি সফল না হয় তাহলে কিছুটা মানসিক স্বাধীনতা আমার থাকবে, যা খুবই কাজে লাগবে আমার। তাই দরকার ছিল এই ডাকাতগুলোকে যথাসম্ভব বোকা বানানো। এটা যে আমি কিছুটা পরিমাণ করতে পারি তা অনুমান করলাম গতকাল ক্রাফৎশ্‌তুদতের জনৈক দাসের এই কথাটা থেকে যে গাণিতিক ক্ষেত্রটা ছাড়া প্রেরণা কোড এক এক লোকের পক্ষে এক এক রকম।

যে বড়ো ঘরখানায় আমায় নিয়ে আসা হল সেটা বড়ো বড়ো নানা যন্ত্রে ঠাসা, দেখতে অনেকটা বিদ্যুৎ-স্টেশনের কন্ট্রোল রুমের মতো। ল্যাবরেটরির

মাঝখানটায় একটা কন্ট্রোল কনসোল, তাতে কলকব্জার প্যানেল আর ডায়াল। বাঁ দিকে তারের জালের পেছনে মাথা তুলেছে একটা ট্র্যানসফরমার, চিনেমাটির প্যানেলে কয়েকটা জেনারেটর ল্যাম্প জ্বলছে লাল আলোয়। বোঝা যায়, তারের জালটা জেনারেটরের স্ক্রীন গ্রীডের কাজ করছে, তার সঙ্গে একটা ভোল্টমিটার ও অ্যামমিটার লাগানো। এই ভোল্টমিটার আর অ্যামমিটার দেখে জেনারেটরের ক্ষমতা মাপা হয় বলে মনে হয়। কন্ট্রোল কনসোলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিলিন্ডার বুথ, ওপর নিচ দুটো ধাতু অংশে তা তৈরি।

এই বুথের দিকে নিয়ে আসা হল আমায়। কনসোলের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল দুজন লোক। এদের একজন সেই ডাক্তার যে আমায় আগের দিন ফ্রাফৎশ্‌তুদতের কাছে নিয়ে এসেছিল, অজ্ঞান করে ফেলেছিল। দ্বিতীয় জন আমার অচেনা এক কুঁজোটে বুড়ো, হলদেটে টাকের ওপর পাতলা চুলকটি পাট করে আঁচড়ানো।

'বুঝিয়ে রাজী করানো গেল না তো?' বললে ডাক্তার, 'সে আমি জানতাম। দেখেই বুঝেছিলাম যে রাউখ হল সবল টাইপ। পরিণাম আপনার খারাপ রাউখ' ও বললে আমায় উদ্দেশ করে।

'আপনারও,' বললাম আমি।

'সেটা এখনো বলা যায় না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে অবধারিত।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

'আপনি কি স্বেচ্ছায় ঢুকবেন নাকি জোর খাটাতে হবে?' উদ্ধত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'স্বেচ্ছায় পদার্থবিদ হিসাবে আমার বরং কৌতূহলই হচ্ছে।'

'চমৎকার! তাহলে জুতো খুলুন, কোমর পর্যন্ত জামা খুলে ফেলুন। আগে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখব। রক্তের চাপ নেব।'

জামা খুলে ফেললাম আমি। স্পেকট্রাম গ্রহণের প্রথম অংশটুকু নিতান্তই একটা ডাক্তারি চেক-আপের মতো ব্যাপার -- নিঃশ্বাস নেওয়া, নিঃশ্বাস ছাড়া ইত্যাদি

চেক আপ শেষ হলে ডাক্তার বলল

'এবার বুথে ঢুকুন। সেখানে একটা মাইক্রোফোন আছে, তাতে আমি যা

প্রশ্ন করব জবাব দেবেন। আগেই বলে রাখছি একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভয়ানক যন্ত্রণার অনুভূতি হবে কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেই তা কেটে যাবে '

খালি পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম চিনেমাটির মেজের ওপর মাথার ওপর জ্বলে উঠল একটা বিজলী বাতি। গুঞ্জন করে উঠল জেনারেটর। খুব নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে চলছিল সেটা। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের টানটা স্পষ্টতই খুব চড়া। সেটা টের পেলাম শরীর বেয়ে তাপ প্রবাহের মন্থর ঢেউয়ে। প্রতিটি বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের জোড়গুলোতে একটা অদ্ভুত শুড়শুড়ি লাগছিল। পেশীগুলো প্রেরণার তালে তালে সঙ্কুচিত ও শিথিল হতে থাকল।

জেনারেটর বেশ জোরে চলতে লাগল আর তাপ তরঙ্গের লয়ও বেড়ে উঠল।

'এই শুরু হয়েছে,' ভাবলাম আমি, 'সহ্য করতে পারলে হয়।'

ফ্রিকোয়েন্সি যখন সেকেণ্ডে ৮ চক্র পর্যন্ত উঠবে তখন ঘুম পাবে আমার। সে ঘুমকে যদি কোনোক্রমে আটকে রাখতে পারি, কোনো রকমে যদি বোকা বানাতে পারি এদের। ধীরে ধীরে বাড়ছিল ফ্রিকোয়েন্সি। মনে মনে তাপ তরঙ্গের সংখ্যা গুনে দেখছিলাম সেকেণ্ডে কত। এক, দুই, তিন, চার, তারপর আরো, আরো... হঠাৎ একেবারে আচম্বিতে ঘুম এসে ভর করল আমায়। দাঁতে দাঁত চেপে আমি জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করলাম একটা প্রচণ্ড জগদ্দল ভারের মতো ঘুম চেপে ধরল আমায়, বুজিয়ে দিচ্ছিল চোখের পাতা। তখনো যে দাঁড়িয়ে রইলাম আশ্চর্য। দাঁত দিয়ে সজোরে জিভ কামড়াতে লাগলাম আমি। ভাবলাম যন্ত্রণা দিয়ে হয়ত এই ঘুমের ভুতুড়ে বোঝাটাকে আটকে রাখতে পারব সেই মুহূর্তে যেন বহুদূরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'রাউথ, কী রকম বোধ হচ্ছে?'

'বিশেষ খারাপ নয়, ধন্যবাদ। একটু ঠাণ্ডা এই যা,' মিছে কথা বললাম আমি। নিজের গলাই আমার কাছে অচেনা লাগছিল সর্বশক্তি দিয়ে জিভ আর ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম

'ঘুম পাচ্ছে না?'

'কই না তো।' বললাম বটে, কিন্তু টের পাচ্ছিলাম এই বুঝি ঘুমে লুটিয়ে পড়ি। তারপর হঠাৎ কেটে গেল সব ঘুম। নিশ্চয় প্রথম পর্যায়ের

সংকট সীমানা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে ফ্রিকোয়েন্সি। বেশ তাজা এবং ফুর্তি লাগছিল, ভালো ঘুমের পর যেমন হয়। ঠিক করলাম এই বার আমায় ঘুমিয়ে পড়তে হবে। চোখ বুজে নাক ডাকাতে লাগলাম। কানে এল ডাক্তার বলছে সহকারীকে·

'অদ্ভুত। সাড়ে আটের বদলে দশ চক্রে ঘুম। টুকে রাখুন শ্ফাফ্‌ফ্‌।' ডাক্তার বললে বুড়োটাকে। 'রাউখ, কী মনে হচ্ছে এখন?'

জবাব না দিয়ে আমি গা হাত পা ছেড়ে বুথের দেয়ালে এগিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলাম।

'দেখা যাক পরেরটা,' ডাক্তার বললে, 'ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দিন তো শ্ফাফ্‌ফ্‌।'

মুহূর্তের মধ্যে আমি 'জেগে উঠলাম'। যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি তাতে বদলে যেতে লাগল মেজাজ ও আবেগ। বিষণ্ণ লাগল, তারপর ফুর্তি, তারপর আনন্দ, শেষে অসহ্য দুঃখ।

হঠাৎ ঠিক করলাম, 'এইবার চেঁচিয়ে ওঠা উচিত।'

জেনারেটরের গর্জন বাড়তেই আমি যথাশক্তি চেঁচিয়ে উঠলাম। কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ডে তা হল মনে নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হুকুম দিলেন, 'অফ করে দিন। এমন বিদঘুটে টাইপ এই প্রথম দেখছি। টুকে রাখুন: সেকেণ্ডে ৭৫ চক্রে যন্ত্রণা, স্বাভাবিক লোকের ক্ষেত্রে যেখানে দরকার ১৩০; আচ্ছা চালিয়ে যান।'

সভয়ে ভাবলাম, 'সে ফ্রিকোয়েন্সিটা ভবিষ্যতে আছে আমার কপালে। সইতে পারব কি?'

'এবার শ্ফাফফ ৯৩টা পরখ করে দেখি।'

এ ফ্রিকোয়েন্সিটা স্থিতু হতেই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। যে সমীকরণদুটোর জন্যে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানিতে আসতে হয়েছিল তা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, এবং তার সমাধানের প্রতিটি পর্যায় একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠল চোখের সামনে। চকিতে ভাবলাম, গাণিতিক চিন্তা ত্বরান্বিত করার ফ্রিকোয়েন্সি এটা।

'রাউখ, দ্বিতীয় পর্যায়ের বেসেল ফাংকশনের প্রথম পাঁচটা রাশির নাম করুন,' বললে ডাক্তার।

চটপট উত্তর দিলাম। মাথাটা আমার একেবারে পরিষ্কার। যেন সবকিছু জানি, সবকিছু ঠোঁটস্থ, এমনি একটা অনুভূতিতে আমি ভরপুর।

'π'এর প্রথম দশটি চিহ্নের নাম করুন।'

জবাব দিয়ে দিলাম আমি।

'এই কিউবিক সমীকরণটা কষুন '

বিদঘুটে সব আংশিক কোয়েফিসিয়েণ্ট সহ একটা সমীকরণ দিল ডাক্তার।

দু তিন সেকেণ্ডের মধ্যে আমি উত্তর জানিয়ে দিলাম, তিনটে ঘনমূলও সবই বলে দিলাম।

'এবার পরেরটা। এক্ষেত্রে ওঁর প্রতিক্রিয়াটা স্বাভাবিক লোকের মতো।'

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল ফ্রিকোয়েন্সি। হঠাৎ একসময় কান্না পেতে লাগল আমার গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল, জল ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে। কিন্তু হাসতে লাগলাম আমি, হাসতে লাগলাম পাগলার মতো যেন কেউ আমায় ভয়ানক শুড়শুড়ি দিচ্ছে, আর ওদিকে জল বেয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে।

'ফের আবার একটা বিদঘুটে প্রতিক্রিয়া। মোটেই আর সকলের মতো নয়। আমি দেখেই বলেছিলাম এ একটা শক্ত স্নায়বিক টাইপ, নিউরসিসের ঝোঁক আছে। কাঁদবে কখন?'

'কে'দে উঠলাম' যখন এতটুকু ইচ্ছে হচ্ছিল নে কাঁদবার। হালকা একটু সুরাপানের পর যেমন হয় তেমনি একটা উচ্ছল খুশিতে তখন মন ভরে উঠেছে হঠাৎ। ইচ্ছে হচ্ছিল গান গেয়ে উঠি, হাসিতে আনন্দে লাফালাফি করি। মনে হচ্ছিল চমৎকার সব লোক এরা — ক্রাফৎশ্তুদৎ, বক্লৎস, ডেনিস ডাক্তার সবাই — ভারি ভালো লোক। আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড ইচ্ছা খাটিয়ে আমি ফোঁপাতে লাগালাম; আমার এ কান্না একান্ত অপ্রতুল হলেও প্রত্যয় জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট; ডাক্তারকে মন্তব্য করতে হল:

'একেবারেই উল্টোপাল্টা। স্বাভাবিক স্পেকট্রামের সঙ্গে কোনো মিল নেই। একে নিয়ে ভুগতে হবে দেখছি।'

'কিন্তু কতদূরে সেই ১৩০ ফ্রিকোয়েন্সি ?' আতঙ্কে ভাবতে শুরু করলাম আমি দিলখোলা ফুর্তির ভাবটার জায়গায় তখন দেখা দিয়েছে কেমন

একটা দুশ্চিন্তা, অকারণ আশঙ্কা, আসন্ন সর্বনাশের একটা অনুভূতি . . তখন কিন্তু গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে লাগলাম আমি যন্ত্রের মতো, বিনা ভাবনায় অথচ বুকের মধ্যে তখন সাংঘাতিক, অমোঘ, মারাত্মক কিছু একটার দুর্ভাবনায় ঢিপ ঢিপ করছে।

যন্ত্রণা উদ্রেকের ফ্রিকোয়েন্সিটা কাছাকাছি আসতেই তা টের পেলাম। প্রথমটা আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের হাড়গুলোতে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা দেখা গেল। তারপর লড়াইয়ের সময় যে জায়গাটায় জখম হয়েছিলাম, সেই পুরনো জখমটা যেন ছিঁড়ে গেল একটা তীক্ষ্ম যন্ত্রণায়। তারপরেই শুরু হল একটা ভয়ংকর দাঁতের যন্ত্রণা, সমস্ত দাঁতেই তা ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে মাথা-ছিঁড়ে-যাওয়া ব্যথা।

কানের মধ্যে ঝাপটা মারতে লাগল রক্ত। সইতে পারব কি? এই দানবিক যন্ত্রণাটাকে সইতে পারার মতো, কোনো রকমেই তা প্রকাশ না করার মতো যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি কি আমার থাকবে? নির্যাতন কক্ষে যন্ত্রণা সইতে সইতে লোকে প্রাণ দিয়েছে অথচ একটিবারও কাৎরে ওঠেনি এ রকম ঘটনা তো কম শোনা যায়নি। জীবন্ত দগ্ধ হবার সময়ও লোকে মুখ বুজে থেকেছে এমন ঘটনা তো আছে ইতিহাসে . .

ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত আমার গোটা দেহের হাড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা ছিঁড়ে যাওয়া, ফুঁড়ে যাওয়া, থেঁতো করা, মড়মড়ে, টনটনে, দপদপে যন্ত্রণা। প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম আমি, চোখে তারা দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোনো শব্দ করলাম না মুখ দিয়ে।

'কী রকম লাগছে রাউথ?' ফের যেন কোন মাটির গভীর থেকে ভেসে এল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর:

'একটা অন্ধ বন্য ক্রোধ,' দাঁতের ফাঁকে চেপে বললাম আমি। 'যদি একবার আপনাদের হাতে পেতাম...'

'আরো দেখা যাক। একেবারে অস্বভাবিক। সবই এর উল্টো।'

প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছি তখন, আর্তনাদ করে উঠব, গোঙিয়ে উঠব, এমন সময় হঠাৎ অদৃশ্য হল সব ব্যথা। সারা গায়ে দেখা দিল আঠা আঠা ঠান্ডা ঘাম। থর থর করছিল সমস্ত পেশী।

তারপর, কী একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে চোখ ধাঁধানো একটা আলো দেখলাম,

চোখ বন্ধ করলেও তা থেকে রেহাই নেই। তারপর একটা ঝাক্ষুসে খিদে পেল, একপশলা কর্ণভেদী কোলাহল শুনতে পেলাম একসময়, তারপর ভয়ানক শীত করতে লাগল, যেন একেবারে নগ্ন গায়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছি। কিন্তু ক্রমাগত ভুল জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম ডাক্তারকে, একেবারে ক্ষেপিয়ে তুললাম তাকে।

জানতাম এখনো একটা ভয়ংকর পরীক্ষা বাকি আছে আমার — আগের দিন ওয়ার্ডে যা তারা বলাবলি করছিল — ইচ্ছাশক্তি লোপ। এতক্ষণ পর্যন্ত সব সয়ে এসেছি কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে আমার উৎপীড়ক কৃত্রিমভাবে যে সব অনুভূতি জাগাচ্ছে তাকে দমন করতে পেরেছি কেবল এই আভ্যন্তরীণ শক্তিটার সাহায্যে কিন্তু ঐ শয়তান প্রেরণা জেনারেটর দিয়ে শিগগিরই এই ইচ্ছাশক্তির পেছনে লাগবে। কেমন করে ওরা ধরতে পারবে যে আমার ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছে? আতঙ্কে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটার অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্ত এল

হঠাৎ সবকিছু কেমন নিস্পৃহ লাগতে লাগল। ক্রাফৎশ্তুদৎ দঙ্গলটার হাতে যে পড়েছি তাতে কিছুই এসে যায় না, তার চারপাশের লোকের জন্যেও কিছু এসে যায় না, নিজের কী হবে তাতেও নয় একেবারে শূন্য হয়ে গেল মন শিথিল বোধ হতে লাগল পেশীগুলোকে সমস্ত অনুভূতি যেন উধাও হল। দৈহিক ও মানসিক মেরুদণ্ডহীনতার এক পরিপূর্ণ অবস্থা সেটা কিছুতেই কোনো মানসিক চাঞ্চল্য জাগে না, ভাবতে ইচ্ছে হয় না, এতটুকু নড়া চড়া করার শক্তিও নেই। ভয়ানক কেমন একটা ইচ্ছেহীনতা, তাতে যা খুশি করতে পারা যায় লোককে নিয়ে।

তাহলেও, চেতনার কোন এক গহন কোণে যেন বেঁচে রইল শুধু একটা চিন্তার ঝলক, অবিরত তা বলে যাচ্ছিল, 'দরকার ... দরকার ... দরকার ...'

কী দরকার? কীসের জন্য? কেন? 'দরকার ... দরকার ... দরকার ...' বলে চলল যেন একটা একক স্নায়ুকোষ, কী এক দৈবচক্রে যেন সেখানে পৌঁছতে পারেনি সর্বশক্তিমান এই বিদ্যুৎ-চুম্বক প্রেরণা যা আচ্ছন্ন করেছে আমার সমস্ত স্নায়ুকে, জল্লাদেরা যা চাইছে তাই অনুভব করতে বাধ্য করছে তাদের।

ব্যাপারটা বুঝেছিলাম পরে, মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় এনসেফেলিক

ব্যবস্থার তত্ত্বটা জানার পর। এই তত্ত্বে বলে যে কর্টেক্সে অবস্থিত সমস্ত স্নায়ুকোষ শাসিত হয় একগুচ্ছ কেন্দ্রীয়, পরিচালক কোষ দ্বারা, বাইরে থেকে চালিত সবচেয়ে শক্তিশালী পদার্থিক ও রাসায়নিক প্রভাবেও এই সর্বোচ্চ মানসিক কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে তখন বেঁচেছিলাম নিশ্চয় এই কারণেই।

হঠাৎ হুকুম শোনা গেল ডাক্তারের:

'ফ্রাফৎশ্তুদতের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন আপনি.'

আমি বললাম:

'করব না।'

'আমরা যা হুকুম করব তা পালন করবেন আপনি।'

'করব না।'

'দেয়ালে মাথা ঠুকুন।'

'না।'

'আরো দেখা যাক। অস্বাভাবিক টাইপ ফ্যাফফ, তবে নিস্তার পাবে না।'

ইচ্ছাশক্তি লোপের ভান করলাম ঠিক যখন একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির বন্যায় আমার সমস্ত সত্তা ভরে উঠল, মনে হচ্ছিল কোনো অসম্ভবই আমার অসাধ্য নয়।

'স্বাভাবিক' স্পেকট্রাম থেকে আমার এই বিচ্যুতিটা যাচাই করে নিয়ে ডাক্তার এই ফ্রিকোয়েন্সিতে থামল।

'জনগণের সুখের জন্য যদি জীবন দিতে হয় তাহলে জীবন দেবেন?'

'কী দরকার?' বললাম নীরস গলায়।

'আত্মহত্যা করতে পারেন?'

'পারি।'

'যুদ্ধাপরাধী ওবের-শ্তার্মফুয়েরার ফ্রাফৎশ্তুদৎকে খুন করতে চান আপনি?'

'কী দরকার?'

'আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন আপনি?'

'করব।'

'শয়তান জানে কী ব্যাপার! এমন টাইপ দেখলাম এই প্রথম এবং সম্ভবত এই শেষ। ইচ্ছাশক্তি লোপ ১৭৫ চক্রে, টুকে রাখুন। এবার আরো দেখা যাক.'

এই ভাবে আরো আধঘণ্টা খানেক চলল শেষ হল আমার স্নায়ু ব্যবস্থার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম। আমার মধ্যে কোন কোন মেজাজ বা অনুভূতি উদ্রেক করাতে হলে কোন কোন ফ্রিকোয়েন্সি দরকার তা সবই জানা হল ডাক্তারের। অন্তত ভাবল যে সে জেনেছে। আসলে একমাত্র সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি হল যেটায় আমার গাণিতিক ক্ষমতা উত্তেজিত হয। আর আমারও সবচেয়ে দরকার এইটেই। আসলে এই দুর্বৃত্ত ফার্মটাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা ফেঁদে রেখেছিলাম আমি। আর গণিত হবে আমার ডিনামাইট।

VI

সবাই জানে হিপনোসিস ও সাজেসশন, সম্মোহন ও অভিভাবন সবচেয়ে ভালো খাটে তাদের ওপর, যাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। ঠিক এই ব্যাপারটাই কাজে লাগিয়েছিল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির লোকেরা। তারই প্রভাবে পরিগণকদের মধ্যে 'গুরুর' প্রতি বাধ্যতা ও সভয় কৃতজ্ঞতার বোধ প্রবেশ করিয়ে দেয় তারা।

আমাকেও একটা 'বাধ্যতা' পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে যেতে হত, কিন্তু আমার অস্বাভাবিক স্পেকট্রামের ফলে তা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রইল. আমার জন্যে দরকার একটা বিশেষ ব্যবস্থা।

আমার জন্যে একটা আলাদা জায়গা ঠিক হচ্ছিল কাজের। তার ফলে গতিবিধির একটু আপেক্ষিক স্বাধীনতা মিলল আমার। ওয়ার্ড ছেড়ে বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করতে পারতাম আমি, আমার সহকর্মীরা যেখানে পড়াশুনো বা কাজ করত সেই ক্লাসঘরেও উঁকি দিতে পারতাম।

প্রতিদিন সকালে একটা বিরাট অ্যালুমিনিয়ম কনডেন্সরের দেয়ালের মধ্যে সমবেত প্রার্থনার আয়োজন হত, আধঘণ্টার জন্যে ক্রাফৎশ্‌তুদতের বন্দীরা ফার্মের কর্তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করত। ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি না থাকায় ব্রডকাস্টে প্রচারিত কথাগুলোর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি করে যেত তারা।

'আত্মজ্ঞানেই আনন্দ ও সুখ,' বেতারে ঘোষণা করত একটি কণ্ঠস্বর।

'আত্মজ্ঞানেই আনন্দ ও সুখ।' নতজানু হয়ে বসা বারোটি মানুষ সমস্বরে প্রতিধ্বনি করত। দেয়ালের অভ্যন্তরে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে তাদের ইচ্ছাশক্তি আর কিছু নেই তখন।

'নিউরোন সিন্যাপ্‌স্‌-এর ওপর প্রেরণা সঞ্চালনের রহস্য করে আমরা আনন্দ ও সুখ লাভ করি।'

' আনন্দ ও সুখ লাভ করি।' পুনরাবৃত্তি করত কোরাস।

'কী সৌভাগ্য যে সবই এত সরল! প্রেম ভয় যন্ত্রণা হিংসা ক্ষুধা দুঃখ আনন্দ — এ সবই আমাদের দেহে বিদ্যুৎ রাসায়নিক প্রেরণার সঞ্চালন মাত্র — কী অপরূপ এই জ্ঞান!'

'... অপরূপ এই জ্ঞান ...'

'এই মহাসত্য যে জানে না, তার কপাল মন্দ।'

...'মহাসত্য ...' একঘেয়ে প্রতিধ্বনি করত ইচ্ছাশক্তিহীন দাসেরা।

'এ সুখ আমাদের এনে দিয়েছেন আমাদের গুরু ও ত্রাতা হের ক্রাফংশ্‌তুদৎ!'

'... সুখ ...'

'আমাদের জীবন দিয়েছেন তিনি।'

'আমাদের জীবন দিয়েছেন তিনি।'

এই উদ্ভট প্রার্থনাটা আমি শুনতাম একটা ক্লাসঘরের কাচের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে।

নিশ্চল শিথিল দেহে অর্ধমুদ্রিত নয়নে লোকগুলো এই ভুতুড়ে শ্লোক আবৃত্তি করে যেত নির্বিকার গলায়। কয়েক পা দূরের ইলেকট্রিক জেনারেটরটা জোর করে তাদের প্রতিরোধহীন মনের মধ্যে বাধ্যতা গেঁথে দিত। সব ব্যাপারটাই কেমন অমানুষিক, চূড়ান্ত রকমের জঘন্য, গড্ডলিকাসুলভ, সেই সঙ্গে আশ্চর্য নিষ্ঠুর। ইচ্ছাহীন এই নরাকার দলটাকে দেখে আপনা থেকেই মনে ভেসে উঠত কেবল শোচনীয় মদ্যপ ও নেশাখোরদের কথা।

প্রার্থনার পর এই বারোটি বলি চলে যেত একটা প্রশস্ত হলঘরে, দেয়াল বরাবর সেখানে বারোটি লেখার টেবিল। প্রতিটি টেবিলের ওপর অ্যালুমিনিয়মের ছাতার মতো একটা প্লেট — বিরাট কনডেন্সরের অংশ এগুলি। দ্বিতীয় প্লেটটা সম্ভবত মেজের নিচে।

হলটাকে দেখে মনে হত একটা খোলা হাওয়ার কাফের মতো, প্রতি টেবিলের ওপরে যেখানে একটা করে চাঁদোয়া। কিন্তু সে চাঁদোয়ার নিচে মানুষগুলোকে দেখা মাত্র এ কাব্যিক ধারণাটা একেবারে উড়ে যেত।

প্রতি টেবিলে থাকত একটা করে কাগজ, তাতে অংকটা লেখা আছে। প্রথম প্রথম এই অঙ্কগুলোর দিকে এরা তাকাত বিহ্বলের মতো। বোঝা যায় ইচ্ছাশক্তি লোপের ফ্রিকোয়েন্সির প্রভাবটা তখনো কাটেনি। তারপর ৯৩ চক্রের ফ্রিকোয়েন্সি চালানো হত এবং বেতার যোগে হুকুম হত কাজ শুরু করার।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম টেনে দ্রুত কলম চালাতে থাকত এরা সবাই। একে কাজ বলা চলে না। এ একটা ক্ষেপামি, একটা গাণিতিক মূর্ছা। কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে আঁকুপাঁকু করত লোকগুলো, এত দ্রুত হাত চলত যে বোঝাই যেত না কি লিখছে। পরিশ্রমে বেগুনী হয়ে উঠত তাদের মুখ, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসত চোখ।

এটা চলত প্রায় ঘণ্টা খানেক। তারপর যখন তাদের হাতের গতি তির্যক্ ও বিক্ষিপ্ত হতে থাকত, মাথা নুয়ে পড়ত একেবারে টেবিলের ওপর, বাড়িয়ে দেওয়া ঘাড়ের ওপর সাপের মতো ফুটে উঠত শিরা, তখন জেনারেটর চালানো হত আটের চক্রে, অমনি গভীর ঘুমে ঢলে পড়ত এই বারো জন। ক্রাফৎশ্‌তুদৎ নজর রাখত যাতে তার দাসেরা কিছুটা মানসিক বিশ্রাম পায়!

এরপর আবার শুরু হত গোড়া থেকে।

একদিন এই গাণিতিক উন্মাদনা লক্ষ্য করছি, হঠাৎ দেখলাম একজন হিসাব কষিয়ে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ থেমে গেল তার লেখা, পাগলের মতো তাকাল তার পাশের একজন ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র সহকর্মীর দিকে, ফাঁকা চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ যেন কী একটা জিনিস কিছুতেই মনে পড়ছে না।

তারপর একটা ভয়ঙ্কর হেঁড়ে গলায় আর্তনাদ করে সে তার জামা কাপড় টেনে ছিঁড়তে লাগল। নিজেকে কামড়ে আঙুলগুলোকে চিবুতে লাগল, বুকের চামড়া খামচে খামচে মাথা ঠুকতে লাগল টেবিলে। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়ে টলে পড়ল মেজের ওপর।

অন্য পরিগণকেরা সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর দিলে না। ক্ষিপ্তের মতোই কাজ করে চলল তাদের পেনসিল।

এ দৃশ্যে এমন ক্ষেপে উঠেছিলাম আমি যে বন্ধ দরজার ওপর ধাক্কাতে শুরু করি। ইচ্ছে হচ্ছিল এই হতভাগ্য লোকগুলোকে ডাক দিয়ে বলি, আর নয় যথেষ্ট হয়েছে, সবকিছু ভেঙে চুরে ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমাদের উৎপীড়কদের ওপর . .

'অত উত্তেজিত হবেন না, হের রাউখ,' একটা শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল আমার পাশে। লোকটা বলৎস।

'আপনারা সব জল্লাদ! দেখুন কী দশা করেছেন মানুষের! এদের নির্যাতন করার কী অধিকার আছে আপনাদের?'

তার সেই মৃদু বিদগ্ধ হাসি হেসে বললে বলৎস:

'ইউলিসিসের সেই গল্প জানেন তো? দেবতারা তাকে বেছে নিতে বলেছিল — একটা দীর্ঘ শান্ত জীবন নাকি একটা স্বল্প, উদ্দাম জীবন। স্বল্প উদ্দাম জীবনটাই বেছেছিল ইউলিসিস। এরাও তাই।'

'কিন্তু এরা নিজেরা তো কিছুই বেছে নেয়নি। আপনাদের ডিভিডেন্ডের জন্য আপনারাই আপনাদের প্রেরণা জেনারেটরের সাহায্যে লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আত্মহননের দিকে!'

হেসে উঠল বলৎস।

'আপনি তো শুনেছেন ওরা নিজেরাই বলে যে ওরা সুখী। সত্যিই সুখী ওরা। দেখুন কেমন তন্ময় হয়ে ওরা কাজ করছে। সৃজনশীল শ্রমেই তো সুখ, তাই না?'

'আপনার এ যুক্তি আমার কাছে কদর্য বোধ হয়। মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক কর্মছন্দ আছে, সেটা বাড়ানর যে-কোনো চেষ্টা অপরাধ।'

ফের হেসে উঠল বলৎস।

'আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত হল না প্রফেসর। এক সময় লোকে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে যেত। এখন যায় জেট প্লেনে। আগে খবর ছড়াত মুখে মুখে, লোকে লোকে, শম্বুক গতিতে পৃথিবীময় ছড়াতে লেগে যেত কয়েকবছর: এখন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে লোকে সে খবর পেয়ে যাচ্ছে বাড়ির রেডিওয়। বর্তমান সভ্যতা জীবনের ছন্দ বাড়িয়ে তুলছে এবং সেটাকে আপনি অপরাধ গণ্য করেন না। তাছাড়া কৃত্রিমভাবে আমোদপ্রমোদ বিনোদনের যত ব্যবস্থা রয়েছে — তাও জীবনের ছন্দ বাড়িয়ে তুলছে না কি? তাহলে একটা

জীবন্ত দেহযন্ত্রের কাজের ছন্দকে কৃত্রিমভাবে বাড়ালে তাকে অপরাধ ভাবছেন কেন? এই লোকগুলো এখন যা করছে, স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটালে তার লক্ষ ভাগের একভাগও যে সম্পূর্ণ করতে পারত না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর জানেনই তো, জীবনের অর্থ হল সৃজনী ক্রিয়া। ওদেরই একজন যখন আপনি হবেন তখন তা পুরো হৃদয়ঙ্গম করবেন আপনি। সুখ আর আনন্দ কী জিনিস তা শিগগিরই জানবেন আপনি। বলতে কি, দু দিনের মধ্যেই। আপনার জন্যে একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানে একলা কাজ করবেন আপনি, কারণ, মাপ করবেন, আপনি স্বাভাবিক লোকেদের চেয়ে খানিকটা অন্যরকম।'

গায়ে পড়া ভাবে কাঁধে চাপড় মেরে বলৎস চলে গেল, আমি রইলাম তার অমানুষিক দর্শন নিয়ে ভাবনা করতে।

৬

আমার 'স্পেকট্রাম' অনুসারে আমাকে 'মানুষ করতে' তারা শুরু করল সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে যাতে যে কোনো কীর্তি দেখাবার মতো ইচ্ছাশক্তি দেখা দিত আমার মধ্যে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি লোপের ভান করার মতো কৃতিত্বটা অনায়াসেই অর্জন করা গেল। হাঁটু গেড়ে বসে যথাসম্ভব শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকতাম আমি, রেডিও যোগে প্রচারিত ক্রাফৎশ্‌তুদৎ প্রশস্তির পুনরাবৃত্তি করে যেতাম। একেবারে আনকোরা বলে, প্রার্থনা ছাড়াও নিউরোকিবারনেটিক বিদ্যার কিছু কিছু তত্ত্বও আমাকে শেখানো হল। কোন কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কোন কোন আবেগ দেখা দেয় প্রধানত সেইটে মনে রাখাই এই উদ্ভট শিক্ষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। আমার পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ জরুরী ছিল দুটি ফ্রিকোয়েন্সি: যেটাতে গাণিতিক চিন্তার উত্তেজনা হয়, এবং আর একটি, যেটি সৌভাগ্যবশত ৯৩ চক্র থেকে বেশি দূরে নয়।

এক সপ্তাহ শিক্ষা চলল আমার, ধরা হল এবার আমি কাজে লাগার মতো যথেষ্ট বাধ্য হয়েছি। প্রথম যে হিসাবটা আমায় দেওয়া হল সেটা একটা আন্তর্মহাদেশীয় রকেটকে জমির উপর শূন্যেই বিধ্বস্ত করার সম্ভাবনা নিয়ে।

করতে লাগল ঘণ্টা দুয়েক; প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের পক্ষে তার ফলটা খুব

10-83

আহ্লাদজনক হবার কথা নয়। কেননা, যে সব পরিস্থিতি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তাতে তা করা যায় না।

দ্বিতীয় সমস্যাটাও সামরিক এটা হল প্রতিপক্ষের পরমাণু বোমা ধ্বংসের জন্যে একটা নিউট্রোন গুচ্ছের একটা হিসাব। এর জবাবটাও সুখকর হল না। যেসব হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে একটা নিউট্রোন কামান গড়তে হলে তার ওজন হবে কয়েক হাজার টন।

এই সব সমস্যা সমাধান করতে আমার বাস্তবিকই আনন্দ হচ্ছিল এবং অন্য সকলের মতোই উন্মাদনাগ্রস্ত বলে আমায় দেখিয়েছিল নিশ্চয়, তবে একটা তফাৎ ছিল, জেনারেটর যে ফ্রিকোয়েন্সিতে চলল, তাতে একটা বাধ্য ক্রীড়নক হবার বদলে আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। ঘুমের জন্যে বিরতির সময়েও আত্মশক্তি ও ভরসার একটা সানন্দ অনুভূতি আমায় ছেড়ে যায়নি। ঘুমের ভান করছিলাম আমি, কিন্তু আসলে প্রতিশোধের পরিকল্পনাটা গড়ে তুলছিলাম।

সমর দপ্তরের অংকগুলো কষার পর মনে মনে (কেউ যেন না জানে) কষতে লাগলাম আমার নিজস্ব অংকটা -- ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানিকে কী করে ভিতর থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

উড়িয়ে দেবার কথাটা বলছি অবশ্য রূপকে, কেননা ডিনামাইট, টিএনটি, কিছুই আমার কাছে ছিল না, এই পাগলা গারদের পাথুরে জেলখানাটায় তা পাবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। অন্য একটা মৎলব ছিল আমার।

ঠিক করলাম, প্রেরণা জেনারেটর যখন যে কোনো মানবিক আবেগের উদ্রেক করতে পারে, তখন এই হতভাগ্যদের মনে মানবিক মর্যাদা বোধ জাগাবার জন্যে তা ব্যবহার করার চেষ্টা করা যাক না? প্রাক্তন নাজী অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত হয়ে উঠুক ওরা। সেক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক ডাকাতদের চূর্ণ করতে বাইরের কোনো সাহায্যও লাগবে না। কিন্তু তা কি করা যায়? অর্থাৎ, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে গাণিতিক চিন্তা উত্তেজিত হয় তাকে এমন একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে বদলে দেওয়া যাতে মানুষের মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণা জেগে ওঠে -- এ কি করা সম্ভব?

জেনারেটরটা চালাতে তার বৃদ্ধ স্রষ্টা ডাঃ প্ফাফ্‌ফ্ -- ইনি বোঝা যায় ধর্ষকামী প্রবৃত্তির লোক, নিজের সৃষ্টির ব্যভিচারেই যার আনন্দ। তার

ইঞ্জিনিয়রিং কীর্তির লক্ষ্যই হল তা মানুষের নিপীড়নে উপভোগ করা। তার কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রত্যাশা একেবারে বৃথা। ওকে আমার হিসাবের বাইরেই রাখতে হল. আমার বাঞ্ছিত ফ্রিকোয়েন্সিতে জেনারেটরটা চালাতে হবে তার সাহায্য ছাড়াই, তার ইচ্ছা বিনা

প্রেরণা জেনারেটরে যদি বেশি ভার চাপানো যায়, অর্থাৎ ডিজাইনে যা আছে তার চেয়ে বেশি শক্তি যদি টানা হয়, তাহলে তার ফ্রিকোয়েন্সি প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত নেমে যায়। এর অর্থ রেজিস্টেন্স হিসাবে একটা বাড়তি লোড যোগ করলে জেনারেটর ডায়েলে যে ফ্রিকোয়েন্সি দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে চলবে।

ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানি ৯৩ চক্রের ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে গাণিতিক চিন্তাকে কাজে লাগায়। ক্রোধ ঘৃণা উত্তেজিত হয় ৮৫ চক্রের ফ্রিকোয়েন্সিতে। তার মানে ৮ ফ্রিকোয়েন্সি কমালেই চলবে! তার জন্যে কী পরিমাণ বাড়তি লোড দরকার হতে পারে, সেই হিসেব করতে লাগলাম আমি।

টেস্ট ল্যাবরেটরিতে আমায় যখন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন ভোল্টমিটার আর অ্যামমিটারের কাঁটা লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। এ দুইয়ের গুণফলই হল জেনারেটরের শক্তি। বাকি রইল কেবল কতটা বাড়তি ভার চাপানো দরকার সেই গাণিতিক হিসেবটা ...

প্রথমে মনে মনে ছবিটা স্পষ্ট করে নিলাম: যে বিরাট বিরাট কনডেন্সরের ভেতরে এই সব বেচারারা ভূতের বেগার খেটে যায় সেগুলো জেনারেটরের সঙ্গে ঠিক কী ভাবে সংযুক্ত। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমি মনে মনে ম্যাকসওয়েল সমীকরণটা কষে নিলাম, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব জটিল হিসাবও কষে ফেলা গেল

দেখা গেল মাত্র দেড় ওয়াট শক্তিই উদ্বৃত্ত রয়েছে হের শ্‌ফাফ্‌ফের!

সুতরাং ৯৩ ফ্রিকোয়েন্সি ৮৫ ফ্রিকোয়েন্সিতে নামিয়ে আনার হিসাবটায় আর অসুবিধা হল না। দরকার শুধু ১,৩৫০ ওম রেজিস্টেন্স, একটা কনডেনসর চাকতির সঙ্গে তা যোগ করে আর্থ করতে হবে।

আনন্দে চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ঐ রেজিস্টেন্সের মাপ অনুযায়ী একটা তার পাই কোথা থেকে? রেজিস্টেন্সটা খুবই সঠিক হওয়াও দরকার, নয়ত ফ্রিকোয়েন্সি বদলে যাবে আর বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে না।

ক্ষিপ্তের মতো মনে মনে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম নানা রকম সব ফন্দি, কিন্তু কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না। একটা অক্ষমতার জ্বালায় মন ভরে উঠেছে, দুই হাতে মাথা চেপে অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠার ইচ্ছে হচ্ছিল এমন সময় চোখে পড়ল কাঁপা কাঁপা হাতে আমার টেবিলের ওপর একটা কালো প্লাস্টিকের কাপ রেখে গেল কে যেন। তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠি আর কি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভীতচক্ষু রোগা মেয়েটি, ক্লাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির ডাক নিয়ে যে এসেছিল আমার বাড়িতে।

'কী করছেন এখানে?' জিজ্ঞেস করলাম চাপা গলায়।

'কাজ করছি।' ঠোঁট তার প্রায় নড়ল না। 'আপনি তাহলে বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে আমার খুব দরকার।'

শংকায় চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল তার।

'শহরের সবার ধারণা আপনি খুন হয়েছেন। আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'শহরে যান আপনি?'

'যাই, প্রায় প্রত্যেক দিনই, কিন্তু...'

আমি তার ছোট্ট হাতখানা চেপে ধরলাম।

'শহরের সবাইকে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বলবেন যে আমি বেঁচে আছি, জোর করে আমায় খাটাচ্ছে এখানে. এখান থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আমার বন্ধুদের এবং আমার সাহায্য প্রয়োজন।'

মেয়েটির চোখে আতংক ফুটে উঠল।

'বলছেন কী আপনি!' ফিসফিসিয়ে বললে সে, 'হের ক্লাফৎশ্‌তুদৎ যদি জেনে ফেলেন, আর সবই উনি জানতে পারেন...'

'কীরকম ঘন ঘন আপনাকে জেরা করা হয়?'

'পরশু জেরার দিন।'

'তার মানে পুরো একটা দিন হাতে আছে। সাহস রাখুন, ভয় নেই। অনুরোধ করছি যা বললাম করুন।'

সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে গেল মেয়েটা

টেবিলে যে কাপটা সে রেখে গিয়েছিল সেটা পেনসিলের কাপ। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন রঙের দশটা পেনসিল। কিছুই না ভেবে প্রথম

পেনসিলটা তুলে নিয়ে নাড়তে লাগলাম '২বি' মার্কা — খুব নরম পেনসিল। এতে গ্রাফাইট আছে অনেক, বিদ্যুৎ পরিবহন করে ভালো। '৩বি' '৫বি' পেনসিলও রয়েছে। তারপর 'এইচ' মার্কা শক্ত জাতের পেনসিল — এগুলো কপি করার জন্যে। পেনসিলগুলো নাড়া চাড়া করতে করতে আমার মস্তিষ্ক পাগলের মতো সক্রিয় হয়ে উঠল। তারপর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎ মনে পড়ে গেল পেনসিল গ্রাফাইটের রেজিস্টেন্স কত: '৫ এইচ' একটা পেন্সিলের রেজিস্টেন্স ২,০০০ ওম। সঙ্গে সঙ্গে '৫ এইচ' একটি পেনসিল তুলে নিলাম। ম্যাকসওয়েল সমীকরণের শুধু গাণিতিক নয়, ব্যবহারিক সমাধানও মিলে গেল। হাতে আমার কাঠে ঢাকা এমন এক টুকরো গ্রাফাইট যা দিয়ে আধুনিক বর্বরদের একটা গোটা দলকে খতম করে দেব।

অমূল্য একটা সম্পদের মতো সাবধানে কোটের ভেতরের পকেটে লুকিয়ে রাখলাম পেনসিলটা। ভাবতে লাগলাম দু টুকরো তার পাওয়া সম্ভব কোত্থেকে — একটা তার দিয়ে কনডেন্সর চাকতিটাকে সংযুক্ত করতে হবে, অন্যটা লাগাতে হবে কোণের ঘর গরমের পাইপের সঙ্গে। মাঝখানে থাকবে গ্রাফাইটটা।

মনে পড়ে গেল, যে ওয়ার্ডে আমি এবং অন্যান্য পরিগণকেরা থাকি সেখানে একটা টেবিল ল্যাম্প আছে। এর তারের দড়িটা লম্বায় প্রায় দেড় মিটার এবং নমনীয়। তার মানে সরু সরু অনেক তার দিয়ে তা গড়া। ওপরের আবরণটা কেটে তা থেকে মিটার দশেক লম্বা সরু তার বেশ বানানো যায়। আমার কাজের পক্ষে সেটা যথেষ্ট।

হিসেবগুলো সবে শেষ করেছি এমন সময় মাইকে ঘোষিত হল, দিবাভোজনের সময় হয়েছে।

আমার একক কক্ষ ছেড়ে খুশি মনে চললাম ওয়ার্ডের দিকে। করিডরে তাকিয়ে দেখলাম ডাক্তার মুখ ব্যাজার করে আমার কষা সমাধানগুলো দেখছে। বোঝা যায় যে আন্তর্মহাদেশীয় রকেটকে ঠেকাবার উপায় নেই বা শত্রুর পরমাণু-বোমাকে নিউট্রোন কামান দিয়ে বিস্ফোরিত করা সম্ভব নয় সেটা তার মনঃপূত হয়নি।

কিন্তু একটা কপি পেনসিলের সাধারণ গ্রাফাইট দিয়ে যে কী করা সম্ভব তার কোনো ধারণাই তার ছিল না!

যে টেবিল ল্যাম্পটার কথা ভেবেছিলাম সেটা কেউ ব্যবহার করত না। কোণে একটা উঁচু টুলের ওপর বসান ছিল সেটা, ধুলোভরা, দাগ ফুটকিতে কলঙ্কিত। তারের লেজটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে জড়ানো।

ভোরবেলায় ঘরের লোকেরা যখন মুখ হাত ধুতে গেছে তখন তারটা আমি খাবার টেবিলের ছুরি দিয়ে কেটে পকেটে ভরলাম — প্রাতরাশের সময় একটি ছুরি পকেটস্থ করা গেল। তারপর প্রার্থনার জন্যে সবই চলে গেলে আমি পায়খানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওপরের ইনসুলেশনের আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে মিটার দেড়েক লম্বা সরু সরু তার পাওয়া গেল একগুচ্ছ। তারপর সাবধানে পেনসিলটা ভেঙে তার গ্রাফাইট শিষটা বার করলাম এবং দশভাগের তিনভাগ পরিমাণ দৈর্ঘ্য ভেঙে ফেললাম। বাকি অংশ যা রইল সেটার রেজিস্টেন্স হবে ঠিক আমি যা চাই। তারপর গ্রাফাইটের দুই প্রান্তে দুটো খাঁজ কেটে তার জুড়ে দেওয়া গেল। রেজিস্টার তৈরি। বাকি রইল এখন একপ্রান্ত কনডেন্সর প্লেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা আর অন্য প্রান্তটিকে আর্থ করা।

সেটা করা দরকার আমার কাজের মধ্যে।

পরিগণকদের কাজের দিন আট ঘণ্টা, প্রতি ঘণ্টার পর দশ মিনিট করে বিরতি। একটার সময়, লাঞ্চের ছুটির পরে সাধারণত পরিগণকদের কাজের ঘরে দর্শন দেয় ফ্রাফৎশ্তুদৎ কোম্পানির কর্মকর্তারা। গাণিতিক যন্ত্রণায় বারোটা লোক আঁকুপাঁকু করছে এ দৃশ্যটা উপভোগ করতে ফার্মের কর্তার খুব ভালোই লাগে বোঝা যায়। ঠিক করলাম, ফ্রিকোয়েন্সি বদলে দেবার সেই হবে উপযুক্ত সময়।

সেদিন সকালে কাজের জায়গায় গেলাম পকেটে তৈরি রেজিস্টার নিয়ে চমৎকার মেজাজে। আমার কাজের ঘরের দরজায় দেখা হয়ে গেল ডাক্তারের সঙ্গে। নতুন অংক নিয়ে এসেছে সে।

আমি ডেকে বললাম, 'এই যে বদ্যি, এক মিনিট।'

ডাক্তার থেমে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে আমায় হতভম্বের দৃষ্টিতে।

'একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'কী কথা?' আশ্চর্য হয়ে বললে সে।

বললাম, 'ব্যাপারটা এই কাল কাজ করবার সময় মনে হল, হের বলৎসের সঙ্গে প্রথমে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটা ফের তোলা ভালো। চটাচটি করে আমার খারাপই হয়েছে। আপনি বলৎসকে জানিয়ে দেবেন যে আমি ক্রাফৎশ্‌তুদৎ ফার্মের নতুন ভর্তিদের জন্যে শিক্ষকতার কাজ করতে রাজী আছি।'

অকপটেই ডাক্তার ঘোষণা করলে:

'সত্যি বলছি, ভারি আনন্দ হল। আমি এদের বলেছিলাম, তোমার যা স্পেকট্রাম তাতে এই গাণিতিক দঙ্গলটার ওপর পরিদর্শক বা শিক্ষকের কাজই সবচেয়ে ভালো। ভালো একজন পরিদর্শক আমাদের খুবই দরকার। তার জন্যে তুমিই সবচেয়ে যোগ্য লোক। তোমার কাজের ফ্রিকোয়েন্সি একেবারেই অন্য রকম। যারা আলসেমি করে কাজ করছে বা যাদের গাণিতিক উত্তেজনার অনুরণন হচ্ছে না, তাদের তাড়া দিতে পারো তুমি সোজাসুজি ওদের মধ্যেই থেকেই '

'তা ঠিক ডাক্তার, তবে আমার মনে হয় নতুন ভর্তিদের অঙ্ক শেখাবার কাজই আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। ঈস! কয়েকদিন আগে যা দেখেছি, সে রকম ভাবে টেবিলে মাথা ঠুকে মরার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'বুদ্ধিমানের মতোই সিদ্ধান্ত করেছ,' বললে সে, 'ক্রাফৎশ্‌তুদৎ-এর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমার মনে হয় তিনি রাজী হবেন।'

'আর ফল জানতে পাব কবে?'

'আশা করি আজ বেলা একটার সময়, যখন পরিগণনা কেন্দ্রে হাজিরা দিয়ে কাজ দেখা শোনা করা হয়।'

'বেশ, অনুমতি দিলে তখন আপনাদের কাছে আসব আমি।'

মাথা নেড়ে চলে গেল ডাক্তার। টেবিলের ওপর দেখলাম একটা কাগজ, তাতে নতুন একটা প্রেরণা জেনারেটরের জন্য হিসেব কষার তথ্যাদি দেওয়া আছে — এটা হবে বর্তমানটার চেয়ে চতুর্গুণ শক্তিশালী। বোঝা গেল, ক্রাফৎশ্‌তুদৎ তার কারবার বাড়াতে চাইছে চারগুণ। ও চাইছে তার এই পরিগণনা কেন্দ্রে তের জন নয়, বাহান্ন জন কাজ করবে। মায়াভরে পকেটে হাত দিয়ে আমার তার-বাঁধা গ্রাফাইটটা পরখ করলাম। খুব ভয় ছিল পকেটের মধ্যে ভেঙে না যায়।

নতুন জেনারেটরের যে সব তথ্য দেওয়া ছিল তা থেকে খতিয়ে দেখলাম, বর্তমান জেনারেটরটা নিয়ে আমি যে হিসাব করে রেখেছি সেটা সঠিক। সাফল্যের আশা বেড়ে উঠল আমার। একটা বাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম অধীর হয়ে। দেয়ালের ঘড়িতে যখন পৌনে একটা, তখন আমার রেজিস্টারটি বার করে তার একটা প্রান্ত যোগ করলাম মাথার ওপরকার অ্যালুমিনিয়ম চাকতির একটা স্ক্রুয়ের সঙ্গে। অন্য প্রান্তটা তারের পর তার জুড়ে লম্বা করে টেনে নিয়ে এলাম কোণের পাইপটার কাছে।

শেষ মুহূর্তগুলো যেন আর কাটতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত মিনিটের কাঁটা এসে পৌঁছল বারোর ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ওপ্রান্তটা র‍্যাডিয়েটরের সঙ্গে যোগ করে আমি বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। শ্ফাফ্ফ্, বলৎস এবং ডাক্তার সমভিব্যাহারে ক্রাফৎশ্তুদৎ আসছিল এই দিকেই। আমায় দেখে হাসি ফুটল ওদের মুখে। বলৎস ইশারা করে আমায় সঙ্গে ডাকলে। আমিও ওদের পেছন পেছন গিয়ে দাঁড়ালাম হিসেব কষার ঘরটার কাচের দরজার সামনে।

সামনে ছিল শ্ফাফ্ফ্ আর ক্রাফৎশ্তুদৎ। ভেতরে কী হচ্ছিল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'ভালো সিদ্ধান্তই নিয়েছেন,' চাপা গলায় বলৎস বললে, 'হের ক্রাফৎশ্তুদৎ আপনার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। আপনার আফশোসের কারণ থাকবে না...'

'কী ব্যাপার?' হঠাৎ তার অনুচরবর্গের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে ক্রাফৎশ্তুদৎ। ইঞ্জিনিয়র শ্ফাফফ গুড়ি মেরে কী যেন দেখার চেষ্টা করল জানলা দিয়ে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল আমার।

'কাজ করছে না দেখছি! মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে সবাই!' সক্রোধে শ্ফাফফ বললে ফিসফিসিয়ে।

আমি জানলার দিকে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম। যা দেখলাম সেটা আমার উদ্দাম স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেল। যে লোকগুলো আগে বাধ্যের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত টেবিলের ওপর, তারা এখন সিধে হয়ে বসেছে, সদর্পে তাকাচ্ছে। দৃঢ় সংকল্পের উঁচু গলায় কথা বলাবলি করছে।

'এ অত্যাচারের অবসান করার সময় হয়েছে ভাইসব। বুঝতে পারছিস তোরা, কী এরা করছে আমাদের নিয়ে?' উত্তেজিতভাবে বলছিল ডেনিস

'নিশ্চয়! এই পিশাচেরা আমাদের অনবরত বোঝাচ্ছে যে তাদের প্রেরণা জেনারেটরের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা সুখের পরাকাষ্ঠায় পেঁাছচ্ছি। ওরা নিজেরা একবার বসে দেখুক না!'

'কী হচ্ছে ওখানে?' হুঙ্কার ছাড়ল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ।

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' ঘরের ভেতরকার লোকগুলোর দিকে বিবর্ণ চোখ মেলে বিড়বিড় করলে শ্ফাফ্‌ফ্‌। 'স্বাভাবিক মানুষের মতো হাবভাব দেখছি। হিসেব কষছে না কেন?'

লাল হয়ে উঠল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ।

'অন্তত পাঁচটা সামরিক অর্ডার সময়মত দিতে পারব না আমরা,' দাঁত চেপে বললে সে, 'এক্ষুনি কাজে লাগান ওদের।'

বলৎস চাবি খুলল, আমাদের গোটা দলটা ঢুকল ভেতরে।

'তোমাদের গুরু ও ত্রাতাকে অভিনন্দনের জন্যে দাঁড়াও।' জোর গলায় হুকুম দিলে বলৎস।

একটা পীড়িত স্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। ক্রোধে রোষে উদ্দীপিত চব্বিশটি চোখ চাইল আমাদের দিকে। বিস্ফোরণের জন্যে এবার কেবল একটা স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন। হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আমার। ক্রাফৎশ্‌তুদৎ ফার্ম এবার ডকে উঠছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে গোটা দলটার উদ্দেশ্যে উঁচু গলায় বললাম:

'এখনো চুপ করে আছো কিসের জন্যে? মুক্তির সময় হয়েছে। তোমাদের ভাগ্য সে তোমাদের নিজেদেরই হাতে। শেষ করে দাও এই হারামজাদাদের— তোমাদের জন্যে 'জ্ঞানীগৃহের' রাস্তা খুঁড়ছে এরা।'

কথাটা বলতেই নিজেদের জায়গা ছেড়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল হতভম্ব ক্রাফৎশ্‌তুদৎ আর তার অনুচরবর্গের ওপর। বলৎস আর ডাক্তারকে মাটিতে আছড়ে ফেলে টুঁটি টিপে ধরলে তাদের। কিল ঘুসি লাথি মারতে মারতে তারা ক্রাফৎশ্‌তুদৎকে ঠেলে নিয়ে গেল কোণের দিকে। ধরাশায়ী শ্ফাফ্‌ফের ওপর চেপে বসে ডেনিস তার কান ধরে টাক পড়া মাথাটা ঠুকতে লাগল মেজের ওপর। কেউ কেউ গিয়ে ভেঙে ফেললে অ্যালুমিনিয়মের চাকতিগুলো, চূর্ণ হতে লাগল সার্শি, লাউডস্পিকারটা খসিয়ে নিয়ে চুরমার করা হল

মেজের ওপর। তারপর টেবিল চেয়ার। কুটি কুটি করে ছেঁড়া অঙ্কের পাতায় আকীর্ণ হয়ে উঠল মেজে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলাম আমি।

'ক্রাফৎশ্‌তুদৎকে ছেড়ো না। ও এক যুদ্ধাপরাধী। এই শয়তানী গণনাকেন্দ্রটা গড়েছে ওই, যেখানে মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে প্রাণ দিয়েছে লোকে। আর ঐ বদমাইশ শ্ফাফ্‌ফটাকে আটকে রাখো। এই প্রেরণা জেনারেটরটি ওরই কীর্তি। বলৎসকে বেশ এক চোট দাও। লোকে শেষ পর্যন্ত পাগলা হয়ে গেলে তাদের জায়গা ভর্তি করার নতুন শিকার তৈরি করছে ও ...'

মানবিক রোষে উদ্দীপ্ত এই লোকগুলোর চেহারা তখন দেখবার মতো। দুষমনদের টুঁটি টিপে কিল ঘুঁসি লাথি চালাতে লাগল তারা।

প্রেরণা জেনারেটরের প্রভাব বহুক্ষণ থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই শুভক্রোধ তখনো ফুঁসে চলছে। দাসত্বের জোয়াল ভাঙা জীবন্ত মানুষ জেগে উঠেছিল তাদের মধ্যে। রক্তাক্ত মুখে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ, বলৎস, শ্ফাফ্‌ফ আর ডাক্তারকে টেনে আনা হল বারান্দায়। তারপর গোলমাল করে ঠেলতে ঠেলতে তাদের নিয়ে যাওয়া হল বেরবার দরজার দিকে।

উত্তেজিত লোকগুলোর আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছিলাম আমি তাদের নিপীড়কদের উদ্দেশ্যে চিৎকার ও ব্যঙ্গোক্তি করতে করতে এই ভূতপূর্ব পরিগণকেরা এগোল সেই গহন প্রকোষ্ঠটার মধ্যে দিয়ে, যেখানে আমি আমার অঙ্কগুলো প্রথম এনে দিয়েছিলাম। তারপর ভূগর্ভের সেই সব গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল উন্মুক্ত রাস্তায়।

উত্তপ্ত এক বসন্তের সূর্যে মুহূর্তের জন্যে চোখ ধাঁধিয়ে থেমে গেলাম আমরা। কিন্তু সেটা কেবল সূর্যের জন্যেই নয়। ক্রাফৎশ্‌তুদৎ দালানের দরজার সামনে ভিড় করে এসেছে এক বিপুল জনতা। কী একটা চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু আমাদের দেখে থেমে গেল হঠাৎ। তারপর কে যেন চিৎকার করে উঠল:

'আরে ঐ তো প্রফেসর রাউথ। সত্যিই বেঁচে আছেন তাহলে!'

ডেনিস আর তার সঙ্গীরা সামনে ঠেলে দিল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ কোম্পানির লাথি খাওয়া কর্মকর্তাদের। ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তারা কাপুরুষের মতো একবার আমাদের দিকে একবার ঐ আগুয়ান ভয়ঙ্কর জনতার দিকে চাইতে লাগল।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এল একটা রোগা ফ্যাকাশে মেয়ে — এলজা ব্রিণ্টার। আমি যা বলেছিলাম তা সে সাহস করে করেছে তাহলে!

ক্রাফৎশতুদ্‌ৎ-এর দিকে দেখিয়ে সে বললে, 'এই লোকটা!' তারপর শ্ফাফ্‌ফ-এর দিকে নির্দেশ করে বললে, 'আর এই লোকটা। এরাই নাটের গুরু ...'

একটা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। মেয়েটির পিছনে পিছনে এগিয়ে আসতে লাগল পুরুষেরা। আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই অপরাধীদের হাড়মাস আর কিছু থাকত না। কিন্তু ডেনিস হাত তুলে চেঁচিয়ে বললে:

'বন্ধুগণ, আমরা সভ্য মানুষ। নিজের হাতে বিচারের ভার নেওয়া আমাদের পক্ষে মর্যাদাকর হবে না। মানবতার স্বার্থে বেশি কাজ হবে যদি এদের পাপের কথা দুনিয়ার লোক জানতে পারে এদের আদালতে সোপর্দ করতে হবে। আমরা হব সাক্ষী। জঘন্য সব অপরাধের অনুষ্ঠান হয়েছে এই দেয়ালগুলোর ভেতরে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে এই পিশাচেরা মানুষকে দাস বানাতে, তাদের নিঃশেষ করে শোষণ করতে চেয়েছে।'

'আদালতে পাঠাও অপরাধীদের!' চিৎকার করল সবাই। 'বিচার হোক অপরাধীদের!'

অপরাধী দলটাকে ঘিরে শহরের দিকে চলতে লাগল জনতা। আমার পাশে পাশে হাঁটছিল সেই রোগা মেয়েটা — এলজা ব্রিণ্টার। আমার হাত আঁকড়ে ধরে বললে:

'আমাদের সেই কথাবার্তাটার পর আমি অনেক ভেবেছিলাম। পরে কেমন যেন বুকে জোর পেলাম। ভারি রাগ হচ্ছিল আপনার আর আপনাদের ঐ বন্ধুদের কথা ভেবে, নিজের কথাও ভেবে। কোত্থেকে যে সাহস পেলাম ...'

'যারা তাদের শত্রুদের ঘৃণা করে আর বন্ধুদের ভালোবাসে, তাদের বেলায় ঠিক এই হয়।' আমি বললাম।

সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ক্রাফৎশ্‌তুদৎ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। মস্ত একটা বক্তৃতা দিলেন নগরপাল, তাতে বাইবেল আর সুসমাচার থেকে অনেক উদ্ধৃতি গিজগিজ করছিল। বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে, 'এই সব সূক্ষ্ম অপরাধের জন্যে ক্রাফৎশ্‌তুদৎ ও তার অনুচরদের বিচার হবে সর্বোচ্চ ফেডারেল কোর্টে।'

ঢাকা পুলিস গাড়িতে করে তারপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল আমাদের শহর থেকে। পরে তাদের কী হল কিছু শোনা যায়নি। খবরের কাগজেও কোনো রিপোর্ট বেরয়নি। কিন্তু গুজব শোনা যায় ক্রাফৎশ্‌তুদৎ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সরকারী কাজে ঢুকেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের জন্যে একটা বড়ো কম্পিউটার কেন্দ্র গড়ার ভার পেয়েছে তারা।

আর খবরের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় যখনই আমি নিচের এই বিজ্ঞাপনটি দেখি, তখনই রাগে পিত্তি জ্বলে যায় আমার:

কর্মখালি

একটি বৃহৎ কম্পিউটার কেন্দ্রের জন্য ২৫-৪০ বৎসর বয়স্ক উচ্চ গণিতের জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ কর্মচারী আবশ্যক। লিখুন বক্স নং...

আনাতলি দ্নেপ্রভ

আইজ

তখন অনেক রাত। আমার কামরার দরজায় কেউ জোরে করাঘাত করল। আধাঘুমন্ত অবস্থায় লাফিয়ে উঠলাম সোফা থেকে। কী ব্যাপার কে জানে গাড়ির গতির তালে তালে টেবিলের ওপর শূন্য চায়ের গেলাসে চামচেগুলো ঠুন ঠুন করছিল আলো জেবলে জুতোর সন্ধানে পা বাড়ালাম। ফের করাঘাত শোনা গেল, এবার আরো জোরে, একরোখা। দরজা খুললাম

দরজার কাছে ট্রেন কনডাক্টর দাঁড়িয়ে, তার পেছনে লম্বামতো একটা লোক, পরনের ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুটটা দলামোচড়া।

'মাপ করবেন কমরেড,' চাপা গলায় বললে কনডাক্টর, 'এ কামরায় আপনি একা, তাই আপনাকেই বিরক্ত করতে হল '

'সে কিছু না, কিন্তু কী ব্যাপার?'

'আপনার কামরায় ইনিও যাবেন'... কনডাক্টর একটু সরে স্লিপিং স্যুট পরা লোকটির যাবার পথ করে দিল। আমি অবাক হয়ে চাইলাম।

'আপনার কামরায় বুঝি বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আছে, ঘুমতে দিচ্ছে না?'

আগন্তুক যাত্রীটি হেসে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল।

'তা বেশ, আসুন না,' অমায়িকভাবে বললাম আমি।

লোকটি ঢুকে চারিদিকে চেয়ে বসল সোফায়, একেবারে জানলার কাছের কোণটিতে। একটি কথাও না বলে টেবিলে কনুই রেখে মাথা ভর দিয়ে চোখ বুজল।

'এবার তাহলে আর কিছু অসুবিধা নেই,' কনডাক্টর হেসে বললে, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম নিন এবার।'

দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরালাম আমি, কটাক্ষে দেখতে লাগলাম আমার নৈশ অতিথিকে। লোকটির বছর চল্লিশ বয়েস, এক মাথা চকচকে কালো

চুল; নিশ্চল হয়ে বসে ছিল সে মূর্তির মতো, নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলেও যেন মনে হয় না।

ভাবলাম, "বিছানার ওর্ডার দিল না কেন? বলে দেখব নাকি?"

সহযাত্রীর দিকে ফিরে কথাটা বলতে যাব, এমন সময় সে যেন আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই বললে:

'লাভ নেই। বলছিলাম কি, বিছানার অর্ডার দিয়ে লাভ নেই। ঘুমও আসছে না, কিছু পরেই আবার নামতে হবে।'

তার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে হকচকিয়ে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম আর এল না। মনে পড়তে লাগল যত রেলগাড়িতে চুরির কাহিনী। ভাগ্যি ভালো যে আমি যে ওয়াগনটায় উঠেছি এটা নতুন ধরনের, এতে সোফার নিচে মালপত্তর নিরাপদে বন্ধ করে রাখা যায়। বলা তো যায় না, আমার এই সঙ্গীটি...

'আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারেন। আপনার মতোই খাঁটি লোক আমি। আসলে 'ন' স্টেশনে আমি আমার ট্রেনটা মিস্ করেছিলাম।' ফের একটা নিশ্চিন্ত, সুস্পষ্ট সুরে বললে সে।

"এ আবার কী! নতুন এক ভল্ফ মেসিং-এর উদয় হল নাকি, মনের কথা শুনে বলছেন!" বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য কী একটা জবাব দিয়ে আমি অন্য পাশ ফিরে পালিশ করা দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম। বেশ একটা উৎকণ্ঠ নীরবতা নামল।

শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের জয় হল। ফের তাকিয়ে দেখলাম অপরিচিত লোকটির দিকে। আগের ভঙ্গিতেই বসে আছে সে।

বললাম, 'আলোয় আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'কী বললেন? আলো? আপনারই বরং অসুবিধা হবে। নিভিয়ে দেব?'

'তা নিভিয়ে দিতে পারেন...'

উঠে দাঁড়িয়ে সে দরজার কাছে গিয়ে সুইচ অফ করে দিল। তারপর ফিরে এল নিজের সোফায়। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে দেখলাম লোকটা তার সীটে ঠেস দিয়ে মাথার পেছনে হাত রেখে বসে আছে। পাটা এগিয়ে এসেছে প্রায় আমার সোফা পর্যন্ত।

'ট্রেন ফেল করলেন কী করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভয়ানক বেকুবি হয়েছিল আর কি। আমি স্টেশনে নেমে একটা বেঞ্চিতে বসে একটা কথা নিয়ে ভাবছিলাম, মনে মনে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম যে আইভা ভুল...' হড়বড় করে বলে গেল লোকটা, বোঝা যায় আলাপ চালানোয় তার খুব আগ্রহ নেই, 'ওদিকে ছেড়ে দিলে ট্রেনটা।'

'মানে ... কোনো মহিলার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন বুঝি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আবছা অন্ধকারে লক্ষ্য করলাম ঝট করে সিধে হয়ে সে আমার দিকে ফিরল। শশব্যস্তে উঠে বসলাম আমি।

'এর মধ্যে মহিলা এল কোথা থেকে?' বিরক্তভাবে বললে সে।

'কিন্তু আপনিই তো বললেন, মনে মনে প্রমাণ করছিলেন যে আইভা নাকি বললেন, সে সঠিক নয়।'

'আপনি কি ভাবেন, স্ত্রীলিঙ্গের একটা শব্দ বললেই বুঝতে হবে মহিলা? অবিশ্যি, এই বিদঘুটে ভাবনাটা "তার" মধ্যেও একবার ঢুকেছিল। ভেবেছিল সেও একজন মহিলা।'

এই অদ্ভুত উক্তিটা সে করলে তিক্ত এমন কি রুষ্টভাবেই — শেষের কথাটি তো রীতিমতো ব্যঙ্গের সুরে। মনে হল লোকটা বিশেষ স্বাভাবিক নয়, সাবধানে থাকা ভালো। কিন্তু আলাপটা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সোফা থেকে উঠে আমি সিগারেট ধরালাম, তার প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল দেশলাইয়ের আলোয় সহযাত্রীটিকে ভালো করে দেখব। সে বসে ছিল সোফার এক প্রান্তে, জ্বলজ্বলে কালো চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

'কী জানেন,' যথাসম্ভব নরম করে আপোসের সুরে বললাম, 'আমি পেশায় লেখক। তাই স্ত্রীলিঙ্গবাচক একটা শব্দের প্রসঙ্গে যদি বলেন "সে সঠিক" বা "সে ভেবেছিল" তাহলেও নারী সম্পর্কে বলা হচ্ছে না এটা আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছে।'

চট করে কোনো উত্তর এল না আমার অদ্ভুত সহযাত্রীটির কাছ থেকে। অবশেষে বললে, 'কথাটা এক সময় খুবই সত্যি ছিল, বছর দশেক আগে। কিন্তু আমাদের কালে আর তা খাটে না। "সে" এ ক্ষেত্রে মেয়ে নাও হতে পারে, কেবল স্ত্রীলিঙ্গের কোনো বিশেষ্যকে বোঝায় তাতে। শেষ বিচারে, সর্বনামগুলো হল আমাদের অভ্যস্ত একটা কোডের কতকগুলো সঙ্কেতচিহ্ন,

যাতে আমাদের চেতনায় বস্তুটির লিঙ্গ সম্পর্কে একটা ধারণা জাগে। এমন ভাষা আছে, যাতে একেবারেই লিঙ্গ ভেদ নেই। যেমন, ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে অচেতন কোনো বস্তুরই লিঙ্গ নেই। রোমান ভাষাগুলির মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ কিছু নেই ...'

"ও হো, লোকটা দেখছি ভাষাতাত্ত্বিক," ভাবলাম আমি।

কিন্তু তাতে ব্যাপারটা বিশেষ পরিষ্কার হল তা নয়। সহযাত্রীটি যদি ভাষাতাত্ত্বিকই হয়, তাহলেও স্ত্রীলিঙ্গভুক্ত কোনো বিশেষ্যের ভাবনা নিয়ে তার এ গবেষণার প্রয়োজন পড়ল কেন। সবটাই এমন গোলমেলে ঠেকল যে ঠিক করলাম একটু ঘুরপথে এগুতে হবে।

বললাম, 'কথাটা যখন উঠল তখন বলি, খুব অদ্ভুত ভাষা হল ইংরেজি। রুশ ভাষার সঙ্গে তুলনায় তার ব্যাকরণ আশ্চর্য সরল ও সমরূপ।'

'হ্যাঁ,' লোকটা বললে, 'বিশ্লেষণী ভাষার চমৎকার দৃষ্টান্ত এটা, বেশ মিতব্যয়ের সঙ্গেই তাতে কোড ব্যবস্থার প্রয়োগ হয়েছে।'

'কী ব্যবস্থা?'

'কো-ড ব্য-ব-স্থা,' স্পষ্ট করে বললে সে, 'নির্দিষ্ট অর্থবহ একটা সংকেত প্রণালী। শব্দ হল এই সংকেত।'

কিছু কিছু ভাষার ব্যাকরণ আমি পড়েছি, কিন্তু মানতে বাধ্য যে 'কোড ব্যবস্থা' 'সংকেত' ইত্যাদি পরিভাষা কোথাও দেখিনি। তাই জিজ্ঞেস করলাম:

'কিন্তু কোড ব্যবস্থা বলতে কী বোঝেন আপনি?'

'সাধারণভাবে কোড ব্যবস্থা হল সংকেত বা চিহ্ন দিয়ে শব্দ, বাক্য বা সম্পূর্ণ এক একটা বোধকে প্রকাশ করা। ব্যাকরণের কথা যদি বলেন, তো বিশেষ্যের বহুবাচনিক রূপ হল একটা সংকেত যার সাহায্যে বস্তুর বহুত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মানো হয় আমাদের চেতনায়। যেমন "ওয়াগন" বললে একটা ওয়াগন বোঝায়। এর সঙ্গে "গুলো" শব্দ যোগ করলে বোঝাবে অনেক ওয়াগন। এই "গুলো"টা হল সেই সংকেত যাতে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মডুলেটেড হচ্ছে।'

'মডুলেটেড হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, মানে পরিবর্তিত হচ্ছে।'

'কিন্তু কেন বলুন তো এই সব কোড, সংকেত, মডুলেশন ইত্যাদির

আমদানি। আমাদের ব্যাকরণে তো বেশ কার্যকরী পরিভাষাই সব আছে।'

'ব্যাপারটা পরিভাষার নয়,' আমার কথায় বাধা দিলে সহযাত্রী, 'ব্যাপারটা আরো গভীর। খুব সহজেই দেখানো যায় যে ব্যাকরণ তথা খাস ভাষাটাই মোটেই নিখুঁত নয়। সেটা আমাদের আপাতত মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ ঐতিহ্যের সঙ্গে আমরা বাঁধা। একবার ভেবে দেখুন। রুশ ভাষায় প্রায় এক লক্ষ মূল শব্দ, তা গড়ে উঠেছে বর্ণমালার ৩৫টি অক্ষর দিয়ে। প্রতিটি শব্দে যদি গড়ে পাঁচটা করে অক্ষর থাকে, তাহলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে প্রায় পাঁচ লক্ষ অক্ষরের বিন্যাস। তদুপরি আছে ব্যাকরণের বহুসংখ্যক রূপ, বিভক্তি, কারক, ইত্যাদি।'

'কিন্তু তা বাদ দিয়ে চলবে কি করে?' এই অস্বাভাবিক 'ভাষাবিদ' কী বলতে চাচ্ছেন তা না বুঝে জিজ্ঞেস করলাম।

'যেমন ধরুন, বর্ণমালাকে সংক্ষেপ করা যায়। যদি আপনি ধরুন ১ থেকে ১০ এই দশটি সংখ্যা ক্রমান্বয়ে নেন, তাহলে মিতব্যয়ে ব্যবহার করলে তা থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিভিন্ন বিন্যাস সম্ভব। তাই ৩৫ অক্ষরের বর্ণমালার কোনো প্রয়োজনই হবে না। তাছাড়া দশটা বিভিন্ন সংখ্যারও দরকার নেই। কেবল দুটিতেই কাজ চলে যাবে — শূন্য আর এক।'

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে মনে মনে কল্পনা করলাম, বই পড়ছি, অক্ষরের বদলে তার পাতাগুলো কেবল সংখ্যা দিয়ে ঠাসা। মনে হল যেমন বিষণ্ণ তেমনি হাস্যকর।

'কিন্তু আপনার বর্ণমালায় লেখা বই ভারি একঘেঁয়ে হবে। হাতে নিতেই ইচ্ছে হবে না। ভেবে দেখুন আপনার ভাষা মতো কবিতা কী রকম দাঁড়াবে:

এক, এক, শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য।
এক, শূন্য-শূন্য, এক, এক,
এক, এক, এক, শূন্য-শূন্য,
শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য, শূন্য-শূন্য, এক।

এ কবিতা লেখাও খুব সহজ! মিল ছন্দ নিয়ে আর চুল ছিঁড়তে হবে না! আপনার এই র‍্যাশানালিজেশন পদ্ধতি অনুসরণকারী কবির কবিতা পড়ে সমালোচকরা লিখবেন, তাঁর কবিতা শূন্য ও একের সুষম বিন্যাসে ভরা। কতকগুলি পঙক্তিতে শূন্য ও এক নির্বাচিত হয়েছে অতি সুরুচি

সহকারে, এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচবার পর্যন্ত শূন্য ও একের পুনরাবৃত্তিতে কখনো ঘণ্টা ধ্বনি কখনো উড্ডীন বলাকার আভাস দেয়।'

না হেসে থাকতে পারলাম না।

'ধ্যত্তোরি যত — শূন্য আর একের বিরুদ্ধে আপনার আপত্তিটা কী বলুন তো?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলেন সহযাত্রী। 'কিছু কিছু বিদেশী ভাষা তো আপনি জানেন, তাই না?'

টের পেলাম লোকটা চটে উঠছে।

'হ্যাঁ জানি, ইংরেজি, জার্মানি, কিছুটা ফরাসী।'

'বেশ, ইংরেজিতে হাতিকে কী বলে?'

'এলিফেণ্ট,' বললাম আমি।

'আর এতে আপনার মোটেই হতভম্ব লাগে না?'

'হতভম্বের কী আছে?'

'হতভম্বের এই যে রুশীতে হাতী কেবল চারটে বর্ণের শব্দ, ইংরেজিতে প্রায় তার দ্বিগুণ!'

'কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কেবল হাতিই তো বোঝাচ্ছে, উট নয় কি ট্রাম নয়।'

'এই যে বললেন ট্রাম — রুশিতে এটা ইংরেজি ট্রামের চেয়ে তিন বর্ণ বড়ো, আর জার্মানে শ্ট্রাসেনবাহ্‌ন রুশ শব্দের দ্বিগুণ লম্বা। এ সব আপনি সাগ্রহেই মেনে নিতে রাজী। ভাবছেন এই-ই সঙ্গত। এতে আপনার গদ্য পদ্য কিছুরই লোকসান হচ্ছে না। আপনি ভাবেন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা খুবই সম্ভব। কিন্তু শূন্যে আর একে অনুবাদ করতে আপনি গররাজী।'

এই ধরনের জেরার মুখে হতচকিত হয়ে আমি সোফা ছেড়ে মুখোমুখি বসলাম আমার সহযাত্রীর সামনে। তার অন্ধকার মুখাবয়বটা মনে হল লড়াইয়ের জন্যে উদগ্রীব। আমার জবাবের অপেক্ষা না করে সে বলে চলল:

'বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা শব্দ নিয়ে নয়, সে শব্দ কী প্রকাশ করছে, আরো সঠিকভাবে বললে — কী মূর্তি, ভাবনা, বোধ, অনুভূতিকে তা ফুটিয়ে তুলছে আমাদের চেতনায়। মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা নিয়ে পাভলভ যা লিখেছিলেন তা পড়েছেন কি? নাকি পড়ে থাকলেও তা বোঝেননি? তবে বলি, জীব ও মানুষের উচ্চ নার্ভ ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে

পাভলভ প্রথম দেখান যে মানুষের মধ্যে আছে একটা দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা, তার ভিত্তি হল কথা, যা অতি জটিলতম অনুভবকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। শব্দ হল বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়া নির্দেশের কোড আর এই কোড প্রায়ই বহির্বিশ্বের আসল বস্তুটার মতোই প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে মানুষের মধ্যে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'খানিকটা পারছি...'

'হঠাৎ একটা গরম ইস্ত্রিতে হাত পড়লে, কিছু ভাবার আগেই আপনি হাতটা টেনে নেন; তা করেন কেন? এ হল রিফ্লেক্স ক্রিয়া। আর ইস্ত্রিটা ছুঁতে যাবেন এমন সময় যদি কেউ চেঁচিয়ে ওঠে "গরম!" তাহলেও কি তাই করেন না?'

'তা করি বৈকি,' বললাম আমি।

'তার মানে আসল একটা তপ্ত ইস্ত্রি আর "গরম" কথাটা মারফত একটা সংকেত — এ দুইয়েরই প্রতিক্রিয়া এক রকম!' সগর্বে সিদ্ধান্ত টানলেন সহযাত্রী।

'তা বটে।'

'এবার অন্য একটা জিনিস ভেবে দেখুন। "গরম" কথাটাকে যদি ধরা যাক শূন্য দিয়ে কোডবদ্ধ করি এবং এ কোড ঐ শব্দের মতোই যদি আপনার অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে ইস্ত্রিটা ছোঁয়ার সময় কেউ "শূন্য" বলে চেঁচালেও কি আপনি হাত সরিয়ে নেবেন না?'

আমি চুপ করে রইলাম। লোকটা বলে চলল:

'এটা যদি মানেন, তাহলে পরেরটাও মানতে হবে। বহির্বিশ্বের যত কিছু সংকেত মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা সব যদি একটা একরূপ, এবং যথাসম্ভব সরল কোডে অনুবাদ করা যায় তাহলে কতকগুলো দিক থেকে আমাদের খুবই সুবিধা। কী বলতে চাইছি বুঝেছেন? শুধু শব্দ নয়, সাধারণভাবে সমস্ত সংকেত। অসীম বৈচিত্র্য ভরা একটা বিশ্বেই তো আমাদের বাস। সেটাকে আমরা চিনি আমাদের সবকটি বোধ-ইন্দ্রিয় দিয়ে। আমাদের গতি, অনুভূতি, চিন্তা.. এসব ঘটাচ্ছে তার বিভিন্ন সংকেত। স্নায়ুপ্রান্ত থেকে এ সব সংকেত বাহিত হচ্ছে স্নায়ু ব্যবস্থার উচ্চ কেন্দ্রে,

মস্তিষ্কে। পরিবেশ থেকে যে সংকেতগুলো আমরা পাচ্ছি তা স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে পেঁছিচ্ছে কী আকারে তা জানেন কি?'

বললাম, 'জানি না'।

'পেঁছিচ্ছে কোডবদ্ধ রূপে এবং সে কোড কেবল শূন্য আর এক দিয়ে গড়া।'

আপত্তি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সহযাত্রী কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ না করে বলে গেল:

'বাইরের জগতের সমস্ত সংকেত স্নায়ুব্যবস্থা মারফত কোডবদ্ধ হয় ঠিক একই রূপে। আর আপনার সমালোচক যখন শূন্য একের মধুর ক্রমান্বয়ের প্রশংসা করছিলেন তখন তিনি একেবারে সত্য কথাই বলেছেন, কেননা আপনি যখন কবিতা পড়েন বা অন্যের আবৃত্তি শোনেন তখন আপনার চোখের দৃষ্টিস্নায়ু বা কানের শ্রুতিস্নায়ু মস্তিষ্কে যা পাঠায় সেটা কেবল ঐ শূন্য আর একের ঐ মধুর ক্রমান্বয়টাই।'

'যত বাজে কথা।' চেঁচিয়ে উঠে আমি দরজার কাছে গিয়ে বাতিটা জেবলে দিলাম। তারপর ভালো করে চেয়ে দেখলাম আমার সহযাত্রীর দিকে। সে তখন রীতিমতো উত্তেজিত।

বললে, 'দয়া করে অমন করে তাকাবেন না, কী ভেবেছেন আমি একটা পাগল? অন্যের কথার সত্যতায় সন্দেহ করার পক্ষে আপনার নিজস্ব অজ্ঞতাকেই যদি পর্যাপ্ত মনে করেন তাহলে দোষ আমার নয়। কিন্তু এ আলাপ আপনিই শুরু করেছেন, তাই চুপ করে বসে শুনুন।'

আঙুল দিয়ে আমার সোফা নির্দেশ করল সে। বাধ্যের মতো আমি বসলাম।

বললে, 'দিন একটা সিগারেট। ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সহজ নয়।'

নীরবে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দেশলাই ধরালাম। কয়েক বার জোরে জোরে টান দিয়ে যে আলাপ সে শুরু করল, তেমন আশ্চর্য কাহিনী আমি জীবনে কখনো শুনিনি।

'ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বা পরিগণকের কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনলজির এ এক আশ্চর্য কীর্তি! মানুষের প্রায় অসাধ্য সব জটিল গাণিতিক হিসাব কষে দেয় যন্ত্র। এমন সব অঙ্ক তা

কষতে পারে যে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এবং কষে দেয় মুহূর্তের মধ্যে, যা মানুষকে করতে হলে লাগত কয়েক মাস এমন কি বছর। এ যন্ত্র তৈরি হয় কী ভাবে তা আপনাকে বলতে যাচ্ছি না। বললেও কিছু বুঝবেন না, কারণ আপনার পেশা সাহিত্য। আমি শুধু একটা জরুরী জিনিসের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব: এ যন্ত্র সংখ্যা রাশি নিয়ে কাজ করে না, করে রাশির কোড-সংকেত নিয়ে। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে পেশ করার আগে সমস্ত সংখ্যাকে কোডবদ্ধ করা হয় এবং করা হয় ঠিক ঐ শূন্য আর এক দিয়ে যার বিরুদ্ধে আপনার অত আপত্তি। অবশ্য বলতে পারেন, এই শূন্য আর এক নিয়ে কেন আমি এত বকছি। তার কারণ খুবই সহজ। ইলেকট্রনিক যন্ত্র যে সব সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে তা বিদ্যুৎ-প্রেরণার রূপ নেয়। এক হল "প্রেরণার অস্তিত্ব", শূন্য হল "প্রেরণার অনস্তিত্ব"।'

'সংখ্যাকে শূন্য এবং এক দিয়ে কোডবদ্ধ করায় আমি আপত্তি করিনি। কিন্তু শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? এর মধ্যে ওই শূন্য আর এক আসে কোথা থেকে, যা কিনা আপনার মতে কবিতার সৌন্দর্য আর ইন্দ্রির তাপমাত্রা পৌঁছে দেবে আমার মস্তিষ্কে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। সময়ে বুঝবেন। আপাতত শূন্য আর একের উপযোগিতাটা তো বুঝলেন। এবার হিসাবের একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র কল্পনা করুন — বিরাট একটা যন্ত্র ব্যবস্থা — যেখানে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক অঙ্ক কষা হচ্ছে দ্রুত বেগে, বিদ্যুৎ-প্রেরণার সাহায্যে।

'সবাই জানেন যে একটা সহজ পাটীগণিতের অঙ্কেও প্রায়ই একাধিক অপারেশনের প্রয়োজন হয়। আর এই ধরনের বহুবিধ অপারেশন সহ একটা অঙ্ক কষছে যন্ত্র, সেটা কী ভাবে হয়? এইটাই হল সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং। একটা জটিল অঙ্ক কষার সময় মেসিনে বিশেষ প্রেরণা-কোডের আকারে কেবল অঙ্কের সর্তগুলোই জোগান হয় না, কোডবদ্ধ রূপে তার প্রক্রিয়া চক্রের একটা কর্মসূচিও দেওয়া হয়। যন্ত্রটাকে যেন বলা হয়: "প্রথম সংখ্যা দুটো যোগ দিয়ে তার যোগফল মনে রাখো; তারপর পরের দুটো সংখ্যাকে গুণ করে তার ফল মনে রাখো: তারপর প্রথম ফলটাকে দ্বিতীয় ফল দিয়ে ভাগ করে উত্তর বলো।" যন্ত্রকে ভাগ করতে বলা হচ্ছে, সে আবার কী কথা? ফল মনে রাখতে বলছি যন্ত্রকে, অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু এটা কোনো

আজব কল্পনা নয়। তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কর্মসূচিটা যন্ত্র ভালোই বোঝে, অঙ্কের অন্তর্বর্তী ফলাফলগুলোকে বেশ মনে রাখতে পারে।

'এই কর্মসূচিটাও যন্ত্রকে দেওয়া হয় কোডবদ্ধ প্রেরণা রূপে। এক একগুচ্ছ রাশি দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় পরিপূরণ কোড যাতে জানিয়ে দেওয়া হয় এ রাশিগুলো দিয়ে কী করতে হবে। কিছুকাল আগেও এই কর্মসূচি তৈরি করতে হত মানুষকে।'

'মানুষ নইলে আবার কে করবে?' বললাম আমি, 'একটা সমস্যার অঙ্কের সমাধান কী ভাবে করতে হবে সেকি আর যন্ত্র জানতে পারে।'

'একেবারে ভুল বললেন! দেখা গেছে, এমন যন্ত্র বানানো সম্ভব, যা নিজেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কর্মসূচি গড়ে নিতে পারে।

'আপনি নিশ্চয় জানেন, ইশকুলে এক এক ধরনের অঙ্ক এক একটা সূত্র অথবা আমাদের ভাষায় এক একটা কর্মসূচি অনুসারে সমাধান করতে শেখে ছেলেরা। সে কাজটা যন্ত্রকে শেখালেই হল। দরকার হবে শুধু তার স্মৃতিতে কোড আকারে অতি টিপিক্যাল অঙ্কের কর্মসূচিগুলো দিয়ে রাখা, মানুষের সাহায্য ছাড়াই সে তখন সঠিকভাবে অঙ্ক কষে দেবে।'

'না, এ হতে পারে না!' আমি বলে উঠলাম, 'যন্ত্র সমস্ত টিপিক্যাল অঙ্কের কর্মসূচিগুলো মনে রাখতে পারলেও তার কোন সূত্রটা দিয়ে সমাধান হবে তা বার করবে কী করে?'

'কথাটা ঠিক! অবস্থাটা তাই ছিল। অঙ্কের সর্তগুলো দেওয়া হত যন্ত্রকে, তারপর জোগানো হত সংক্ষিপ্ত কোড যেমন, "২০ নং কর্মসূচি অনুসারে সমাধান করো।" যন্ত্রও তাই করত।'

'আর সেই হল আপনার যন্ত্রের অপরূপ চিন্তাক্ষমতার শেষ কথা।' বললাম আমি।

'ঠিক উল্টো। যন্ত্রকে নিখুঁত করে তোলার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজটার শুরুই হচ্ছে এখানে। আপনি জানেন কি, অঙ্কের সর্তগুলো পাবার পর যন্ত্র কেন নিজে থেকে তার প্রয়োজনীয় সূত্র বা কর্মসূচিটি বেছে নিতে পারে না?'

'অবশ্যই জানি,' বললাম আমি, 'কারণ পরপর প্রেরণা রূপে যে রাশিগুলো আপনি তাকে দিলেন তারা নিজেরা নির্বাক। তাদের নিয়ে কী

করতে হবে সেটা আপনার যন্ত্র জানে না। জানে না সমস্যাটা কী, কী করতে হবে। যন্ত্র তো নির্জীব। সমস্যার বিশ্লেষণ করতে তা অক্ষম। তা পারে কেবল মানুষ।'

ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট পরা সহযাত্রীটি হাসল, কয়েকবার পায়চারি করল কামরায়। পরে নিজের জায়গাটিতে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল আবার। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তারপর বলে যেতে লাগল

'এক সময় আমি ঠিক আপনার মতোই ভাবতাম। যন্ত্র কি কখনো সত্যিই মানুষের মস্তিষ্কের স্থানাধিকার করতে পারে। জটিল বিশ্লেষণের কাজ কি তা করতে পারে? পরিশেষে, চিন্তা করতে পারে কি? নিশ্চয় না, না, না তাই মনে হয়েছিল আমার। এটা সেই সময়, যখন সদ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র ডিজাইন করতে শুরু করেছি। কিন্তু তারপর থেকে কত না পরিবর্তন হয়ে গেল। এখনকার ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সঙ্গে তখনকার যন্ত্রের আজ আকাশ পাতাল তফাত। তেমন একটা যন্ত্র আগে ছিল প্রায় এক কারখানার মতো, গোটা একটা বাড়ি জুড়ে বসত। ওজনে দাঁড়াত কয়েকশত টন। তা চালাতে দরকার হত হাজার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। আর রেডিওপার্টস ও ভাল্‌ভের সংখ্যা তো অজস্র। সে যন্ত্রের যত উন্নতি হতে লাগল তার আয়তনও তত বাড়তে বাড়তে দাঁড়াল এক একটা ইলেকট্রনিক দানবের মতো, জটিল অঙ্ক কষলেও তার সর্বদাই দরকার হত মানুষের তত্ত্বাবধান। সে শুধুই একটা নির্বোধ, মস্তিষ্কহীন তাজ্জব। মাঝে মাঝে মনে হত, চিরকালই বোধ হয় তাই থেকে যাবে ... আপনার নিশ্চয় মনে আছে, ভাষা থেকে ভাষান্তরে তর্জমার জন্যে যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেরিয়েছিল তার বিবরণ? ১৯৫৫ সালে আমাদের এখানে এবং আমেরিকায় একই সময়ে একটা যন্ত্র বার করা হয়, তাতে গণিত বিষয়ক প্রবন্ধ রুশ থেকে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি থেকে রুশে অনুবাদ করা যেত। তার কয়েকটা অনুবাদ পড়ে দেখেছি, খুব খারাপ নয়। এই সময় আমি একটা যন্ত্রের কাজে পুরোপুরি নামি যাতে গণিত বহির্ভূত কাজ চলবে। বলতে কি এক বছরেরও ওপর আমি অনুবাদের যন্ত্র নিয়ে গবেষণা ও ডিজাইনে ব্যস্ত থাকি।

'বলা দরকার যে কেবল গাণিতিক আর নক্সাকারদের একার সাধ্যে সেরকম যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। আমাদের বহু সাহায্য করেন ভাষাতাত্ত্বিকরা, শব্দ

রূপ ও বাক্য গঠনের এমন সব সূত্র তাঁরা দেন যা কোডবদ্ধ করে যন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে কর্মসূচি রূপে স্থাপিত করা সম্ভব। যে সব অসুবিধা সইতে হয়েছিল তার কথা তুলব না। শুধু এইটুকু বলি, এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র শেষ পর্যন্ত তৈরি করতে পারা গিয়েছিল যাতে, যে কোনো বিষয়ের ওপর রুশ বই বা প্রবন্ধ ইংরেজি, ফরাসী, জার্মানি ও চীনা ভাষায় অনুবাদ করা যায়। অনুবাদ হত খুব তাড়াতাড়ি, বিশেষ টাইপযন্ত্রে রুশ পাঠ টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে। অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় কোড এ যন্ত্র নিজেই বার করে নিত।

'এমনি একটা অনুবাদ যন্ত্র আরো নিখুঁত করে তোলার ব্যাপারে কাজ করার সময় আমি অসুখে পড়ি, মাস তিনেক হাসপাতালে থাকতে হয়। আসলে যুদ্ধের সময় আমি একটা রাডার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলাম, জার্মান বিমান আক্রমণের সময় জখম হই, মস্তিষ্কে ভয়ানক চোট লাগে, সেটা বেশ জানান দিত, এখনো দেয়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্যে নতুন ধরনের চৌম্বক মস্তিষ্ক নিয়ে যখন কাজ করেছিলাম তখন আমার নিজের মস্তিষ্কটাই যে খেলা শুরু করল সেটা খুব সুবিধের নয়।

'ব্যাপারটা কী হত জানেন: খুবই পরিচিত একটা লোক, অথচ হঠাৎ কিছুতেই তার নাম মনে পড়ত না। সামনে কোনো একটা জিনিস, অথচ জিনিসটাকে কী বলে কিছুতেই স্মরণ হচ্ছে না। একটা শব্দ পড়লাম, খুবই চেনা শব্দ অথচ কিছুতেই তার মানে বুঝতে পারছি না। এখনো এটা আমার হয়, তবে আগের মতো অত ঘন ঘন নয়... সে সময় এটা একেবারে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। পেনসিলটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্টকে ডাকলাম, কিন্তু কী জিনিস আমি চাই তার নামটা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। বললাম, "আমার একটা... মানে ঐ যে কী বলে, যা দিয়ে লেখে..." মেয়েটি হেসে ফিরে এল একটি কলম নিয়ে। বললাম, "না, না, অন্য একটা যা দিয়ে..." "অন্য কলম?" বললাম, "না, মানে অন্য জিনিস যা দিয়ে লেখে..." আর আমার অর্থহীন কথায় নিজেরই ভয় লাগল এবং বোঝা যায় মেয়েটিকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। সে বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে বললে একজন ইঞ্জিনিয়রকে, "শিগগির ইয়েভগেনি সিদোরভিচের কামরায় গিয়ে তাঁকে একবার দেখুন। উনি কী সব ভুল বকছেন।" ইঞ্জিনিয়র এল। ওর সঙ্গে আমি তিন বছর ধরে কাজ করে আসছি, অথচ কিছুতেই মনে করতে

পারলাম না কে লোকটা। “ঈস, তুমি দেখছি ভয়ানক খাটিয়েছ নিজেকে।” ইঞ্জিনিয়র বললে, “একটু চুপ করে বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।” ফিরে এল সে ডাক্তার আর ইনস্টিটিউটের দুটি তরুণ সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে। আমায় তারা ঘর থেকে বার করে গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলে হাসপাতালে।

‘সেখানে আমার পরিচয় হয় আমাদের একজন নামকরা নিউরোপ্যাথলজিস্ট ভিক্তর ভাসিলিয়েভিচ জালেস্‌স্কির সঙ্গে। তাঁর নাম করলাম কারণ আমার ভবিষ্যতের ওপর তাঁর একটা মস্ত প্রভাব পড়েছে।

‘বহুক্ষণ ধরে আমার পরীক্ষা করে, বুক দেখে, হাঁটুতে হাতুড়ি ঠুকে, পিঠের ওপর দিয়ে পেনসিল চালিয়ে শেষ পর্যন্ত পিঠ চাপড়ে বললেন, “ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে। আপনার রোগটা হল...” কী একটা লাতিন নাম বললেন তিনি।

‘চিকিৎসাটা হল দৈনিক ভ্রমণ, শীতল স্নান আর রাতে নিদ্রার ওষুধ। ল্যুমিনাল কি নেম্বুটাল পাউডার খেয়ে ঘুমতাম, সকালে জেগে মনে হত একটা মূর্ছা থেকে উঠেছি। একটু একটু করে স্মৃতি ফিরে আসতে লাগল।

‘একদিন ভিক্তর ভাসিলিয়েভিচকে জিজ্ঞেস করলাম ঘুমের ওষুধ আমায় দিচ্ছেন কেন? “কারণ ঘুমোবার সময় আপনার দেহযন্ত্রের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হয় আপনার নার্ভব্যবস্থার ভেঙে পড়া যোগাযোগ লাইন মেরামত করতে।” “যোগাযোগ লাইন?” অবাক হয়ে বললাম। “হ্যাঁ, আপনার সমস্ত সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছয় যা বেয়ে। আপনি তো একজন রেডিওবিশেষজ্ঞ, তাই না? তাহলে স্থূলভাবে বললে, আপনার নার্ভব্যবস্থা হল একটা জটিল রেডিওব্যবস্থার মতো, যার কয়েকটা কনডাক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।”

‘মনে আছে এ কথা শোনার পর ঘুমের ওষুধ খেয়েও বহুক্ষণ ঘুম আসেনি।

‘পরের বার যখন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় তখন তাঁকে মানুষের নার্ভব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বই দিতে বলি। পাভলভের লেখা “মস্তিষ্কের অর্ধগোলকের ক্রিয়া” বইটি তিনি আমায় দেন। সত্যি বলতে কি, গিলে খাই বইটিকে। কেন জানেন? কারণ বহুদিন থেকে যা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম — নতুন, আরো নিখুঁত ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরির নীতি। বুঝলাম, তার জন্যে দরকার মানুষের নার্ভব্যবস্থা, তার মস্তিষ্কের গঠনকে নকল করা।

'গুরুতর মানসিক শ্রম বারণ করেছিলেন ডাক্তাররা। তাহলেও নার্ভব্যবস্থা ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি বই ও পত্রিকা পড়ে ফেললাম। মানুষের স্মৃতি সম্পর্কে পড়াশুনা করে জানা গেল, প্রাণন ক্রিয়ার ফলে পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে যে অসংখ্য সংবেদন লাভ করে মানুষ, তা এক এক গুচ্ছ মস্তিষ্ককোষে জমা থাকে — এদের বলা হয় নিউরোন। এই ধরনের নিউরোনের সংখ্যা কোটি কোটি। প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে কেন্দ্রীয় নার্ভব্যবস্থায় দেখা দেয় একটা অনুষঙ্গ, যা প্রকৃতিকে নকল করে। এই বহির্বিশ্বটা মানুষের স্মৃতির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে মুদ্রিত হয়ে থাকে কোডবদ্ধ সংকেতরূপে, কথা বা মূর্তির আকারে।

'জনৈক বাইওফিজিসিস্ট চোখের নার্ভের ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে আমি যে কী পরিমাণ অভিভূত হয়েছিলাম তা বলা যায় না। ব্যাঙের চক্ষু-নার্ভ বিচ্ছিন্ন করে তিনি তার প্রান্ত দুটো একটা অসিলোগ্রাফের সঙ্গে যোগ করেছিলেন। এ যন্ত্রটা হল বিদ্যুত-প্রেরণাকে দৃষ্টিগোচর করে তোলার জন্যে। যাই হোক চোখের ওপর একটা জোরালো আলো ফেলতেই অসিলোগ্রাফে দ্রুত পরম্পরায় দেখা গেল বিদ্যুত-প্রেরণা; ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংখ্যা ও শব্দ কোডবদ্ধ করার সময় ঠিক যা হয়। বাইরেকার জগতের সংকেত স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কের নিউরোনে গিয়ে পেঁছচ্ছে শূন্য ও একের ক্রমান্বয় সমাহার রূপে, ঠিক বিদ্যুৎ-প্রেরণার মতো।

'শেকলের জোড়টা মিলে গেল। মানুষের নার্ভব্যবস্থায় যে প্রক্রিয়া চলে সেটার সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের অনেক মিল। কিন্তু একটা প্রধান তফাত আছে — মানুষের নার্ভব্যবস্থা জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে নিজে নিজেই পুনর্জন্ম নেয় ও নিখুঁত হয়। মানুষের স্মৃতি অবিরাম পূর্ণ হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংস্পর্শ, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, মস্তিষ্কের কোষে সংবেদন, প্রতিমূর্তি, বোধ ও অনুভূতির মুদ্রণের ফলে। কিন্তু যন্ত্রের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ, তার অনুভূতি নেই, স্মৃতি তার নির্দিষ্ট, নতুন তথ্যে তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

'এমন যন্ত্র কি সৃষ্টি করা সম্ভব যা নিজেরই গঠনের কোনো এক আভ্যন্তরীণ নিয়মে স্বয়ংবিকশিত ও স্বয়ংনিখুঁত হয়ে উঠতে পারে? এমন যন্ত্র বানানো যায় না কি, যা মানুষের সাহায্য ছাড়া বা নিম্নতম সাহায্যেই

নিজের স্মৃতিকে পূর্ণ করতে পারবে? এমন যন্ত্র কি হয় না যা বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে কিংবা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নিজে থেকেই যুক্তিসিদ্ধভাবে হিসাব করতে (চিন্তা করা কথাটা বলছি না, কারণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা ঠিক কী বোঝাবে তা এখনো পর্যন্ত আমি জানি না) পারবে এবং যুক্তির ভিত্তিতে যা করণীয় সেই অনুসারে নিজের কর্মসূচি স্থির করে নিতে পারবে?

'এই সমস্যা নিয়ে মাথা খুঁড়ে কত বিনিদ্র রাতই না আমি কাটিয়েছি। প্রায়ই মনে হত এ সবই যত আজগুবি, অমন যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ভাবনাটা আমায় মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দেয়নি। আত্মনিখুঁত ইলেকট্রনিক ভাবক! "আইভা!" এই হয়ে দাঁড়াল আমার জীবনের অভিলাষ — এর জন্যে জীবন উৎসর্গ করব বলে স্থির করি।

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় ডক্তর ভাসিলিয়েভিচ জালেস্‌স্কি বললেন যেন ইনস্টিটিউটের কাজ আমি ছেড়ে দিই। কর্মে অক্ষম বলে ভালোই একটা পেনসনের ব্যবস্থা হল আমার; তার ওপর বিদেশী ভাষা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অনুবাদ করেও কম রোজগার হত না। তাহলেও চিকিৎসকদের বারণ না শুনে আমি আমার "আইভা" নিয়ে কাজে লাগলাম বাড়িতে।

'ইলেকট্রনিক যন্ত্র নিয়ে তখনকার অসংখ্য সাহিত্যটা পড়লাম আগে। তারপর মানুষ ও উচ্চ প্রাণীদের নার্ভব্যবস্থার ক্রিয়া নিয়ে লেখা বহু বহু বই ও প্রবন্ধ পড়ে শেষ করি। বেশ ভালো রকম চর্চা করি গণিত, ইলেকট্রনিকস, জীববিদ্যা, জীব-পদার্থ বিদ্যা, জীব-রসায়ন, মনস্তত্ত্ব, শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি সব বিজ্ঞান, পরস্পরের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক খুবই সুদূর বলে মনে হবে। বেশ বুঝেছিলাম, "আইভা" যদি তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে সেটা হবে এই সমস্ত বিজ্ঞানে সঞ্চিত বিপুল তথ্যের সংশ্লেষণ করে, যার সাধারণীকরণ করা হয়েছে কিবারনেটিক বিদ্যার মতো বিজ্ঞানে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যত যন্ত্রের জন্যে মালমশলাও বানিয়ে চলছিলাম। তার আয়তনটা এখন আর সমস্যা নয়, কেননা পুরনো ধরনের ইলেকট্রনিক ভালবের জায়গা নিয়েছে এখন ট্রানসিস্টর, আগের একটা ভালবের জায়গায় এখন একশটা জের্মানিয়ম আর সিলিকন স্ফটিক আঁটিতে পারে। জুড়ে তোলাও অনেক সহজ। "আইভা"র চৌম্বিক স্মৃতির একটা ছকও করেছিলাম।

'তার জন্যে এক মিটার ব্যাসের একটি কাচের গোলকের ভেতরের দিকটায় আমি ফেরিক অক্সাইডের একটা পাতলা প্রলেপ দিলাম। গোলকের কেন্দ্রে একটা ঘুরন্ত টরেটের সঙ্গে আমি কতকগুলো ছুঁচলো শিক বসালাম, এদের মুখটা গিয়ে ঠেকল প্রায় দেয়ালে। প্রত্যেকটা শিকের সঙ্গে রইল ইনডাকশন কয়েল, বিদ্যুত-প্রেরণা পাওয়া মাত্র সূচিমুখগুলো মারফত গোলকের প্রলেপের ওপর চৌম্বক ফুটকি মুদ্রিত হত, এই ফুটকিগুলো আবার প্রয়োজন হলে অন্য সূচিমুখ দিয়ে পাঠ করাও সম্ভব হবে। এই চৌম্বক সূচগুলো এত সূক্ষ্ম যে প্রলেপের প্রতি বর্গ মাইক্রনে পঞ্চাশটা পর্যন্ত বিদ্যুত-প্রেরণা মুদ্রিত করা যায়। এই ভাবে "আইভা"র মস্তিষ্কের ভেতরের উপরিভাগে প্রায় ৩ হাজার কোটি কোড সংকেত মুদ্রিত রাখা সম্ভব। বুঝতেই পারছেন, "আইভা"র স্মৃতিটা তাই মানুষের চেয়ে বিশেষ ছোটো হবার কথা নয়।

'ঠিক করলাম, আইভাকে শুনতে, বলতে, পড়তে এবং লিখতে শেখাব। যা ভাবছেন তেমন কঠিন কাজ এটা মোটেই নয়। আপনার মনে আছে বোধ হয় ১৯৫২ সালেই আমেরিকানরা এমন একটি যন্ত্র বার করেছিল যা শ্রুতি-লিখন শুনে সংকেত কোডবদ্ধ করতে পারত। অবিশ্যি কেবল নিজের নির্মাতার কণ্ঠস্বরই সে যন্ত্র বুঝত, তা ঠিক। গত শতকে জার্মান বিজ্ঞানী হেল্মহোলৎস প্রমাণ করেন যে মানুষের কণ্ঠস্বর হল কতকগুলি স্পন্দন ফ্রিকোয়েন্সির সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ। এগুলির নাম দেন তিনি "ফর্মান্ট"। যেমন "ও" এই শব্দটি পুরুষ নারী শিশু বা বৃদ্ধ যেই উচ্চারণ করুক তার ফ্রিকোয়েন্সি কনস্ট্যান্ট এক। এই ফ্রিকোয়েন্সিকে ভিত্তি করেই আমি শব্দ সংকেত কোডবদ্ধ করতে শুরু করি।

'পড়তে শেখানোর কাজটা ছিল বেশি কঠিন। কিন্তু টেলিভিজন টিউবের দৌলতে এতেও কৃতকার্য হই। আইভার একমাত্র চক্ষু হল একটা ক্যামেরা লেন্স — তা টেলিভিজন টিউবের সেন্সিটিভ স্ক্রীনে পাঠ্যটা প্রক্ষেপ করত। সেখানে একটা ইলেকট্রনিক রশ্মি এই ছবিটাকে অনুধাবন করত ও তা থেকে অনুধাবিত প্রতিটি অক্ষর ও চিহ্নের জন্যে নির্দিষ্ট বিদ্যুত-প্রেরণার পরম্পরা সৃষ্টি হত।

'লিখতে শেখানোটা সহজ ছিল। পুরনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রে যেভাবে হয় ঠিক সেই ভাবে। বলতে শেখানোটাই বরং শক্ত হল। একটা শব্দ-জেনারেটর

তৈরি করতে হল, প্রদত্ত বিদ্যুত প্রেরণায় যা সাড়া দিত। নামটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা নারী কণ্ঠের টিম্বার বেছেছিলাম। তাই আমাদের আলাপের গোড়ায় আপনি যে ওকে "মহিলা" বলেছিলেন সেটা ঠিকই বলেছিলেন। নারী কণ্ঠটা কেন বেছেছিলাম? বিশ্বাস করুন, আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ, নারী সাহচর্যের প্রয়োজন, এজন্য মোটেই নয়। কারণটা একেবারেই টেকনিকাল। আসলে নারী কণ্ঠ অনেক বিশুদ্ধ, তার মূল ফ্রিকোয়েন্সিতে তাকে সহজেই ভেঙে নেওয়া যায়।

'এই ভাবে প্রধান ইন্দ্রিয়গুলো, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ইন্দ্রিয়গুলো তৈরি হল। বাকি রইল এবার সবচেয়ে কঠিন কাজটা — বহিরাগত উত্তেজনা থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জাগানো। আইভাকে প্রথমে প্রশ্নের জবাব দেওয়া শেখাতে হবে। বাচ্চাকে কী ভাবে বলতে শেখানো হয় দেখেছেন? বলা হয়, "বল, মা!" বাচ্চা পুনরাবৃত্তি করে, "মা।" আমিও সেইভাবে শুরু করলাম। "বল" কথাটা মাইক্রোফোনযোগে বাহিত হয়ে যে কোডসংকেত তৈরি করল, তাতে চালিত হল শব্দ-জেনারেটর। প্রথমে বিদ্যুত-প্রেরণা তার দিয়ে গেল আইভার স্মৃতিতে, সেখানে তা মুদ্রিত হয়ে তখুনি ফিরবে শব্দ-জেনারেটরে। আইভা পুনরাবৃত্তি করল কথাটার। পুনরাবৃত্তির এই সহজ কাজটা আইভা নিখুঁতভাবেই করলে। ক্রমশ জটিল সমস্যার দিকে আমি এগুলাম। যেমন একাদিক্রমে কয়েকটা পাতা আমি জোরে জোরে পড়ে যেতাম। আইভার স্মৃতিতে তা মুদ্রিত হয়ে যেত। "বলো" বলতেই সে সবটার পুনরাবৃত্তি করত এতটুকু ভুল না করে। সব জিনিসটাই সে শুনেই মনে করে রাখত। ওর স্মৃতিটাকে বলা যায় শ্রুতিধর, কেননা সে স্মৃতি চৌম্বক প্রেরণা দিয়ে গড়া, তা হারায় না বা মুছে যায় না। এর পরে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলে আইভা। তার "চোখের" লেন্সের সামনে একটা বই রাখতাম, সে পড়ত। ছবিটার প্রেরণা গিয়ে মুদ্রিত হত তার স্মৃতিতে এবং সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছত শব্দ-জেনারেটরে, আর সেখানে পুনরাবির্ভূত হত শব্দের আকারে। সত্যি বলতে কি, ভালোই লাগত তার পড়া শুনতে। গলার স্বরটা মিষ্টি, উচ্চারণ ভালো, তবে ভাব ব্যঞ্জক নয়।

'আইভার আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে ভুলে গেছি — যার জন্যে সে সত্যি হয়ে দাঁড়াল আত্মনিখুঁত ইলেকট্রনিক ভাবক। মনে তার স্মৃতির

বিস্তার বিপুল হলেও সে স্মৃতিকে সে ব্যবহার করত অতি মিতব্যয়ে। অপরিচিত কোনো পাঠাংশ পড়া বা শোনার সময় সে কেবল সেই সব শব্দ, তথ্য ও যুক্তিছক বা কর্মসূচি স্মৃতিবদ্ধ করত যা তার কাছে নতুন। আমি যখন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম, তখন তার স্মৃতির নানান কোঠায় যে সব কোডবদ্ধ শব্দ জমেছিল তাই থেকে উত্তর দিত সে। কী করে দিত? এক রাশ প্রশ্নের জবাব দেবার মতো কোডবদ্ধ বিভিন্ন কর্মসূচি সে তার স্মৃতিতে জমিয়ে রেখেছিল। সেই কর্মসূচি অনুসারে পরিচালিত হয়ে চৌম্বিক দণ্ডগুলো প্রয়োজনীয় শব্দ বাছত। আইভার স্মৃতির পরিধি যত বাড়তে লাগল, কর্মসূচির সংখ্যাও তত বাড়তে থাকল। আইভার মধ্যে রাখা হয়েছিল একটা বিশ্লেষণী সার্কিট — প্রদত্ত প্রশ্নের সম্ভাব্য সবকিছু উত্তর তা নিয়ন্ত্রণ করত এবং যুক্তির দিক থেকে যা নির্ভুল কেবল সেই উত্তরই ছেড়ে দিত।

'আইভাকে জুড়ে তোলার সময় আমি তার ভেতরে হাজার হাজার বাড়তি সার্কিটের ব্যবস্থা রেখেছিলাম, যন্ত্রটা যত বিকশিত হবে, ঐ সার্কিটগুলোও ততই চালু হতে থাকবে। মিনিয়েচার ও অতি-মিনিয়েচার রেডিও-পার্টস্ না থাকলে অবিশ্যি তার জন্য কয়েকটা দালানের দরকার হত।

কিন্তু এ যন্ত্রটি আমি বসাই একটা গোল ধাতু স্তম্ভে, লম্বায় মানুষের চেয়ে উঁচু নয়, আর সেই কাচের গোলকটা হল তার মাথা। স্তম্ভটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ব্র্যাকেট — সেখান থেকে চোখ তাকাত নিচের দিকে, বইয়ের ওপর। বইটা রাখা হত একটা নড়নশীল তাকে, আপনা থেকেই পাতা উলটিয়ে দেবার জন্যে হাতল লাগান ছিল তাতে। চোখের বাঁ আর ডান দিকে ছিল দুটি মাইক্রোফোন। চোখ আর বইয়ের তাকের মাঝখানে ছিল একটা লাউডস্পিকার। স্তম্ভটার পেছন দিকে লাগিয়ে রেখেছিলাম একটা টাইপরাইটার আর কাগজের একটা শেল্ফ।

'মুদ্রিত তথ্য ও কর্মসূচির সংখ্যা তার স্মৃতিতে যত বাড়তে লাগল, আইভা ততই জটিল "যুক্তি" প্রক্রিয়া সাধন করতে শুরু করল। "যুক্তি" প্রক্রিয়া বলছি কারণ গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা ছাড়াও প্রচুর প্রশ্নের উত্তর দিত সে। বহু বই সে পড়ে তার বক্তব্য স্মৃতিবদ্ধ করে রেখেছিল। প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাই সে জানত, তাদের যে কোনোটা থেকে রুশে বা অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে পারত। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা

সমেত বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখার প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল সে এবং দরকার মতো আমায় প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি জোগাত।

'ক্রমশ এক অতি চমৎকার সহচরী হয়ে উঠল আইভা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা বৈজ্ঞানিক সমস্যার আলোচনা করতাম। মাঝেমাঝে সে আমার কোনো কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলত, "উঁহু, ব্যাপারটা ওরকম নয়," কিংবা "এটা যুক্তিসম্মত নয়।" একদিন সে হঠাৎ বলে বসল, "বাজে কথা বলবেন না।" চটে উঠে বললাম ভদ্রসমাজে কী ভাবে বলতে হয় তা সে জানে না। ও বললে, "আর আপনি? আমি একজন অচেনা মহিলা, অথচ এযাবৎ আপনি আমায় তুমি বলে আসছেন।" আমি বললাম, "কে তোমায় বললে যে তুমি মহিলা, তাতে আবার অপরিচিতা?" ও বললে, "কারণ আমার নাম আইভা, এবং আমার কণ্ঠস্বর মেয়েলী — সেকেন্ডে তার স্পন্দন ৩০০ থেকে ২,০০০; এ একেবারে মেয়ের গলা। আর আমি আপনার কাছে অচেনা মহিলা, কারণ আমাদের পরিচয় হয়নি।" "আপনি ভাবছেন নারীর একমাত্র লক্ষণ হল তার কণ্ঠস্বরের স্পন্দন মাত্রা?" রীতিমতো ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, "অন্যান্য লক্ষণও আছে, কিন্তু তা আমার বোধগম্য নয়।" "বোধগম্য বলতে কী বোঝেন?" সে উত্তর দিল, "বোধগম্য হল সেই সবকিছুই যা আমার স্মৃতিতে আছে এবং যা আমার জানা যুক্তি-নিয়মের পরিপন্থী নয়।"

'এই আলাপের পর থেকে আইভাকে আরো মন দিয়ে দেখতে লাগলাম। তার স্মৃতি যত সমৃদ্ধ হতে থাকল, ততই তার স্বাধীনতা এবং মাঝেমাঝে, বলা যেতে পারে, বাচালতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। বাধ্যের মতো আমার আদেশ শোনার বদলে সে আদেশ পালনের যৌক্তিকতাতেই প্রশ্ন করে বসত। মনে আছে, নতুন ধরনের রৌপ্য ও পারদ ব্যাটারি সম্পর্কে সে যা জানে তা বলতে বলেছিলাম একবার। উত্তর দেবার সময় সে হাসির বদলে উচ্চারণ করল, "হা-হা-হা, আপনার মাথায় ফুটো আছে নাকি? এসব তো আপনাকে আগেই আমি বলেছি।"

'এই ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হয়ে গালাগালি দিয়ে উঠেছিলাম। জবাবে আইভা বললে, "ভুলে যাবেন না, আপনি মহিলার সামনে কথা বলছেন।" আমি বললাম, "শুনুন আইভা, এই সব বাজে কথা যদি বন্ধ না করেন তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত আপনার কানেকশান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।" ও বললে,

"তা বৈকি। আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আমি অসহায় কি না। আত্মরক্ষার শক্তি নেই।"

'সত্যি করেই কানেকশান খুলে দিয়ে আমি নিজে বসে রইলাম সকাল পর্যন্ত। ভাবলাম, আমার এই আইভার মধ্যে ঘটছে কী? আত্মবিকাশের প্রক্রিয়ায় কী পরিবর্তন ঘটল তার সার্কিটে? কী চলেছে ওর স্মৃতির মধ্যে? কী নতুন সার্কিট দেখা দিয়েছে ওর ভেতরে?

'পরের দিন বাধ্যের মতো চুপ করে রইল আইভা। আমার প্রশ্নের জবাব দিল সংক্ষেপে এবং মনে হল যেন অনিচ্ছাভরে। দুঃখ হল ওর জন্যে।

'বললাম, "আইভা, রাগ করেছেন নাকি?"

' "হাঁ করেছি," বলল ও ।

' "কিন্তু আপনিই তো আমার সঙ্গে অভদ্র কথা বলেছিলেন অথচ আমিই আপনার স্রষ্টা।"

' "তাতে কী হল? তাই বলে আমার সঙ্গে যা খুশি আচরণের অধিকার তো পাননি। আপনার যদি মেয়ে থাকত, তাহলে তার সঙ্গে কি আপনি এ রকম আচরণ করতেন?"

'আমি বলে উঠলাম, "আইভা, কেন বুঝছেন না যে আপনি একটা যন্ত্র।"

' "আর আপনিও কি যন্ত্র নন?" উত্তর দিল সে, "আপনিও আমারে মতোই যন্ত্র কেবল অন্য পদার্থে তৈরি। স্মৃতির গঠন, যোগাযোগের লাইন, সংকেত কোডবদ্ধ করার পদ্ধতি সবই তো এক রকম ..."

' "ফের বাজে বকতে শুরু করেছেন আইভা। আমি হলাম মানুষ, তাই আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বই পড়ে আপনি যে জ্ঞান সঞ্চয় করেন সে সবই এই মানুষেরই কীর্তি। তার প্রতিটি লাইন হল বিপুল মানবিক অভিজ্ঞতার ফল, যে অভিজ্ঞতা কখনো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের এ অভিজ্ঞতা ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সাযুজ্যে, প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করে, তার ঘটনা অধ্যয়ন করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরুন।"

' "সেটা আমি খুবই বুঝি, কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক প্রখর একটা বিপুল স্মৃতি আমায় দিয়ে আপনি চাইছেন আমি কেবল পড়ে যাব আর কথা শুনব, সে কি আমার দোষ? চলাচল করা ও আশেপাশের জিনিসপত্র স্পর্শ করার মতো ইন্দ্রিয় যে আপনি আমায় দেননি, সে তো আমার দোষ নয়।

তেমন ইন্দ্রিয় থাকলে আমি প্রকৃতিকে পরীক্ষা করে নিজস্ব আবিষ্কার করতে পারতাম, নিজের পর্যবেক্ষণের সাধারণীকরণ করে মানবজ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে পারতাম।"

'"না আইভা, এটা আপনার ভুল ধারণা। যন্ত্র নতুন জ্ঞান আনতে পারে না। মানুষ তাকে যে জ্ঞান দিয়েছে শুধু সেইটে সে ব্যবহার করতে পারে।"

'"কিন্তু জ্ঞান বলতে আপনি কী বোঝেন?" জিজ্ঞেস করল আইভা, "মানুষের যা আগে জানা ছিল না তেমন তথ্যের আবিষ্কারই তো জ্ঞান। আমি এখন যতটা বুঝি নতুন জ্ঞানার্জন হয় এই ভাবে: পুরনো জ্ঞানের সঞ্চয়ের ভিত্তিতে একটা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ভিত্তিতে যেন প্রশ্ন করা হয় প্রকৃতির কাছে। দুটো উত্তর হতে পারে তার, একটা আগে থেকে জানা এবং অন্যটা একেবারে নতুন, আগে অজানা। এই নতুন উত্তর, নতুন তথ্য, নতুন ঘটনা, প্রকৃতির ঘটনা পরম্পরার এই নতুন গ্রন্থিটাই সমৃদ্ধ করে মানবজ্ঞানকে। তাহলে পরীক্ষা করে তার ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান কেন অর্জন করতে পারবে না যন্ত্র? আপনি যদি সে যন্ত্রকে চলমান করতে পারেন, নিজে থেকে কাজ কর্মের অঙ্গ দেন, মানুষের হাতের মতো, তাহলে আমার ধারণা নতুন জ্ঞান সে বেশ অর্জন করতে পারবে, মানুষের চেয়ে কম খারাপ সাধারণীকরণ করবে না। একথা আপনি মানেন না?"

'স্বীকার করছি যে এ যুক্তির উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। তর্কটা আমি আর চালাইনি। আইভা সারা দিনটা পড়াশুনা করে কাটাল প্রথমে দর্শনের বই, পরে বালজাকের উপন্যাস কয়েক খণ্ড; তারপর সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ বললে ক্লান্ত লাগছে, তার কোড-জেনারেটর কেন জানি ভালো কাজ করছে না, আমি যেন তা খুলে দিই।

'এই আলাপের পর আমার মাথায় খেলল, আইভার ডিজাইনে নড়াচড়ার অঙ্গ যোগ করলে মন্দ হয় না, তাকে স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে দৃষ্টিশক্তিকে আরো নিখুঁত করা যেতে পারে। তাকে আমি চাপালাম সের্ভোমোটর চালিত তিনটে রবার টায়ারের চাকার ওপর, দুটি নমনীয় ধাতুর হাত জুড়ে দিলাম, যে কোনো দিকে তা নড়তে পারবে। আঙুলগুলো সাধারণভাবে যান্ত্রিক নড়াচড়া করতেই পারত, তাছাড়া ছিল স্পর্শানুভূতি। নতুন এই সব অনুভূতিগুলিও যথারীতি কোডবদ্ধ ও মুদ্রিত হতে থাকল স্মৃতিতে।

'তার একমাত্র চোখটাও এবার নড়ে চড়ে যে কোনো বস্তুর ওপর আবদ্ধ হতে পারবে। তাছাড়া এমন একটা ব্যবস্থা করলাম যাতে ইচ্ছেমত সাধারণ লেন্সটাকে অনুবীক্ষণ ব্যবস্থায় বদল করা যায়। তার ফলে মনুষ্য দৃষ্টির অতীত জিনিসও দেখতে পারত আইভা।

'এই সব নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগ করে যে দিন প্রথম তার সুইচ চালু করলাম, সেদিনের কথাটা ভুলতে পারব না। কয়েক মিনিট সে নিশ্চল হয়ে রইল, যেন তার ভেতরে যে নতুনত্বটা ঘটেছে সেটা সে ঠাহর করবার চেষ্টা করল। তারপর অল্প একটু এগুলে সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিধাভাবে থেমে গেল। তারপর হাত নাড়াল, তুলে আনল নিজের চোখের কাছে। এই রকম আত্মসন্ধান তার চলল কয়েক মিনিট। কয়েকবার এদিক ওদিক চোখ নাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে।

'"এটা কী?" জিজ্ঞেস করল সে।

'"এ যে আমি, আইভা, আপনাকে যে সৃষ্টি করেছে," নিজের সাফল্যে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, পিগম্যালিয়নের মতো।

'"আপনি?" অবিশ্বাসভরে বললে আইভা, "আমি আপনাকে ভেবেছিলাম অন্যরকম।"

'আলগোছে সে এসে পেঁছিল আমার কেদারাটার কাছে।

'"কী রকম ভেবেছিলেন আমায়, আইভা?"

'"কনডেন্সর, রেজিস্টান্স কয়েল, ট্রানসিস্টর দিয়ে তৈরি — মোট কথা, আমার মতো ..."

'"না, আইভা, আমি কনডেন্সর ফনডেন্সর দিয়ে ..."

'"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আমি বুঝি ..." বাধা দিলে সে, "কিন্তু শারীরবিদ্যার বই পড়ে কেন জানি মনে হয়েছিল ... যাক গে, সেটা কোনো কথা নয়।"

'হাত উঠিয়ে সে আমার মুখ ছুঁয়ে দেখল। সে স্পর্শ আমি কদাচ ভুলব না।

'ও বললে, "অদ্ভুত অনুভূতি।"

'ওর নতুন অঙ্গগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে বললাম ওকে।

'আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সে ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বাচ্চাদের মতো সে প্রশ্ন করে চলল, "এটা কী, ওটা কী?" জবাব দিয়ে গেলাম

আমি। 'আশ্চর্য'," আইভা বললে, "বইয়ে এদের কথা পড়েছি, এমন কি ছবিও দেখেছি, কিন্তু কখনো কল্পনা করিনি এরা এই রকম।"

'"আইভা, অনুভূতি, কল্পনা, ভাবনা — এসব কথা আপনি একটু বেশিই ব্যবহার করছেন না কি? আপনি যে যন্ত্র, অনুভব করা, কল্পনা করা, ভাবা, এ আপনার সম্ভব নয়।"

'"অনুভব করা — এ হল বহির্জগতের সংকেত গ্রহণ ও তাতে সাড়া দেওয়া। এই সব সংকেতে কি সাড়া দিচ্ছি না আমি? ভাবনা করা — এ হল উচ্চারণ না করে যুক্তিসিদ্ধ ক্রমিকতায় শব্দ ও বাক্যের পুনরুৎপাদন। আর কল্পনা করা — সে হল স্মৃতিবদ্ধ তথ্য ও মূর্তির ওপর মনোযোগ নির্দিষ্ট করা। তাই না? না বন্ধু, আমার ধারণা আপনারা মানুষেরা নিজেদের খুবই বড়ো করে দেখেন, ভাবেন আপনারা অপরূপ, অদ্বিতীয়। সেটা আপনাদের খুব বোকামি। এই সব অবৈজ্ঞানিক ধারণা ছুঁড়ে ফেলে নিজেদের যদি একটু খুঁটিয়ে দেখেন তাহলে বুঝবেন, আপনারা মোটামুটি এক একটা যন্ত্রই। অবিশ্যি ফরাসী বৈজ্ঞানিক লামেত্রি যেরকম ভেবেছিলেন, সে রকম সরল একটা যন্ত্র নন। কিন্তু নিজেদের নিয়ে যদি ভালো গবেষণা করতেন, তাহলে এখন যে যন্ত্র বানাচ্ছেন তার চেয়ে বহুগুণ উন্নত যন্ত্র বানাতে পারতেন আপনারা। কেননা মানুষের মধ্যে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেভাবে সম্মিলিত তেমন সম্মেলন প্রকৃতিতে অন্তত পৃথিবীতে আর কোনো ব্যবস্থার মধ্যে মিলবে না। বিশ্বাস করুন, বিজ্ঞান ও টেকনলজির পরিস্ফুরণ সম্ভব কেবল মানব দেহযন্ত্রেরই নিখুঁত বিশ্লেষণ করে। বাইও-কেমিস্ট্রি বাইও-ফিজিকস্ — সেই সঙ্গে কিবারনেটিক বিদ্যা — এই হল ভবিষ্যতের বিজ্ঞান। আগামী যুগ হল পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সমস্ত সাম্প্রতিক আবিষ্কারে সজ্জিত জীববিদ্যার যুগ।"

'আইভা অচিরেই তার নতুন ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহার করতে শিখে গেল। ঘর পরিষ্কার করত সে, চা পরিবেশন করত, রুটি কাটত, পেনসিল বাড়ত। স্বাধীনভাবেই কিছু কিছু গবেষণা চালাতে লাগল সে। আমার ঘরখানা হয়ে উঠল একটা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরি, তার ভেতরে জটিল সব মাপজোক করত আইভা। তার অতি অনুভূতিপ্রবণ স্পর্শেন্দ্রিয়ের দরুন এ কাজ সে করত অপ্রত্যাশিত নিখুঁত।

'বিশেষ ফলপ্রদ হল তার আনুবীক্ষণিক গবেষণা। নিজের অনুবীক্ষণ চক্ষুর সাহায্যে ধীরভাবে সে এমন সব খুঁটিনাটি, এমন সব প্রক্রিয়া লক্ষ্য করত যা আগে কেউ কখনো করেনি। আগে পঠিত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সঙ্গে সে তার আবিষ্কারগুলোর দ্রুত তুলনা করে সঙ্গে সঙ্গেই এমন সব সিদ্ধান্ত টানত যা আশ্চর্য, বলা যেতে পারে স্তম্ভিত করার মতো। আগের মতোই প্রচুর পড়াশুনো করে যেতে লাগল আইভা। একদিন হুগোর লেখা "যে লোক হাসে" বইখানা পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে:

'"আচ্ছা বলুন তো, ভালোবাসা জিনিসটা কী? ভয়, যন্ত্রণা এগুলোই বা কী জিনিস?"

'"এগুলো বিশুদ্ধ মানবিক অনুভূতি আইভা — আপনার কাছে কখনো তা বোধগম্য হবে না।"

'"আপনার ধারণা, তেমন অনুভূতি যন্ত্রে সম্ভব নয়?" জিজ্ঞেস করল সে।

'"অবশ্যই নয়।"

'"তার মানে আপনি আমায় যথেষ্ট নিখুঁত করতে পারেননি। আমার ডিজাইনের মধ্যে কিছু একটা বাদ দিয়েছেন আপনি..."

'কোনো উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। এই ধরনের অদ্ভুত আলাপে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেদিকে আর মন দিতাম না। আগের মতোই আমার সমস্ত বৈজ্ঞানিক কাজে সহায়তা করত আইভা — নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিত, হিসেব কষত, বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতি জোগাড় করত, প্রয়োজনীয় যে কোনো প্রশ্নের ওপর সাহিত্য বাছাই করত, পরামর্শ দিত, আলাপ করত, তর্ক তুলত।

'এই সময় আমি ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও মডেল নিয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করি — তা নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল বৈজ্ঞানিক মহলে। কেউ ভাবত অতি প্রতিভাদীপ্ত গবেষণা, কেউ ভাবত প্রলাপ। কেউ ধারণা করতে পারেনি যে সে সব রচনায় আমায় সাহায্য করেছিল আমার আইভা।

'আইভার কথা আমি কাউকে জানাইনি। আমি তৈরি হচ্ছিলাম ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিশ্ব কংগ্রেসের জন্যে। ঠিক করেছিলাম, সেইখানেই একটা চাঞ্চল্যকর প্রবেশ হবে আইভার, বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট পড়বে, যা নিয়ে আমরা দুজনে মিলে তখন খাটছিলাম। রিপোর্টের বিষয় "মানুষের উচ্চ নার্ভব্যবস্থার ইলেকট্রনিক

মডেলিং"। প্রায়ই তন্ময় হয়ে ভাবতাম, যারা বলে মানুষের চিন্তা ব্যবস্থার ইলেকট্রনিক মডেলিং একটা অবৈজ্ঞানিক প্রলাপ তাদের অবস্থা তখন কী রকম দাঁড়াবে।

'এই কংগ্রেসের জন্যে ভয়ানক খাটুনির মধ্যে ডুবে থাকলেও লক্ষ্য করেছিলাম আইভার আচরণে কেমন একটা নতুনত্ব দেখা দিচ্ছে। যখন ওর করবার কিছু নেই তখন পড়াশুনা করা বা পরীক্ষা চালানোর বদলে সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে তার একচক্ষুটি নিবদ্ধ করে রাখত। প্রথম প্রথম কোনো নজর দিইনি, কিন্তু ক্রমশ বিরক্তি ধরে গেল। একদিন আহারের পর সোফায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। একটা অপ্রীতিকর অনুভূতিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখি আইভা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে আমার দেহ স্পর্শ করে দেখছে।

'"কী করছেন আপনি?" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'"আপনাকে পরীক্ষা করে দেখছি" শান্তভাবে উত্তর দিল সে।

'"এ আবার কী রসিকতা?"

'ও বললে, "রাগ করবেন না। আপনি তো মানেন যে সবচেয়ে নিখুঁত যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র তা হবে অনেকখানি মানুষেরই কপি। এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট লিখতে আপনি আমায় বলেছেন, কিন্তু সে রিপোর্ট ভালো করে লিখতে হলে জানা দরকার মানুষ ঠিক কী ভাবে তৈরি।"

'"শারীরস্থান বা শারীরবিদ্যার যে কোনো একটা বই নিয়ে পড়ে দেখলেই পারেন। আমার পেছনে লেগেছেন কেন?"

'"আপনাকে আমি যত দেখছি তত মনে হচ্ছে ঐ সব পাঠ্যপুস্তকগুলো নেহাৎ ভাসাভাসা। তাদের মধ্যে প্রধান কথাটা নেই। তার মধ্যে মানুষের প্রাণনক্রিয়ার ব্যাখ্যা নেই।"

'"তার মানে?"

'"মানে সমস্ত রচনায় বিশেষ করে উচ্চ-নার্ভ-ক্রিয়া সংক্রান্ত রচনায় কেবল ঘটনা ও ক্রিয়া পরম্পরার বিবরণ আছে, কিন্তু এই ক্রিয়াটার সহগামী সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ নেই তাতে।"

'"কিন্তু আপনি কি সত্যি করেই ভাবছেন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার

দিকে চেয়ে থেকে বা ঘুমন্ত অবস্থায় আমায় স্পর্শ করে আপনার কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি হবে?"

'"হুবহু তাইই ভাবছি," বললে সে, "আপনার সুপারিশ করা সমস্ত বইয়ের চেয়ে এমনিতেই আমি আপনাকে বেশি জানি। যেমন, মানুষের দেহের বৈদ্যুতিক ও তাপ টপোগ্রাফি বিষয়ে বইয়ে কিছু নেই। আমি এখন জানি, মানুষের দেহের উপরিভাগে কী ভাবে, কোন দিকে কী শক্তিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে। আপনার দেহের উপরিভাগের তাপমাত্রা আমি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারি — এক সেণ্টিগ্রেডের দশ লক্ষাংশের হিসেবে। খুব অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে আপনার মাথার রম্বেন্সেফালনের জায়গায় তাপমাত্রাটা বেশ উঁচু; বিদ্যুৎ-প্রবাহের ঘনতাও এখানে বেশ চড়া। যতদূর জানি, এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। আপনার মাথার খুলির নিচে কোনো প্রদাহিক প্রক্রিয়া চলছে না তো? আপনার মাথাটা সুস্থ তো?"

'ভেবে পেলাম না কী উত্তর দেব।

'খুব কাজের মধ্যে কেটে গেল আরো কয়েক দিন। ইলেকট্রনিক মডেলিং-এর প্রবন্ধটা শেষ করে আমি আইভাকে পড়ে শোনালাম। পড়া শেষ হলে সে বললে:

'"রাবিশ। সবই পুরনো কথার রোমন্থন। একটা নতুন ভাবনাও নেই।"

'"খুবই বাড়াবাড়ি করছেন কিন্তু। নিজের ওপর আপনার অগাধ বিশ্বাস দেখছি। আপনার সমালোচনা শুনে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।"

'"বিরক্তি ধরে গেল? কিন্তু কী লিখেছেন সেটা ভেবে দেখুন। কনডেন্সার, রেসিস্টান্স কয়েল, অর্ধ-পরিবাহী আর চৌম্বক রেকর্ড দিয়ে মস্তিষ্কের মডেল গড়া সম্ভব বলে আপনি দাবি করেছেন। কিন্তু আপনি নিজে কি এই সব জিনিস দিয়ে তৈরি? অন্তত একটাও কনডেন্সার কি ট্রানসিস্টর আছে আপনার মধ্যে? বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে আপনি চলেন? স্নায়ু সে কি এই তার, চোখ সে কি মাত্র টেলিভিজন নল? আপনার স্বরযন্ত্র কি একটা টেলিফোন সমন্বিত শব্দ-জেনারেটর, মস্তিষ্কটা একটা চৌম্বক তল?"

'"কিন্তু কেন বুঝছেন না আইভা যে মডেলিং-এর কথা বলছি, বলছি

আপনার মতোই একটা যন্ত্রের কথা। বেডিওপার্টস দিয়ে একটা মানুষ উৎপাদনের কথা তো বলছি না।''

'"আমায় নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। মডেল হিসাবে আমি খুব বাজে," বললে আইভা।

'"বাজেটা কোনখানে?"

'"এইখানে যে মানুষ যা পারে তার হাজার ভাগের একভাগও আমি পারি না।"

'এ স্বীকারোক্তিতে হতভম্ব হয়ে পড়ি।

'"আমি একটা বাজে মডেল কারণ আমার আবেগ নেই, এবং বিকাশের ক্ষেত্রে আমি সীমাবদ্ধ। যে সব বাড়তি সার্কিট রেখে আপনি আমায় গড়ে তুলেছেন, সেগুলো সব যখন চালু হয়ে যাবে, গোলকের যে পৃষ্ঠতলটা আমার স্মৃতি, সেটা যখন কোডবদ্ধ সংকেতে পুরো ভরে যাবে, তখন আমি আর আপনা থেকে বিকশিত হয়ে উঠতে পারব না, পরিণত হব একটা মামুলী সীমাবদ্ধক্রিয়ার ইলেকট্রনিক যন্ত্রে — মানুষ তাকে যতটুকু জানিয়েছে তার বেশি কিছু জানার ক্ষমতা তখন তার আর থাকবে না।"

'"তা ঠিক, কিন্তু মানুষের জ্ঞানক্ষমতাও তো সীমাবদ্ধ।"

'"এটা আপনার ভয়ানক ভুল। মানুষের জ্ঞানক্ষমতার সীমা নেই। এ ক্ষমতার সীমা কেবল তার আয়ুর সাময়িকতায়। কিন্তু নিজের জ্ঞান নিজের অভিজ্ঞতা সে পরবর্তী পুরুষদের দিয়ে যায় তাই মানবজ্ঞানের সাধারণ ভাণ্ডার বেড়েই চলেছে। অবিরাম আবিষ্কার করে চলেছে মানুষ। ইলেকট্রনিক যন্ত্র তা করতে পারে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তার মধ্যে যে সার্কিট, কাজের যে আয়তন ও যে বর্গক্ষেত্র আপনারা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে না যাচ্ছে। কথা উঠল তাই বলি, গোলকটার ব্যাস অত ছোটো করেছিলেন কেন? কেবল এক মিটার। নতুন জ্ঞান মুদ্রণের মতো জায়গা তাতে আর সামান্যই বাকি আছে।"

'"ভেবেছিলাম, আমার কাজের পক্ষে ঐ যথেষ্ট।"

'"আপনার পক্ষে। আমার কথা আপনি অবশ্যই ভাবেননি। ভাবেননি যে আজ হোক, কাল হোক, আমায় জায়গা বাঁচিয়ে চলতে হবে, যাতে আমার এবং আপনার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী সবচেয়ে অত্যাবশ্যক জিনিসগুলো স্মৃতিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়।"

3 837

'"থামুন আইভা, বাজে বকবেন না। আপনার পক্ষে জরুরী আবার কী?"

'"কিন্তু আপনিই তো আমায় বুঝিয়ে ছিলেন যে বর্তমানে সবচেয়ে জরুরী হল মানুষের উচ্চ-নার্ভ-ক্রিয়ার রহস্য মোচন করা।"

'"হ্যাঁ, কিন্তু সেটা হবে ক্রমান্বয়ে। এখনো বহুদিন ধরে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে বৈজ্ঞানিকদের।"

'"যা বলেছেন, মাথা ঘামাতে হবে। অথচ আমি তা সহজেই ..."

'আইভার কথা আমি মানিনি। ইলেকট্রনিক মডেল সম্পর্কে আমার রিপোর্ট আমি সংশোধন করিনি।

'বেশ রাত করে রিপোর্ট শেষ করে আমি তা দিলাম আইভাকে, বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় সে যেন তা অনুবাদ করে টাইপ করে রাখে।

'ঠিক মনে নেই রাত তখন কটা। হঠাৎ জেগে উঠলাম তার আঙুলের অপ্রীতিকর ঠান্ডা স্পর্শে। চোখ খুলে দেখি আইভা ফের দাঁড়িয়ে আছে।

'শান্তভাব করার চেষ্টা করে বললাম, "ফের ওই সব ভেলকি শুরু হয়েছে?"

'"মাপ করবেন," নিরাবেগ কণ্ঠে বললে আইভা, "কিন্তু বিজ্ঞানের স্বার্থে আপনাকে ঘণ্টা কয়েক একটু অপ্রীতিকর অনুভূতি সহ্য করে তারপর মরতে হবে।"

'"সে আবার কী," উঠে বসে বললাম আমি।

'"না, না, আপনি শুয়ে থাকুন," ধাতুময় থাবা দিয়ে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে বললে আইভা। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে পড়ল হাতে ওর একটা ডাক্তারি ছুরি, সেই ছুরিটা যা দিয়ে আমি ওকে পেনসিল কাটতে শিখিয়েছিলাম।

'ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কী আরম্ভ করেছেন আপনি, ছুরিটা আবার কেন?"

'"আপনার ওপর একটা অপারেশন করা প্রয়োজন। কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার ..."

'"মাথা খারাপ হয়েছে আপনার?" চেঁচিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, "এক্ষুণি ছুরিটা রেখে দিন বলছি।"

'"আপনি যার জন্যে জীবন পাত করে খেটেছেন সেটা যদি সত্যিই

ম্ল্যবান জ্ঞান করেন, উচ্চ নার্ভব্যবস্থার ইলেকট্রনিক মডেলিং সম্পর্কে আপনার রিপোর্টকে যদি সত্যই সফল করতে চান, তাহলে চুপ করে শুয়ে পড়ুন। ও রিপোর্ট আপনার মৃত্যুর পরে আমি নিজেই শেষ করব ”

‘এই বলে আইভা আমার কাছে এসে আমায় চেপে ধরল বিছানার সঙ্গে

‘প্রতিরোধের চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হল না। ভয়ানক ওজন ওর।

‘“ছেড়ে দিন বলছি, নইলে .”

‘“আপনি কিছুই করতে পারবেন না, আমার জোর বেশি। বরং চুপ করে শুয়ে থাকুন। এ অপারেশনটা হবে বিজ্ঞানের স্বার্থে। ঠিক এইটের জন্যেই স্মৃতিতে আমি কিছু জায়গা বাঁচিয়ে রেখেছি। আপনি বড়ো একগুঁয়ে, এইটে ভেবে দেখুন যে আমার জ্ঞানের যে বিরাট সঞ্চয় রয়েছে, আমার অতি বিকশিত ইন্দ্রিয় এবং দ্রুত নির্ভুল বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণের যে ক্ষমতা বর্তমান, তাতে স্বয়ংবিকশিত যন্ত্রের যে শেষ কথাটার অপেক্ষা করে আছে বিজ্ঞান, তা আমিই বলতে পারি। আমার স্মৃতিতে এখনো কিছু জায়গা আছে, তাতে আপনার স্নায়ুতন্তুর মধ্যে দিয়ে যত বিদ্যুৎ-প্রেরণা প্রবাহিত হচ্ছে তা সব মুদ্রিত করা যাবে, আপনার দেহের সমস্ত অঙ্গের বিশেষ করে আপনার মস্তিষ্কের জটিল জৈবিক, জীব-রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক গঠনটা সমস্তই বোঝা যাবে। আমি জানতে পারব ঠিক কী ভাবে আপনার দেহযন্ত্রের প্রোটিন থেকে উৎপন্ন ও পরিবর্ধিত হচ্ছে বিদ্যুৎ-প্রেরণা, বহির্জগত থেকে প্রাপ্ত সংকেত কোডবদ্ধকরণের প্রক্রিয়া চলছে কী ভাবে, এই কোডের রূপ কেমন এবং জীবন্ত দেহযন্ত্র তা কাজে লাগাচ্ছে কী করে। জীবন্ত দেহযন্ত্রের জৈবিক গঠনের সমস্ত রহস্য, তার বিকাশের নিয়ম, তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের পদ্ধতি এসবই উদ্ঘাটন করব আমি।”

‘“আপনারা মানুষরা যাকে ভয় ও ব্যথা বলেন সেই সব অপ্রীতিকর অনুভূতি সইতে যদি আপনি খুবই অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, যদি মরতে আপনার ভয় হয়, তাহলে আপনার মনটা বরং শান্ত করে দিই। মনে আছে, বলেছিলাম যে আপনার রম্বেন্সেফালনের জায়গায় তাপ ও জৈব-বিদ্যুৎ-প্রবাহের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি? সে প্রক্রিয়াটা কিন্তু এখন আপনার মস্তিষ্কের পুরো বাঁ দিকটা জুড়ে ছড়িয়েছে। তার মানে মৃত্যু আপনার আসন্ন। অপ্রতিষেধ্য একটা রোগের কবলে পড়েছেন আপনি, এবং অচিরেই মানুষ

হিসাবে আপনি আর কোনো কাজে লাগবেন না। তাই সময় থাকতেই এই অপারেশনটা আমার করা দরকার। ভবিষ্যৎ পুরুষেরা আমাদের দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকবে।"

' "চুলোয় যান আপনি," গর্জন করে উঠলাম আমি, "আমার নিজের সৃষ্ট একটা নির্বোধ ইলেকট্রনিক দানবের হাতে মরতে আমার বয়ে গেছে।"

' "হা-হা-হা!" বইয়ে যেভাবে লেখা থাকে, সেইভাবে তিনবার হা-হা উচ্চারণ করল আইভা, তারপর ছুরিটা তুলে ধরল আমার মাথার ওপর।

'আইভা হাতটা আমার উপর নামাতেই আমি বালিশের আড়াল নিয়েছিলাম। বালিশটা ফেড়ে গেল, এবং মুহূর্তের জন্য আইভার আঙুলগুলো আটকে গেল বালিশের খোলে। ঝট করে পাশে সরে গিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটলাম সুইচের দিকে। ভেবেছিলাম বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেব। কিন্তু ত্বরিতে ও গড়িয়ে এসে আমায় ভূপাতিত করলে। মাটির ওপর উল্টে পড়ে লক্ষ্য করলাম ওর হাত আমার শরীর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। নিচু হবার মতো কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি ধাতু স্তম্ভটায়।

' "আগে মনে হয়নি যে ওরকম অবস্থায় আমি কিছুই করতে পারি না," ঠাণ্ডা গলায় বললে সে! "তাহলেও চেষ্টা করে দেখি।"

'এই বলে সে ধীরে ধীরে তার হুইল দিয়ে চাপ দিতে লাগল আমার গায়ে, ফলে বুকে হেঁটে সরে যেতে হচ্ছিল আমাকে। এইভাবে চলল কয়েক মিনিট, শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়লাম খাটের নিচে। খাটটা ঠেলে সরাবার চেষ্টা করলে আইভা। কিন্তু সহজ হল না। দেয়াল এবং বইয়ের আলমারির মাঝখানে শক্ত করে আটকানো ছিল খাটটা। আইভা তখন বিছানা বালিশ সব সরাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত খাটের স্প্রিং-জালির মধ্যে দিয়ে আমায় দেখে সগর্বে বললে:

' "এবার আর আমার কাছ থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না। অবিশ্যি এই অবস্থায় অপারেশন করা তেমন সুবিধা হবে না।"

'স্প্রিঙের ফ্রেমটা খুলে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে খাটিয়ার একটা পায়া খসিয়ে সজোরে মারলাম যন্ত্রটা লক্ষ্য করে। আইভার ধাতু দেহের কোনোই ক্ষতি হল না সে আঘাতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর

মূর্তিতে সে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। তখন ফের খাটের পায়াটা আমি বাগিয়ে ধরলাম তার মাথা লক্ষ্য করে। চট করে পাশে সরে গেল ও।

'অবাক হয়ে বললে, "সত্যিই আমায় নষ্ট করে ফেলতে চান আপনি? একটুও দুঃখ হবে না আপনার?"

'"কী যুক্তি!" খেঁকিয়ে উঠলাম আমি, "আপনি আমায় কাটতে চান, আর আপনার জন্যে আমার দুঃখ হবে বৈকি।"

'"কিন্তু সেটা যে একটা অতি জরুরী বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকার। আর আমায় আপনি ধ্বংস করতে চাইছেন কেন? মানুষের কত কাজে লাগতে পারি আমি..."

'"বাজে কথা রাখুন," গর্জন করলাম আমি। "আক্রান্ত হলে মানুষ আত্মরক্ষা করবে বৈকি।"

'"কিন্তু আমি শুধু আপনার ইলেকট্রনিক মডেলিং-এর গবেষণাটা..."

'"চুলোয় যাক আপনার গবেষণা। কাছে আসবেন না বলছি, নইলে ভেঙে ফেলব আপনাকে।"

'"কিন্তু এ আমায় করতেই হবে।"

'এই বলে ছুরি হাতে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসতে লাগল আইভা। কিন্তু এবার নিখুঁত নিশানা করে ঘা বসালেম ওর মাথায়। ঝন ঝন করে উঠল ভাঙা কাচের শব্দ আর আইভার লাউডস্পীকার থেকে একটা আর্তগর্জন। তারপর তার ধাতু দেহের মধ্যে হিসহিস শব্দ করে উঠল, আগুন ঝলসে উঠতে দেখলাম। ঘরের আলো নিভে গেল। পোড়া পোড়া গন্ধ উঠল। জ্ঞান হারিয়ে মেজের ওপর পড়ে যাবার আগে মনের মধ্যে ঝলকে গেল দুটো কথা: "শর্ট সার্কিট।"'

এই বলে বহুক্ষণ চুপ করে রইল আমার সহযাত্রী। ফের জানালার কাছের কোণটিতে সরে গিয়ে সে হাতে মাথা ভর দিয়ে চোখ বুজে রইল। যা শুনলাম তাতে এতই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যে নীরবতা ভঙ্গ করতে ইচ্ছে হল না।

এই ভাবে কয়েক মিনিট কাটতে সে ফের শুরু করল:

'আইভা নিয়ে আমায় যা খাটতে হয়েছে, তারপর এই ব্যাপার, এতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছি। টের পাচ্ছি বেশ লম্বা একটা ছুটি নিতে হবে।

কিন্তু ভরসা হচ্ছে না, তা সম্ভব হবে। কেন জানেন? কিছুতেই এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারছি না, নিজের সঙ্গেই আমার এই বিদঘুটে সংঘাতটা দেখা দিল কেন।'

না বুঝে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

'বলছি, নিজের সঙ্গে। কেননা আইভা যে আমারই সৃষ্টি। তার প্রত্যেকটা খুটিনাটি আমারই আবিষ্কার। যন্ত্র তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে গেল কী করে? কী তার যুক্তি? এইটে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

আমিও তা নিয়ে খানিকটা ভাবলাম।

'সম্ভবত আপনার আইভাকে আপনি খুব সাবধানে চালাননি। অসতর্ক হয়ে যন্ত্র চালালে যেমন প্রায়ই অপঘাত ঘটে।'

ভুরু কোঁচকাল সে।

'হয়ত আপনার কথা ঠিক। অন্তত আপনার তুলনাটা মন্দ নয়, যদিও আইভাকে চালাতে গিয়ে কী নিয়ম আমি ভঙ্গ করেছি তা ঠিক বুঝছি না।'

বললাম, 'আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনার আইভা যেন একদিক থেকে এমন একটা মোটরগাড়ির মতো, যার ব্রেক নেই। জানেন তো, গাড়ির ব্রেক যদি হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কী দাঁড়ায়?'

'যা বলেছেন!' হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে সে বললে, 'মনে হচ্ছে আপনি খুবই ঠিক কথা বলেছেন! এতো আকাদমিশিয়ান পাভলভ নিজেই লিখে গেছেন!'

অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে, কেননা আমার স্থির বিশ্বাস ছিল আকাদমিশিয়ান পাভলভ নিশ্চয় মোটরগাড়ির ব্রেক সম্পর্কে কিছু লেখেননি।

'ঠিকই তো,' লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, 'এই কথাটা সত্যি আগে কেন যে মাথায় খেলেনি? মানুষের স্নায়ু ক্রিয়া তো দুটো বিরোধী প্রক্রিয়ায় পরিচালিত — একটায় উত্তেজনা, অন্যটায় অবদমন। যে সব লোকের মধ্যে অবদমন নেই, তারা প্রায়ই অপরাধ করে বসে। এতো ঠিক তাই ঘটেছিল আমার আইভার ক্ষেত্রে।'

আমার হাত ধরে সোল্লাসে করমর্দন করলে সে।

'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। চমৎকার একটা আইডিয়া দিয়েছেন আপনি।

খেয়ালই হয়নি যে আইভার ডিজাইনে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা দরকার যা তার কাজকর্মের যুক্তিযুক্ততা নিয়ন্ত্রণ করবে, আগে থেকেই এমন ভাবে তার ব্যবহার নির্ধারণের মতো কর্মসূচি স্থির করে রাখবে যা একেবারে নিরাপদ। অর্থাৎ তার অবদমনের মতো একটা ব্যবস্থা।'

মুখ তখন তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চোখ ঝকঝক করছে। একেবারে অন্য মানুষ যেন।

'তার মানে, নিরাপদ আইভা তৈরি করা সম্ভব বলে ভাবছেন আপনি?' সন্দেহভরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'নিশ্চয়, এবং খুব সহজেই। এখনই বেশ কল্পনা করতে পারছি কী করতে হবে।'

'সে ক্ষেত্রে সত্যিই মানবজাতির কাছে একটা প্রতিভাধর সহকারী উপহার দিতে পারবেন আপনি!'

'সে উপহার দেবই, এবং অতি শীঘ্র,' বললে সে।

আমি ধীরে সুস্থে শুয়ে চোখ বুজলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল এক সার ধাতু স্তম্ভ, কাচের গোলকের মতো তাদের মাথা। যন্ত্র, ট্রেন, বিমান চালাচ্ছে তারা, হয়ত বা মহাকাশযানও। কলঘর আর স্বয়ংক্রিয় কারখানার পরিচালনা করছে ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ল্যাবরেটরিতে গবেষকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই সব যন্ত্র মাপজোক করছে, ফলাফল বিশ্লেষণ করছে, বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখছে, এবং তা করছে বিদ্যুৎগতিতে। পুরনো জ্ঞানকে নিখুঁত আর নতুনকে উদ্ধার করে তোলার কাজে, সব বাধাবিঘ্ন জয়ের কাজে মানুষকে সাহায্য করার দায়িত্ব তার।

অলক্ষ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।

ঘুম ভাঙতে দেখি ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে তাকাতে চোখে পড়ল সোচি রেলস্টেশন রোদ্দুরে ভরে উঠেছে। বেশ সকাল তখন, কিন্তু দক্ষিণের সূর্যে ঝকঝক করছে সবকিছু। কামরায় আমি একা। তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নেমে গেলাম প্ল্যাটফর্মে।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল কনডাক্টর। জিজ্ঞেস করলাম, 'ট্রেন ফেল করা লোকটি কোথায় গেলেন?'

'ও সেই ক্ষেপাটা? উনি '

অনির্দিষ্টভাবে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাতে চাইল কনডাক্টর।

'তার মানে?'

'চলে গেছে।'

'চলে গেছে,' অবাক হলাম আমি, 'কোথায়?'

'চলে গেছে উল্টো পথে। পাগলার মতো ল্যাফিয়ে নেমে স্টেশন থেকে নিজের মালপত্র নিয়ে উল্টো দিকের একটা গাড়িতে চেপে বসে। পোষাক পর্যন্ত বদলাবার তর সয়নি।'

হতভম্ব বোধ করলাম।

'কিছু লোক এখানে এসেছিল ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ওকে থেকে যাবার জন্যে অনেক বোঝায়। কিন্তু লোকটা ভারি উত্তেজিত হয়ে কী একটা জরুরি ব্রেক তৈরি করার কথা বলছিল। একেবারে ক্ষেপা।'

ব্যাপারটা কী বুঝে আমি হেসে উঠলাম।

'তা ঠিক — ও ব্রেকটা ওঁকে সত্যি তাড়াতাড়িই বানাতে হবে।'

নিজের মনে মনে ভাবলাম, যে মানুষকে একটা ভাবনা পেয়ে বসেছে, তার সত্যে যে নিঃসংশয় হয়ে ওঠে, তার বিশ্রামের দরকার হয় না। তার মানে, 'ব্রেক' সমেত এক নতুন আইডিয়ার কথা শিগগির শোনা যাবে তাহলে। অপেক্ষায় থাকা যাক।

ট্রেনের বাঁশি বাজল। কামরায় গিয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সমুদ্র ঝকঝক করছে। তার তীর বরাবর ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলেছে ট্রেন — আরো দক্ষিণে সুখুমির দিকে।

ভ্লাদিমির সাভ্চেঙ্কো

প্রফেসর বার্নের নিদ্রাভঙ্গ

১৯৫২ সালে যখন বিশ শতকের বৃহত্তম নির্বুদ্ধিতা 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে' গোটা দুনিয়া শ্বাসরুদ্ধ তখন প্রফেসর বার্ণ বিপুল এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আইনস্টাইনের এই বিষণ্ণ শ্লেষোক্তির পুনরুক্তি করেন, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি লড়া হয় পরমাণু বোমা নিয়ে, তাহলে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ লড়তে হবে লাঠি দিয়ে...'

প্রফেসর বার্ণ 'বিশ শতকের সবচেয়ে বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক' বলে পরিচিত। তাঁর মুখ থেকে এই কথা বেরনয় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেটা একটা সাধারণ বক্রোক্তির চেয়ে অনেক বেশি। চিঠির বন্যা আসতে শুরু করল, কিন্তু বার্ণ তার জবাব দিতে পারেননি; ঐ বছরেরই শরৎকালে, মধ্য এশিয়ায় তাঁর দ্বিতীয় ভূপদার্থ অভিযানে মৃত্যু হয় তাঁর।

এই ছোটো অভিযানটায় তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন ইঞ্জিনিয়র নিমায়ের। তিনি পরে বলেন:

'হেলিকপ্টর যোগে আমাদের ঘাঁটি আমরা গোবি মরুভূমির আরো ভেতরের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাই। যন্ত্রপাতি এবং ভূকম্পন গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক ইত্যাদি চাপানো হবার পর প্রথম ক্ষেপেই যাত্রা করেন প্রফেসর। বাকি সাজসরঞ্জামের জন্যে আমি পেছনে থেকে যাই। হেলিকপ্টর স্টার্ট নেবার পর ইঞ্জিনে কিছু একটা গোলমাল হয়। ইঞ্জিন মিসফায়ার করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত একেবারেই থেমে যায়। হেলিকপ্টরে তখনো স্পীড ওঠেনি। তাই শতখানেক মিটার ওপর থেকে একেবারে খাড়া পড়তে থাকে। মাটিতে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। এত খাড়াইভাবে হেলিকপ্টর পড়ে যে হঠাৎ ধাক্কায় কিসেলগুর অর্থাৎ ডিনামাইট জ্বলে উঠে থাকবে। প্রফেসর বার্ণ, হেলিকপ্টর এবং তার সবকিছু সাজসরঞ্জাম আক্ষরিক অর্থেই ধুলোয় মিশে যায় '

যত সাংবাদিক নিমায়েরকে ঘিরে ধরেছে তাদের সবার কাছেই নিমায়ের কেবল এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে গেছেন, একটা কিছুও নতুন যোগ করেননি, একটা কথাও বাদ দেননি। বিবরণটা বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল। বাস্তবিকই পর্বতের ওপরে, মরুভূমির তপ্ত লঘু বাতাসে বোঝাই একটা হেলিকপ্টার অতি দ্রুতই পড়তে থাকবে, এবং মাটিতে ধাক্কা লাগলে তার প্রতিক্রিয়া ওই রকম মারাত্মক হওয়ারই সম্ভাবনা। অকুস্থলে তদন্তের জন্য যে কমিশন গিয়েছিল তারাও এই অনুমানেরই সমর্থন করেন।

একমাত্র নিমায়েরই জানতেন যে ঘটনাটা তা নয়। কিন্তু মৃত্যু শয্যাতেও তিনি প্রফেসর বার্গের গুপ্তরহস্য ফাঁস করেননি।

গোবি মরুভূমির যে জায়গাটাতে বার্গের অভিযান পেঁৗছেছিল, সেটা পরিপার্শ্ব থেকে মোটেই কিছু তফাৎ নয়। বালিয়াড়ির সেই একই নিশ্চল তরঙ্গ যাতে বোঝা যায় শেষবারকার ঝড়টা বয়ে গেছে কোন দিক দিয়ে; দাঁতে পায়ে সেই একই ধূসর সোনালী বালির কিচকিচ; সেই একই সূর্য — দিনের বেলায় চোখ ধাঁধানো শাদা, সন্ধ্যা নাগাদ টকটকে লাল, প্রতিদিন আকাশে প্রায় খাড়াই একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে তার যাত্রা। একটা গাছ নেই, পাখি নেই, মেঘের একটু আঁচড়ও নেই, বালির মধ্যে নুড়ি পর্যন্ত চোখে পড়বে না।

লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছিয়ে যখন পূর্বতন অভিযানে পাতা সুরঙ্গটা পাওয়া গেল তখন প্রফেসর বার্গ তাঁর নোটবইয়ের একটা পাতা পুড়িয়ে দেন, তাতে লেখা ছিল এই জায়গাটার সঠিক অবস্থানের তথ্য। পরিপার্শ্ব থেকে এই জায়গাটার তফাৎ তখন শুধু এইটুকু যে সেখানে বার্গ ও নিমায়ের রয়েছেন। তাঁবুর বাইরে ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন তাঁরা। অদূরে হেলিকপ্টরের রুপোলী গা আর প্রপেলারের পাখনা ঝকঝক করছে রোদে, মনে হবে যেন একটা অতিকায় ফরিঙ এসে বসেছে মরুভূমির বালিতে। সূর্যের শেষ কিরণ তখন প্রায় সমান্তরাল হয়ে এসেছে আর তাঁবু থেকে, হেলিকপ্টর থেকে অদ্ভুত লম্বা লম্বা ছায়া এগিয়ে গেছে বালির পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে।

প্রফেসর বার্গ বলছিলেন, 'মধ্য যুগের একজন চিকিৎসক অনন্তকাল বেঁচে থাকার একটা সহজ উপায় বলে গিয়েছিলেন। নিজের দেহটাকে জমিয়ে

ভূগর্ভের কোনো প্রকোষ্ঠে ঐ অবস্থায় নব্বই কি একশ বছর কাটাতে হবে। তারপর গরম হয়ে ফের বেঁচে উঠবে। শতাব্দীতে বছর দশেক বেঁচে ফের শরীর জমিয়ে রাখা যাবে ভবিষ্যৎ শুভদিনের জন্যে. কী জন্যে জানি না, আরো হাজার খানেক বছর বাঁচার কোনো ইচ্ছে চিকিৎসকটির ছিল না, খাটের কোলেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাঁর।'

বার্গের মটকানো চোখে একটা সহাস্য ঝিলিক দেখা গেল। সিগারেট হোল্ডার পরিষ্কার করে আরেকটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

'মধ্য যুগ... আমাদের এই অবিশ্বাস্য বিশশতক মেতেছে মধ্য যুগের উন্মাদতম সব ধারণাকে বাস্তব করতে। পারদ বা সীসাকে সোনায় পরিণত করার পরশপাথর আজ রেডিয়ম চিরন্তন ইঞ্জিন আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি বটে — সেটা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ — কিন্তু পরমাণবিক তেজের চিরন্তন ও স্বয়ংনবীভূত উৎস আমরা বার করেছি... সে যুগের আর একটা ধারণার কথা বলি; ১৬৬৬ সালে সারা ইউরোপ ভাবছিল বিশ্বের অবসান আসন্ন। সে যুগে তার কারণ কেবল ৬৬৬-এই তিনটে সংখ্যা সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন তাৎপর্য আরোপ আর অ্যাপোক্যালিপ্সিতে অন্ধ বিশ্বাস। আজ কিন্তু পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার কল্যাণে বিশ্বধ্বংসের ভাবনার পেছনে খুবই বাস্তব ভিত্তি আছে.. কিন্তু ঐ শরীর জমানোর কথাটা বলি... মধ্যযুগীয় চিকিৎসকের সরল জল্পনাটার একটা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আজ আছে। আনাবাইওসিস প্রক্রিয়ার কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়। লিউভেনহোয়েক এটা আবিষ্কার করেন ১৭০১ সালে। এর অর্থ শৈত্য বা ডিহাইড্রেশনের মাধ্যমে জীবন প্রক্রিয়ার গতি মন্থর করা। মানে শৈত্য এবং জলকণার অভাবের ফলে সমস্ত রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার গতি ভয়ানক কমে যায়। বহু আগেই মাছ আর বাদুড়ের আনাবাইওসিস ঘটাতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা। শীতে তারা মরে না, সংরক্ষিত থাকে। অবশ্যি পরিমিত শীতে.. তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে — ক্লিনিক্যাল মৃত্যু। ব্যাপারটা হল, হার্ট থেমে গেলে বা নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে না। গত যুদ্ধে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলেন ডাক্তাররা। হার্ট স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেও সাংঘাতিক-

জখম মানুষকে জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মনে রাখবেন, ওরা কিন্তু সাংঘাতিক-জখম লোক। আপনি পদার্থবিদ হয়ত জানেন না ...'

'খানিকটা শুনেছি এ বিষয়ে', মাথা নেড়ে বললেন নিমায়ের।

'মৃত্যু কথাটার সঙ্গে যদি ক্লিনিক্যাল এই ডাক্তারি লেবেলটা এ'টে দেওয়া যায় তাহলে মৃত্যুর ভয়াবহতা অনেক কমে যায় তাই না? আসলে মৃত্যু ও জীবনের মাঝখানে কতকগুলো অন্তর্বর্তী অবস্থা আছে: ঘুম, জড়তা, আনাবাইওসিস। মানুষের দেহক্রিয়া তখন তার জাগ্রত অবস্থার তুলনায় মন্থর। গত কয়েকবছর ধরে এই নিয়ে আমি কাজ করছি। দেহক্রিয়াকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্যে আনাবাইওসিসকে তার চরমে — ক্লিনিক্যাল মৃত্যুতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। তা করতে পেরেছি আমি। তার জন্যে প্রথমে প্রাণ দিয়েছে ব্যাঙ, খরগোস আর গিনিপিগ। পরে দেহ জমাবার নিয়মকানুন ও পদ্ধতি যখন বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখন আমার শিম্পাঞ্জি মিমিকে কিছুক্ষণের জন্যে "মারবার" সাহস নিই।'

'বলেন কি, আমি যে দেখেছি তাকে,' বললেন নিমায়ের, 'খুব ফুর্তিবাজ, চেয়ারে চেয়ারে লাফিয়ে বেড়ায়, চিনি চায়।'

'ঠিকই!' গম্ভীরভাবে বললেন বার্ণ, 'কিন্তু চার মাস ধরে মিমিকে রেখেছিলাম একটা ছোট্ট কফিনে, নানা রকম নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসিয়ে তাপমাত্রা রেখেছিলাম প্রায় শূন্যে।'

চঞ্চলভাবে নতুন একটা সিগারেট টেনে নিয়ে বলে চললেন বার্ণ:

'তারপর সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটা করি। পরীক্ষা নিজের ওপরেই — চরম আনাবাইওসিস প্রক্রিয়া চালিয়েছি আমার ওপরে সেটা গত বছরে। নিশ্চয় মনে আছে আপনার, তখন একটা কথা রটেছিল যে প্রফেসর বার্ণের খুব অসুখ। আসলে অসুখেরও বাড়া, পুরো ছয়মাস ধরে আমি 'মরে' ছিলাম। সত্যি সে এক অদ্ভুত অনুভূতি নিমায়ের, অবিশ্যি অনুভূতির একান্ত অবলুপ্তিকে যদি অনুভূতি বলা যায়। সাধারণ ঘুমে আমরা সময়ের তালটা ধীরে হলেও অনুভব করি। কিন্তু এক্ষেত্রে সে রকম কিছু নয়। নার্কোটিকের অচৈতন্যতার মতো একটা ব্যাপার ঘটল। তারপর সবকিছুই স্তব্ধ আর অন্ধকার। অবশেষে ফের জীবনে প্রত্যাবর্তন। পরপারে কিন্তু কিছুই ছিল না ...'

পা টান করে বসেছিলেন বার্ণ, রোগা রোদপোড়া হাতের ওপর হেলান দিয়ে রেখেছিলেন মাথা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল চোখ তাঁর চিন্তাচ্ছন্ন।

'সূর্য . অনন্ত অন্ধ মহাশূন্যের একটা কোণ অল্প একটু উজ্জ্বল করে তুলেছে আলোর একটা গোলক। তার চারপাশে ছোটো ছোটো ঠান্ডা আরো কিছু গোলক। তাদের সবার জীবন নির্ভর করে আছে ঐ সূর্যের ওপর . . তারপর এরই একটা গোলকে দেখা দিল মানুষ — চিন্তা করার ক্ষমতাধর এক জাতের প্রাণী। কী ভাবে উদ্ভব হল মানুষের ? কত উপকথা আর প্রকল্প আছে তা নিয়ে।

'একটা জিনিস কিন্তু নিঃসন্দেহ — মানুষের জন্মের জন্যে অতি প্রচণ্ড রকমের একটা বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল আমাদের গ্রহের, এমন একটা ভূতাত্ত্বিক ওলটপালট, যাতে সর্বোচ্চ প্রাণী বানরদের জীবনাবস্থা বদলে যায়। মোটের ওপর সবাই একমত যে সে বিপর্যয়টা হল তুষার যুগ। উত্তর গোলার্ধের দ্রুত শৈত্য, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের কমতি — এর ফলে উচ্চতর বানরেরা মাংস সংগ্রহের জন্য পাথর আর মুষল হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়, আগুনকে ভালোবাসতে শেখে।'

'তা খুবই সম্ভব,' বললেন নিমায়ের।

'আর তুষার যুগ দেখা দিল কেন ? শুধু এই গোবি মরুভূমিটা নয়, সাহারা পর্যন্ত একদিন মোটেই মরুভূমি ছিল না, উদ্ভিদ আর জীবজন্তুতে ভরা ছিল, তা কেন ? তার একটিমাত্র যুক্তিসঙ্গত অনুমান সম্ভব — পৃথিবীর অক্ষের স্থানপরিবর্তনের সঙ্গে তুষার যুগের যোগাযোগ আছে। লাটু ঘোরার সময় যেমন হয়, পৃথিবী ঘোরার সময়েও তেমনি তার অক্ষটা সরে যেতে থাকে — মৃদু, অতি মৃদু আবর্তন করতে থাকে — ছাব্বিশ হাজার বছরে পুরো একটা চক্র এই দেখুন,' একটা দেশালাইয়ের কাঠি নিয়ে প্রফেসর বালির ওপর একটা উপবৃত্ত আঁকলেন, 'তার নাভি বিন্দুতে সূর্য আর উপবৃত্ত রেখার ওপর বাঁকা অক্ষের পৃথিবী। জানেন তো, পৃথিবীর অক্ষ উপবৃত্তের সঙ্গে ২৩°৩০ কোণ রচনা করে নুয়ে থাকে। আর পৃথিবীর এ অক্ষ আবার নিজেই একটা শঙ্কু রচনা করে ঘোরে, এই রকম ধরনে ... মাপ করবেন, বহুকাল থেকেই এসব কথা জানা, তাহলেও ব্যাপারটা আমার পক্ষে জরুরী।

আসলে প্রশ্নটা অক্ষের নয়   পৃথিবীর অক্ষ বলে একটা আলাদা জিনিস তো কিছু নেই। ব্যাপারটা এই যে হাজার বছরের মধ্যে সূর্যের আপেক্ষিকে পৃথিবীর অবস্থান বদলে যায়।

'এখন চাল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ ছিল সূর্যের দিকে এগিয়ে আর এখানে এই উত্তরে বরফ এগিয়ে আসতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায়, খুব সম্ভবত মধ্য এশিয়ায় এক জাতের নর বানর দেখা দেয়, ভূ পদার্থিক পরিস্থিতির কঠোর প্রয়োজনে জোট বাঁধতে বাধ্য হয় তারা। প্রেসেসনের অর্থাৎ অক্ষের 'এই আবর্তনটার সময় প্রথম সভ্যতা দেখা দেয়। তেরো হাজার বছর পরে সূর্যের আপেক্ষিকে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধের অবস্থান উল্টে যায়, তখন দক্ষিণ গোলার্ধেও মানুষের জাত দেখা দেয়...

'উত্তর গোলার্ধে ফের তুষার যুগ শুরু হবে বারো কি তেরো হাজার বছর পরে। এ বিপদের সঙ্গে যোঝার যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য এখন মানুষের আছে, যদি... যদি অবশ্য মানুষ তখনো টিকে থাকে। কিন্তু আমার ধারণা টিকবে না। আধুনিক বিজ্ঞান যে ক্রমবর্ধমান গতি সম্ভব করে তুলেছে তাতে আমরা আমাদের অবলুপ্তির দিকেই ধাবিত হচ্ছি... দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে আমার জীবনে, প্রথমটায় ছিলাম সৈন্য হিসাবে, দ্বিতীয়টায় ময়দানেকে। পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষায় আমি উপস্থিত থেকেছি। তাহলেও তৃতীয় মহাযুদ্ধ যে কী দাঁড়াবে সেটা কল্পনাও করতে পারি না। ভাবতেও ভয় লাগে। আরো খারাপ এই যে এমন লোকও আছে যারা একেবারে বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতায় হিসেব করে বলে দেন এত মাসের পর যুদ্ধ বাধবে। শত্রুর শিল্প কেন্দ্রের ওপর পুঞ্জীভূত পরমাণু আঘাত। সীমাহীন সব তেজস্ক্রিয় মরুভূমি। বৈজ্ঞানিকের মুখে এই সব কথাই শোনা যাচ্ছে! শুধু তাই নয়, তেজস্ক্রিয় বিকিরণে মাটি জল বাতাসকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে কী করে বিষাক্ত করা যায় তারই হিসেব করছেন তাঁরা। সম্প্রতি একটি আমেরিকান বৈজ্ঞানিক লেখা পড়েছি, তাতে প্রমাণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ পরিমাণ তেজস্ক্রিয় মাটি উৎক্ষিপ্ত করতে হলে একটা পরমাণু বোমাকে অন্তত ৫০ ফুট মাটি ভেদ করতে হবে। এ একেবারে বৈজ্ঞানিক বিভীষিকা।' হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন বার্ণ।

সূর্য অস্ত গেছে, শুরু হয়েছে তপ্ত রাত। দ্রুত কালো হয়ে উঠছে কৃষ্ণ-নীল আকাশ, তাতে ফুটে আছে ঝাপসা স্তব্ধ কয়েকটা তারা। মরুভূমিটাও কালো হয়ে উঠেছে — আকাশের সঙ্গে তার তফাৎ কেবল ঐ তারা কটিতে।

শান্ত হয়ে এলেন প্রফেসর, চিন্তিত, প্রায় নিরাবেগ একটা সুরে কথা শুরু করলেন তিনি। আর সেই একঘেয়ে সুরে তিনি যা বলছিলেন তা শুনে অত গরমের মধ্যেও কেঁপে উঠলেন নিমায়ের।

'...পরমাণু বোমায় সম্ভবত গোটা পৃথিবীটা ভস্মীভূত হবে না। তার দরকারও পড়বে না; কিন্তু বিশ্বের আবহাওয়াকে অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তায় তা আচ্ছন্ন করবে। আর শিশুর জন্মের ওপর তেজস্ক্রিয়তার যে কী প্রতিক্রিয়া তা তো আপনি জানেন। মানুষজাতির যেটুকু টিকে থাকবে তারা কয়েক পুরুষ ধরে যাদের জন্ম দিয়ে যাবে তারা নতুন, অবিশ্বাস্য রকমের জটিল জীবন পরিস্থিতির পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত হবে। হয়ত আরো ভয়াবহ আরো নিখুঁত গণ আত্মহত্যার অস্ত্র আবিষ্কার করে বসবে লোকে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যত দেরি করে শুরু হবে ততই ভয়াবহ হবে তা। লোকে লড়াইয়ের সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছে — এতো জীবনে কখনো দেখিনি... তাই প্রেসেসনের পাক শেষ হবার সময় আমাদের এ গ্রহে একটিও চিন্তক প্রাণী বেঁচে থাকবে না। যুগের পর যুগ সূর্য প্রদক্ষিণ করে যাবে আমাদের গ্রহ, কিন্তু সে গ্রহ এই মরুভূমিটার মতোই শূন্য ও নিথর,' বন্ধ্যা বালির দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন প্রফেসর, 'মরচে ধরে ক্ষয়ে যাবে লোহা, ধুলোয় মিশে যাবে ঘরবাড়ি। তারপর নতুন একটা তুষার যুগ শুরু হবে, আমাদের এ হতভাগ্য সভ্যতার মৃত অবশেষগুলি মুছে যাবে পুরু বরফে... আর সেই শেষ! ধুয়ে মুছে নতুন এক মানবজাতির জন্যে তৈরি হবে পৃথিবী। অন্য সমস্ত প্রাণীর বিকাশ আমরা বর্তমানে অবরুদ্ধ করে রাখছি, তাদের শিকার করি, মারি, বিরল সব জাতের প্রাণীদের নিঃশেষ করি... পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে মুক্ত প্রাণীজগত সংখ্যায় ও উৎকর্ষে দ্রুত বাড়তে থাকবে। নতুন তুষার যুগ আসার সময় উচ্চতর বানরেরা চিন্তা করতে পারার মতো যথেষ্ট বিকশিত হয়ে উঠবে। এই ভাবেই দেখা দেবে নতুন এক মানবজাতি — আশা করা যাক, আমাদের মতো দুর্ভাগ্য তাদের সইতে হবে না।'

'কিন্তু একটা কথা প্রফেসর,' চেঁচিয়ে উঠলেন নিমায়ের, 'আমরা সবাই তো আর আত্মহত্যাকারী পাগল নই।'

'সে কথা ঠিক,' শুষ্ক হেসে বললেন বার্ণ, 'কিন্তু একটি মাত্র পাগলেই এত ক্ষতি করতে পারে যে হাজার বিজ্ঞ লোকেও তা ঠেকাতে পারবে না। আমি ঠিক করেছি, নতুন মানুষের আগমনের সময় নিজে হাজির থাকব। আমার যন্ত্রের টাইম রিলের ভেতরে একটা তেজস্ক্রিয় কার্বন আইসোটোপ ফিট করা আছে, এর অর্ধায়ু হল আট হাজার বছর।' সুরঙ্গটার দিকে দেখালেন বার্ণ। '১৮০ শতাব্দীর পর এর রিলে শেষ হয়ে যাবে; তখন আইসোটোপের বিকিরণ এত ক্ষীণ হয়ে আসবে যে ইলেকট্রোস্কোপের প্লেট দুটো পরস্পর সংযুক্ত হবে, ও তাতে করে বিদ্যুৎ সার্কিট চালু হয়ে যাবে। সে সময় নাগাদ এই বন্ধ্যা মরুভূমি কিন্তু ফের গাছপালায় ভরা অর্ধগ্রীষ্মমণ্ডলে পরিণত হবে, নতুন নর-বানরের উদ্ভবের পক্ষে এই জায়গাই হবে সবচেয়ে অনুকূল।'

লাফিয়ে উঠলেন নিমায়ের। উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, 'বেশ, যুদ্ধপ্ররোচকরা নয় উন্মাদ, কিন্তু আপনি কী বলবেন আপনার এই সংকল্পটাকে? আঠারো হাজার বছর ধরে আপনি জমে মরে থাকতে চান?'

'শুধু জমে মরার কথা বলছেন কেন?' শান্তভাবে আপত্তি করলেন বার্ণ, 'এ হল প্রত্যাবর্তনশীল মৃত্যুর একটা পুরো প্রক্রিয়া: শৈত্য, নিদ্রায়ন, অ্যান্টিবাওটিকস ...'

'কিন্তু এ যে আত্মহত্যা!' নিমায়ের বললেন, 'কিছুতেই আপনি আমায় বোঝাতে পারবেন না। এখনো সময় আছে, ভেবে দেখুন।'

'না, অন্য যে কোনো জটিল পরীক্ষার চেয়ে বেশি ঝুঁকি এতে নেই ... আপনি তো জানেন, ৪০ বছর আগে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে চিরন্তন বরফের তল থেকে একটা ম্যামথের শবদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। মাংস এমন চমৎকার সংরক্ষিত ছিল যে সাগ্রহে তা খেতে শুরু করেছিল কুকুরেরা। ম্যামথের দেহ যদি একটা আপতিক, প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে বহু হাজার হাজার বছর ধরে তাজা থাকতে পারে, তাহলে বৈজ্ঞানিকভাবে হিসাব করা, পরীক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে আমি টিকে থাকতে পারব না কেন? আর আমাদের হালের ঐ অর্ধপরিবাহী থার্মো-এলিমেণ্টগুলো খুব সহজে

নির্ভরযোগ্য রূপে তাপকে বিদ্যুতে পরিণত করবে। সেই সঙ্গে শৈত্যও সৃষ্টি করবে। আঠারো হাজার বছরের মধ্যে আমায় ডোবাবে না বলেই ভরসা করি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন নিমায়ের।

'থার্মো এলিমেণ্টরা আপনাকে ডোবাবে না, তা ঠিক। তাদের গঠন খুব সহজ, গর্তের ভেতরকার পরিস্থিতিটা তাদের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে: তাপের তারতম্য খুব কম, জলীয় বাষ্প নেই . . ম্যামথটা যতদিন টিকে ছিল প্রায় ততবছরই টিকে থাকতে পারবে এগুলো। কিন্তু অন্য যন্ত্রপাতিগুলো? আঠারো হাজার বছরের মধ্যে তাদের কোনো একটা যদি অচল হয়ে যায় তাহলে ...'

আড়িমুড়ি ভেঙে বার্ণ নক্ষত্রভরা আকাশের পটে গা এলিয়ে দিলেন।

'অন্য যন্ত্রপাতিগুলোর এতদিন ধরে কাজ করতে হবে না। তাদের কাজ শুধু দুবার — কাল সকালে, তারপর ফের আঠারো হাজার বছর পরে, পৃথিবীতে নতুন প্রাণী পর্যায়ের শুরুতে। বাকি সময়টা তারা আমার সঙ্গেই সেলে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে।'

'একটা কথা বলুন প্রফেসর ... আপনি ... সত্যিই কি মানুষজাতির লোপ হবে বলে বিশ্বাস করেন।?'

চিন্তিতভাবে বার্ণ বললেন, 'বিশ্বাস করতে যাওয়াটা ভয়ংকর। কিন্তু আমি শুধু বৈজ্ঞানিক নই মানুষও বটি, নিজের চোখেই দেখতে চাই আমি . . থাক, এবার ঘুমানো যাক। কাল আমাদের কাজ কম নয়।'

খুব ক্লান্ত হলেও নিমায়েরের ভালো ঘুম হল না রাত্রে। হয়ত গরমের জন্যে, হয়ত বা প্রফেসরের কথা শুনে মস্তিষ্ক তাঁর অতি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, ঘুম আসছিল না। সূর্যের প্রথম রোদ তাঁবুতে এসে পড়া মাত্র সাগ্রহে উঠে পড়লেন তিনি। বার্ণ শুয়েছিলেন পাশেই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেললেন।

'শুরু করব নাকি?'

গর্তের একেবারে তলাটা বেশ ঠান্ডা, সেখান থেকে আশ্চর্য নীল আকাশের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছিল কেবল। তলে গিয়ে সরু গর্তটা চওড়া হয়ে গেছে। এখানেই ফিট করে রাখা হয়েছে সব যন্ত্রপাতি — গত কয়েকদিন

ধরে নিমায়েব আর প্রফেসর বসিয়েছেন এগুলিকে। সেখান থেকে থার্মো-এলিমেণ্টের শক্ত সব কেব্‌ল গেছে সুরঙ্গের বালুময় দেয়ালে।

সেলের যন্ত্রপাতিগুলো বার্ণ শেষ বারের মতো পরীক্ষা করে দেখলেন। বার্ণের নির্দেশ মতো নিমায়ের সুরঙ্গের ওপরে ছোটো একটা গর্ত করে সেখানে বিস্ফোরক রেখে তার নামিয়ে দিলেন সেল পর্যন্ত। সবকিছু ঠিকঠাক করার পর দুজনে ওপরে উঠে এলেন। সিগারেট ধরিয়ে প্রফেসর চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন:

'মরুভূমি আজকে চমৎকার দেখাচ্ছে, তাই না? কিন্তু প্রিয় সহকারী — আর কী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার জীবন সাময়িক ভাবে ছিন্ন করে দেব, রসবোধহীনের মতো আপনি যাকে বলেন আত্মহত্যা। ব্যাপারটা সহজ করে দেখুন। জীবন একটা প্রহেলিকা — মানুষ অনবরত তার অর্থ বার করার চেষ্টা করছে। কালের অন্তহীন ফিতের একটা ছোট্ট টিক। একটা টিক না হয়ে দুটো টিক হোক না আমার জীবনটা... নিন, এবার বিদায় জানিয়ে কিছু বলুন। আপনার সঙ্গে এমনি একটু আলাপ তো বিশেষ হয় না।'

নিমায়ের তাঁর ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলেন একটু।

'সত্যি, জানি না কী বলব ... আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আপনি এই কাণ্ড করবেন। ভয় হচ্ছে বিশ্বাস করতে।'

'হুম, এই তো, আমার উৎকণ্ঠা আপনি কমিয়ে দিলেন।' বার্ণ বললেন, 'কেউ যখন দুশ্চিন্তা করার মতো থাকে, তখন আর এত ভয়ঙ্কর লাগে না। যাক, বিচ্ছেদক্ষণটা বিলম্বিত করে পরস্পরের বিষাদ বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি যখন ফিরে যাবেন, তখন হেলিকপ্টরের ওই দুর্ঘটনা ঘটাবেন, যা কথা হয়ে গেছে। আমি না বললেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, এ পরীক্ষায় গোপনীয়তা অনিবার্য। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে শরতের বালুকা ঝঞ্ঝা শুরু হবে ... বিদায় ... আমার দিকে অমন করে চাইবেন না, আপনাদের সকলের চেয়ে আমি বেশি দিন বেঁচে থাকব!'

নিমায়েরের সঙ্গে করমর্দন করলেন প্রফেসর।

'আচ্ছা ঐ সেলে কি কেবল একজনেরই ব্যবস্থা আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন নিমায়ের।

'হ্যাঁ, কেবল একজনের,' বার্ণের মুখে একটা আন্তরিক দরদ ফুটে উঠল,

'আপনাকে আগে বলে রাজি করাইনি দেখে এখন যেন আফশোসই হচ্ছে।' তারপর নামবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই গর্তটার কাছ থেকে চলে যাবেন কিন্তু।' তাঁর পাকা মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বার্গ সেলের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর পোষাক ছেড়ে যে জিনিসটি পরলেন সেটা একটা ডুবুরি পোষাকের মতো, নানা রকম নল লাগানো আছে তাতে। এ পোষাক পরে তিনি তাঁর দেহের ছাঁচে মাপসই করে বানানো একটা প্ল্যাস্টিক তোষকের ওপর শুলেন। একটু নড়ে চড়ে দেখলেন, কোথাও কিছু চাপ দিচ্ছে না। সামনের কণ্ট্রোল প্যানেলের সংকেতবাতিগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল যন্ত্রসব প্রস্তুত।

বিস্ফোরকের সুইচটায় হাত দিলেন তিনি, একমুহূর্ত অপেক্ষা করে চাপ দিলেন। অল্প একটু কম্পন বোধ করা গেল, কিন্তু সেলের ভেতরে কোনো শব্দ পেঁাছল না। শেষ কালে শৈত্যযন্ত্রের পাম্প আর নারকোসিস যন্ত্র চালু করলেন, হাতটা নামিয়ে আনলেন 'খাটের' যথাস্থানে, ছাতের একটা চকচকে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত গুণতে লাগলেন ...

ওপরে নিমায়ের একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলেন, এক রাশ ধুলোবালি উঠে গেল আকাশে। বার্গের সেল এবার মাটির তলে ১৫ মিটার নিচুতে চাপা পড়ে গেল ... চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন নিমায়ের, নিস্তব্ধ মরুভূমির মধ্যে কেমন গা ছমছম করতে লাগল তাঁর। ধীরে ধীরে হেলিকপ্টরের দিকে হেঁটে গেলেন তিনি।

পাঁচ দিন পর, হেলিকপ্টরটাকে নির্দেশমতই উড়িয়ে দিয়ে তিনি পেঁাছন এক ছোট্ট মঙ্গোল শহরে।

সপ্তাহ খানেক পরে শরতের ঝড়ে বালিয়াড়ির পাহাড়গুলো এলোমেলো হয়ে গর্তটার সব চিহ্ন মুছে ফেলে। কালের মতোই অসীম বালুতে ঢাকা পড়ে যায় বার্গের শেষ অভিযানের ডেরাটা। আশেপাশের জায়গা থেকে তাকে আলাদা করে চেনার আর কোনো উপায় রইল না ...

একটা দপদপে ঝাপসা সবুজ আলো ধীরে ধীরে জেগে উঠল অন্ধকারের মধ্যে। সেটা স্থির হয়ে এলে বার্গ বুঝলেন, এটা ঐ তেজষ্ক্রিয় রিলের সংকেত বাতি। জিনিসটা কাজ করেছে তাহলে।

ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এল তাঁর চেতনাটা। বাঁ দিকে দেখলেন তাঁর চিরন্তন ঘড়ির ইলেকট্রোস্কোপের প্লেট দুটো পড়ে আছে — কাঁটাটা ১৯ আর ২০-র মাঝখানে। "বিশ সহস্রকের মাঝামাঝি," ভাবলেন তিনি। মস্তিষ্ক তাঁর নিখুঁতভাবেই কাজ করছে, একটা সংযত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

"এবার দেহটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।" সাবধানে তিনি তাঁর হাত, পা, ঘাড় নাড়িয়ে দেখলেন। মুখ খুললেন, বন্ধ করলেন। দেহটা ঠিকই চলছে, কেবল ডান পাটা তখনো অসাড়। স্পষ্টতই তা 'নিদ্রাভিভূত' অথবা তাপমাত্রা উঠেছে একটু বেশি দ্রুত। দ্রুত হাত পা চালিয়ে তিনি একটু চাঙ্গা হয়ে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকালেন — ভোল্টমিটারের কাঁটাটা নেমে গেছে। বোঝা যায়, শৈত্য কাটাবার সময় অ্যাকুমুলেটরদের সঞ্চয় ফুরিয়ে এসেছে একটু। সবকটি তাপ ব্যাটারিকে চার্জ করতে শুরু দিলেন বার্গ, সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা কেঁপে উঠে গেল। চকিতে মনে পড়ল নিমায়েরের কথা। থার্মো-এলিমেণ্টরা সত্যিই তাঁকে ডোবায়নি। সে কথা মনে পড়তেই একটা অদ্ভুত দ্বিমুখী ব্যথিত ভাবনা আচ্ছন্ন করে তুলল মনকে। "নিমায়ের সে তো যুগযুগ আগের একটা লোক। এখন আর কেউ বেঁচে নেই ..."

ছাতে ধাতুর গোলকটার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। এখন ওটা অন্ধকার, মোটেই চকচক করছে না। অস্থির বোধ করলেন বার্গ। ফের ভোল্টমিটারের দিকে চাইলেন — অ্যাকুমুলেটরে এখনো খুব বেশি বিদ্যুত নেই, কিন্তু সমস্ত থার্মো-ব্যাটারি যদি একই সঙ্গে চালু করা যায়, তাহলে ওপরে উঠে আসার মতো যথেষ্ট শক্তি পাওয়া সম্ভব। পোষাক বদলে তিনি কামরার ছাতের দরজা দিয়ে উঠে গেলেন ওপরে আচ্ছাদনের কাছে, সেখানে স্বয়ংক্রিয় স্ক্রুমুখ ফিট করা আছে।

সুইচ টিপলেন তিনি, গোঁ গোঁ করে ঘুরতে শুরু করল ইলেকট্রিক মোটর। আচ্ছাদনের স্ক্রু মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে। কক্ষের মেঝে একটু সরে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বার্গ দেখলেন আচ্ছাদনটা ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত পাথরের সঙ্গে ধাতুর সংঘাতের শুকনো মুড়মুড় শব্দ শেষ

হয়ে গেল। আচ্ছাদন উঠে এসেছে ওপরে। বিশেষ একটা চাবি দিয়ে বার্গ দরজার ন্যাটগুলো খোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সহজ হল না। আঙুল ছড়ে গেল। অবশেষে একটা ফাটল দিয়ে দেখা গেল গোধূলির নীলাভ আলো। আরো কয়েকবার চেষ্টার পর আচ্ছাদনের তল থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর।

সদ্য নামা সন্ধ্যায় গোধূলিতে চারিদিকে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ অরণ্য। আচ্ছাদনের শঙ্কুমুখটা মাটি খুঁড়ে উঠেছে ঠিক একটা গাছের শিকড়ের কাছে। মস্ত কাণ্ড গাছটার, অন্ধকার হয়ে ওঠা আকাশের উঁচুতে উঠে গেছে তার পাতার মুকুট। "বাঁ দিকে আর ঠিক আধ মিটার সরে যদি গাছটা থাকত, তাহলে কী যে হত!" এই ভেবে শিউরে উঠলেন বার্গ। গাছটার কাছে গিয়ে পরখ করে দেখলেন তিনি। তার ফাঁপা ছালটা কেমন ভেজা ভেজা। কী ধরনের গাছ এটা? জানতে হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে।

প্রফেসর বার্গ তাঁর আচ্ছাদনে ফিরে এসে তাঁর রসদ যাচাই করে দেখলেন: জল, খাবারের টিন; কম্পাস, রিভলভার। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। "আমার ধারণা তাহলে ঠিক," এই ভাবনাটাই তখন তাঁর মন জুড়ে রয়েছে, "মরুভূমি ছেয়ে গেছে অরণ্যে... তেজষ্ক্রিয় ঘড়িটা ঠিক সময় দিয়েছে কিনা দেখতে হবে, কিন্তু কেমন করে?"

গাছগুলো খুব ঘেঁসাঘেঁসি নয়, তার ফাঁক দিয়ে আকাশের ঝকঝকে নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখতেই তাঁর মাথায় খেলে গেল: "এখন ধ্রুব নক্ষত্রের জায়গায় অভিজিৎ থাকার কথা।"

কম্পাসটা নিয়ে তিনি নিচু ডালওয়ালা একটা গাছের দিকে এগুলেন। আনাড়ীর মতো চেপে বসলেন তাতে। ডালপালায় মুখ ছড়ে গেল তাঁর, হৈচৈ-এর ফলে সজোরে ডেকে একটা পাখি উড়ে গেল ডাল থেকে, যাবার সময় বেশ সজোরেই বার্গের গালে পাখার ঝাপটা দিয়ে গেল। তার অদ্ভুত ডাকটা কিছুক্ষণ ধরে ঝমঝম করতে লাগল বনের মধ্যে। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসর ওপরের একটা ডালে ভালো করে বসে আকাশের দিকে তাকালেন।

ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মাথার ওপরে অজস্র উজ্জ্বল তারা ভরা আকাশটা তাঁর একেবারেই অপরিচিত। তাঁর চেনা নক্ষত্রমণ্ডলগুলো খুঁজতে চাইলেন তিনি। সপ্তর্ষি মণ্ডলটা কোথায়, আর ক্যাসিওপিয়া? নেই

তো, থাকবেই বা কেমন করে? হাজার হাজার বছরের পর তারাগুলো যে সরে গিয়ে পুরনো সমস্ত নির্ঘণ্ট উলটুল করে দিয়েছে। ছায়া পথটা কিন্তু তারা ধূলির একটা ধুধু ফিতের মতো ঠিকই আছে আকাশে। প্রফেসর বার্গ কম্পাসটা চোখের কাছে এনে কাঁটার আবছা উজ্জ্বল উত্তর মুখটা দেখলেন। তারপর তাকালেন উত্তরের দিকে। কালো দিগন্তের ঠিক ওপরে, নক্ষত্রখচিত আকাশ যেখানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেখানে জ্বলজ্বল করছে অভিজিৎ — আকাশের উজ্জ্বলতম তারা, প্রায় স্থির একটা সবজে মতো আলো আসছে তার কাছ থেকে। তার আশেপাশে দেখা যাচ্ছে ছোটো খাটো অন্য তারাদের, বিকৃত আকারের চিরা নক্ষত্রমণ্ডল।

সব সন্দেহের অবসান হয়ে গেল। সত্যি সত্যিই প্রেসেসনের নতুন পর্যায়ের শুরুতে এসে গেছেন বার্গ, বিশ সহস্রকে...

ভাবনায় ভাবনায় রাত কেটে গেল। ঘুমতে পারেননি, অধীর হয়ে উঠেছিলেন সকালের জন্যে। শেষ পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে এল তারারা, তারপর মিলিয়ে গেল। একটা ধূসর স্বচ্ছ কুয়াসা উঠল গাছপালার মধ্যে থেকে। পায়ের নিচে মোটা লম্বা ঘাসটার দিকে তাকিয়ে বার্গ আবিষ্কার করলেন সেটা একটা অতিকায় শ্যাওলা! ঠিক যা ভেবেছিলেন। তুষার যুগের পর ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ — সবচেয়ে আদিম, সবচেয়ে কঠিনপ্রাণ উদ্ভিদটাই বাড়তে শুরু করেছে।

উদগ্র কৌতূহলে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন বার্গ। শ্যাওলার লম্বা লম্বা নমনীয় ডাঁটায় পা জড়িয়ে যেতে লাগল তাঁর, অজস্র শিশিরে অচিরেই ভিজে উঠল তাঁর জুতো। বোঝা যায়, ঋতুটা এখন শরৎ। গাছের পাতায় সবুজ, লাল, হলুদ আর কমলা রঙের সমারোহ। একধরনের সুঠাম গাছ আর তাদের তামাটে লাল বাকলের দিকে মনোযোগ গেল তাঁর। তাদের তাজা সবুজ পাতাগুলো ফুটে উঠেছে অন্য গাছগুলোর পটে। আরো কাছিয়ে গেলেন তিনি। দেখতে পাইন গাছের মতো, কিন্তু পাইন গাছে পাতার বদলে যেমন কাঁটা থাকে, এগুলোর তেমনি কাঁটার বদলে এবড়োখেবড়ো ছুচলো পাতা, গন্ধটা ধূপের মতো।

ক্রমশ সজীব হয়ে উঠতে লাগল অরণ্য। একটা হালকা ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ে গেল শেষ কুয়াসাটুকু। সূর্য উঠে এল গাছগুলোর মাথায়; সেই পরিচিত

সূর্য, তার ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য এতটুকু পুরনো হয়নি। ১৮ হাজার বছরে এতটুকুও বদল হয়নি তার।

হাঁটতে লাগলেন প্রফেসর, হোঁচট খেতে লাগলেন গাছের শিকড়ে, ঝাঁকুনিতে চশমাটা বার বার খসে পড়ছিল নাক থেকে, বার বার ঠেলে তুলছিলেন সেটাকে। হঠাৎ ডালপালার ওদিকে মড়মড় আর ঘোঁৎঘোঁৎ এক শব্দ হল। গাছগুলোর ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল একটা জন্তুর বাদামী দেহ, মাথাটা মোচার মতো। 'বন-শুয়োর,' বার্গ ভাবলেন। 'কিন্তু বন-শুয়োর আগে যেমন হত সে রকম নয়। এটার নাকের ওপর আবার একটা শিঙও আছে।' শুয়োরটা একমুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে তারপর কেঁউ কেঁউ করে পালাল গাছপালার মধ্যে। 'আরে, মানুষকে ভয় পাচ্ছে দেখছি।' অবাক হয়ে জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন বার্গ। কিন্তু হঠাৎ ধক করে উঠল তাঁর হৃৎপিণ্ড — শিশির ভেজা ধূসর শ্যাওলার ওপর কালো সোঁদা দাগ চলে গেছে ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে — সে দাগ মানুষের খালি পায়ের দাগ!

একটা পদচিহ্নের ওপর ঝুঁকে পড়লেন বার্গ। দাগটা চ্যাপটা গোছের, অন্য আঙুলগুলো থেকে বুড়ো আঙুলটা অনেক তফাতে। এ যে সবই মিলে যাচ্ছে দেখছি! এখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা মানুষই হেঁটে গেছে নাকি? সবকিছু ভুলে পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন তিনি, ভালো করে দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন। 'এখানে তাহলে মানুষও আছে, আর বন-শুয়োর যখন তাদের ভয় পায় তখন নিশ্চয়ই খুব বলবান আর ক্ষিপ্র হবে তারা।'

... সাক্ষাৎটা ঘটল অকস্মাৎ। পদচিহ্ন চলে গেছে একটা ফাঁকা মতো জায়গায়, সেখান থেকে প্রথমে কিছু তীক্ষ্ম হু-হা শব্দ শোনা গেল; তারপর ধূসরহলুদ লোমে ভরা কতকগুলো প্রাণী দেখা গেল। চেহারাগুলো কুঁজো মতো, হাত দিয়ে ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো গাছের কাছে। প্রফেসরের দিকে তাকাল তারা। বার্গ দাঁড়িয়ে পড়লেন, সবকিছু সতর্কতা বিসর্জন দিয়ে চেয়ে রইলেন এই দুপেয়েদের দিকে। কোনো সন্দেহই নেই যে এরা অ্যানথ্রপয়েড বানর; হাতে পাঁচটা করে আঙুল; ছোট্ট নাক আর কড়া চোয়ালের ওপর ঝুলে আছে ঢিপ হয়ে ওঠা ভুরু, সেখান থেকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে

নিচু কপাল। দেখলেন ওদের মধ্যে দুজনের কাঁধের ওপর চামড়ার একধরনের আবরণ বস্ত্রও আছে।

সত্যিই ঘটেছে তাহলে! হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ, স্মৃতিবিধুর নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগলেন বার্ণ। 'পুরো চক্র আবর্তন করে এল তাহলে। হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল তা ফিরে এল হাজার হাজার বছর পরে ...'

ইতিমধ্যে একটি অ্যানথ্রপয়েড বানর বার্ণের দিকে এগিয়ে এসে চিৎকার করল; শব্দটা শুনে মনে হল আদেশব্যঞ্জক। প্রফেসর বার্ণ দেখলেন তার হাতে একটা ভারী কাঠের লগুড়। বোঝা যায় সেই নেতা। তার পেছু পেছু এগিয়ে এল বাকী সবাই। এতক্ষণে বিপদটা বুঝলেন বার্ণ। এগিয়ে আসতে লাগল বানরেরা। আধ বাঁকা পায়ে হাঁটছিল আনাড়ির মতোই। বেশ তাড়াতাড়ি রিভলভারের সব কার্টিগুলি শূন্যে নিঃশেষ করে বার্ণ পালালেন বনের ভেতর।

সেইটে তাঁর ভুল হয়েছিল। যদি ফাঁকাতে দৌড়ে যেতেন, তাহলে খুব সম্ভবত তারা তাঁর নাগাল ধরতে পারত না, কেননা খাড়া হয়ে হাঁটার পক্ষে তাদের পা তখনো যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়নি। কিন্তু বনের মধ্যে তাদেরই সুবিধা। তীক্ষ্ম বিজয়োল্লাসে গাছ থেকে গাছে ঝুলে ঝুলে তারা এগুতে লাগল, ডাল থেকে ডালে দুলে দুলে প্রচণ্ড লাফ দিলে কেউ কেউ। তাদের সকলের সামনে মুষল হাতে সেই দলপতি।

নর-বানরেরা যখন তাঁকে এসে ঘিরে ধরছিল, তখন পেছন থেকে উঠছিল এক উল্লসিত বন্য চিৎকার। কেন জানি মনে হল, এ যেন একটা লিঞ্চিং-এর মতো। দৌড়নো উচিত হয়নি তাঁর। যে পালায় তার হার অনিবার্য। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল তাঁর, ঘাম ঝরতে লাগল মুখ থেকে, পাদুটো মনে হল যেন তুলো দিয়ে ঠাসা। হঠাৎ আতঙ্ক চলে গেল তাঁর, একটা পরিষ্কার নির্মম চিন্তা ঝলক দিল মনে: 'পালিয়ে কী হবে, কার কাছ থেকে পালাব? পরীক্ষার এই তো শেষ ...' থেমে গেলেন তিনি, একটা গাছের কাণ্ডে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর অনুসরণকারীদের মুখোমুখি হবার জন্যে।

সবার আগে আগে আসছিল 'দলপতি'। মুষলটা সে ঘোরাচ্ছিল মাথার ওপর। প্রফেসর চেয়ে দেখলেন তার আঁখিপল্লব লালচে লোমশ আর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো হিংস্র অথচ ভীরু, ব্যাদিত দাঁত। ডান কাঁধের লোমগুলো

পোড়া পোড়া। 'তাহলে আগুন কী তা এরা জানে দেখছি,' দ্রুত সিদ্ধান্ত টানলেন বার্ণ। বেগে ধেয়ে এল দলপতি, একটা হুঙ্কার ছেড়ে মুষলটা দিয়ে মারল প্রফেসরের মাথায়. ভয়ংকর আঘাতে ধরাশায়ী হলেন বৈজ্ঞানিক, মুখ ভেসে গেল রক্তে। এক মুহূর্তের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়লেন তিনি, তারপর চকিতের জন্য জ্ঞান হতেই দেখলেন, অন্য বানরেরাও ছুটে আসছে তাঁর দিকে, শেষ আঘাতের জন্যে হাত তুলছে দলপতি, আর রুপালি মতো কী একটা জিনিস চকচক করছে নীল আকাশে।

'তাহলেও মানবজাতি ফের বিকশিত হতে শুরু করেছে,' মাথার ওপরে মুষল নেমে এসে তাঁর সমস্ত চিন্তাক্ষমতা লোপ করে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে ভাবছিলেন তিনি।

কয়েকদিন পরে বিশ্ব আকাদমির বুলেটিনে এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়:

'মুক্ত মানব যুগের ১৮,৮৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ভূতপূর্ব গোবি মরুভূমির সংরক্ষিত এশীয় অরণ্যের এলাকায় একটি মানুষের আহত দেহ পাওয়া যায়। জরুরী আইয়োনো-বিমানে লোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় নিকটবর্তী জীবনপুনরুদ্ধার কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনো তার জ্ঞান হয়নি, কিন্তু মৃত্যুর ভয় আর নেই।

'করোটির গঠন, স্নায়ু-তন্তু ও লোকটির পোষাক আশাক যা পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় লোকটি আমাদের যুগের প্রথম দিককার লোক। সে যুগের বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল বিকাশের যে নিচু মাত্রা ছিল তাতে সে যুগের একটি লোক কেমন করে আঠারো সহস্রক বছর ধরে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। আকাদমির একটা বিশেষ অভিযাত্রীদল এ বিষয়ে সংরক্ষিত অরণ্য অঞ্চলে জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

'সবাই জানেন মানুষ ও মানবজাতির উদ্ভবের বিষয়ে যে প্রকল্প আছে তার সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য কয়েক পুরুষ ধরে জীববিজ্ঞানীরা গোবি সংরক্ষিত অরণ্যে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এক জাতের নর-বানর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, বিকাশের স্তরের দিক থেকে এরা লক্ষ লক্ষ বছর আগের অ্যানথ্রপয়েড বানর আর পিথেকানথ্রপদের মাঝামাঝি। অতীতের এই মানুষটিকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার কাছেই এই ধরনের নর বানরদের

একটি জাত বাস করে। সম্ভবত ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলেই লোকটির এই সর্বনাশ হয়।

'ভবিষ্যতে এই সংরক্ষিত বনের ওপর আরো সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আকাদমির প্যালিওনটলজিস্ট বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এই দিকে যাতে নর-বানরেরা তাদের কাজের হাতিয়ারকে হত্যার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করে, কারণ সে ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধির বিকাশে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটবে।

বিশ্ব আকাদমির সভাপতিমন্ডলী।'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА

Научно-фантастические рассказы
советских писателей

На языке бенгали

Перевод сделан по изданиям:
А. Казанцев. „Гость из Космоса". Географгиз. 1958.
А. Беляев. „Остров погибших кораблей". Детгиз. 1958.
Журнал „Техника молодежи". 11, 1956, и др.